Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৭ ভাগ। ১৮শ সংখ্যা। | ১৬ই আশ্বিন, রবিবার, ১৩৩৯ সাল, ১৮৫৪ শক, ১০৩ ব্রাহ্মাব্দ। 2nd October, 1932. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে বিশ্বজননি! তুমি তোমার স্বর্গের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে বিচিত্র উপাদান লইয়া এই ধরার রচনা করিয়াছ; আপনার মনের সাধে কত নদনদী, পাহাড় পর্ব্বত, বৃক্ষলতা ও ফল ফুলে বিচিত্র ভাবে ইহাকে সাজাইয়াছ। এ ধরাধাম মধ্যে ভারত তোমার বিশেষ মনোনীত দেশ। ভারতের পাহাড় পর্ব্বত, নদনদী, আকাশ বাতাস, ভারতের চন্দ্র সূর্য্য, ভারতের ফল মূল শস্য পৃথিবীতে অতুলনীয়। ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশ আবার তোমার বিশেষ মনোনীত ও চিহ্নিত দেশ। বঙ্গদেশ যেমন সুজলা, সুফলা, বিচিত্র শস্যসম্ভারে পূর্ণ, এমন আর কোন দেশ? শরৎকালে বঙ্গদেশ সুজলা, সুফলা ও প্রধান প্রধান শস্যসম্ভারে পূর্ণ হইয়া বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়। তাই এই শরৎকালে বঙ্গের তোমার পুত্রকন্যাগণ তোমার বিশেষ করুণা স্বীকার করিয়া, স্মরণ করিয়া, দুর্গতিনাশিনী শ্রীদুর্গারূপে তোমার পূজা করে, দুর্গোৎসবের উৎসবানন্দে মত্ত হয়। কিন্তু দেখ, মা, বঙ্গদেশ পূর্ব্বের ন্যায় সুজলা, সুফলা হইয়াও, নানা অভাবে, নানা দুর্গতিতে হাহাকার করিতেছে। বঙ্গের কত ঘরে অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, স্বাস্থ্য নাই, কত কিছু নাই; চতুর্দ্দিকে যেন নাই, নাই ধ্বনি। তাই দেশের জাতীয় উৎসব দুর্গোৎসবেও পূর্ব্বের ন্যায় তেমন আর আনন্দ নাই। মা! এ সময় বঙ্গবাসী ও ভারতবাসীর প্রাণে অনন্তশক্তিরূপিণী, অনন্তজ্ঞানরূপিণী, অনন্তস্নেহরূপিণী, অনন্তপুণ্য-শান্তিময়ী আনন্দদায়িনী চিন্ময়ী দুর্গারূপে অবতীর্ণ হও। তোমার শক্তিতেই দুর্ব্বল সবল হয়, অজ্ঞান দিব্য জ্ঞানালোকে আলোকিত হয়, অন্ধ চক্ষু পায়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে। সকল দুর্গতি দূর হয়, মা, তোমার কৃপাতে। দুঃখ, দুর্গতির সময়, অভাব অনটনের সময়, তুমি ভিন্ন আর আমাদের কে আছে? আমরা আর কাহার শরণাপন্ন হইব, কাহার মুখের দিকে তাকাইব, কাহার উপর আশা স্থাপন করিব? তুমি আমাদের সর্ব্বেসর্ব্বা। আমরা ভাল করিয়া তোমাকে বিশ্বাস করিতে শিখি, ভাল করিয়া তোমাতে নির্ভর করিতে শিখি। তুমি আমাদের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া সকল দুর্গতি দূর কর, সকল অমঙ্গলকে মঙ্গলে পরিণত কর, তব পাদপদ্মে এই কাতর প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

—•—

বঙ্গে দুর্গোৎসব।

বঙ্গে যত প্রকারের উৎসব আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় উৎসব দুর্গোৎসব। এমন আনন্দের উৎসব, এমন সম্মিলনের উৎসব, এমন প্রাণভরা উৎসব, এমন বালক, বৃদ্ধ, যুবক সকল শ্রেণীর নরনারীর মহোৎসব, আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী সকল লইয়া উৎসব, এমন কি, হিন্দুর উৎসবে মুসলমান প্রতিবেশীরও উৎসব, এমন আর দ্বিতীয় নাই। দুঃখদুর্গতিনাশিনী জগজ্জননী যে সত্যস্বরূপা নিরাকারা, বাহিরে তাঁহার কোন সত্য মূর্ত্তি নাই, তাহাও এ উৎসব প্রকাশ করে, প্রমাণ করে। যাঁহারা মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী জগজ্জননীর পূজা করেন, তাঁহারাও অন্তরে বিশ্বাস করেন, যে মায়ের পূজা তাঁহারা করিতেছেন, সে মা কোন মূর্ত্তিতে আবদ্ধ নহেন। তাঁহারা একটী মৃন্ময়ী প্রতিমা গঠন করেন বটে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত সত্যস্বরূপা নিরাকারা জননীকে আহ্বান করিয়া সেই বাহিরের প্রতিমায় আরোপ না করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের পূজা আরম্ভ হয় না। পুরোহিত বলেন, হে দেবি! তুমি এই প্রতিমাতে অধিষ্ঠিত হও, অধিষ্ঠিত থাক। মা কখন আসিলেন, কখন চলিয়া গেলেন, তাঁহারা চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পান না, দেখিতে চেষ্টাও করেন না। বিশ্বাস ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া, বিশ্বাস-ভক্তি-নয়নে মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে চিন্ময়ী মাকে দর্শন করা, এবং প্রাণের সরল প্রার্থনা ও স্তবস্তুতি-যোগে তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ লাভ করাই ইঁহাদের লক্ষ্য; কিন্তু অনেকেই স্থূল দর্শনেই মত্ত হন, ইহা বলা বাহুল্য। এই মৃন্ময়ের আবরণ চিরদিনের জন্য সরাইয়া ফেলিয়া, জগজ্জননী তাঁহার চিন্ময়ী সত্য মূর্ত্তি জগজ্জনকে প্রদর্শন করিবার জন্যই, নবযুগে এই যুগধর্ম্ম নববিধানে তাঁহার যথার্থ ভগবতীমূর্ত্তি, দুর্গতিনাশিনী শ্রীদুর্গামূর্ত্তি, সচ্চিদানন্দরূপিণী নিরাকারা মাতৃমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ। তিনি অনন্ত ঐশ্বর্য্যের, অনন্ত সৌন্দর্য্যের, অনন্ত মাধুর্য্যের আধার হইয়া, অনন্ত স্নেহ, করুণার মূর্ত্তিরূপে যে অবতীর্ণ, তাহা কি শুধু তাঁহার বিশেষ বিশেষ চিহ্নিত সাধু, ভক্ত, মহাজনদিগকে দর্শন দিবার জন্য? তাহা হইলে তাঁহার করুণা সসীম হইয়া পড়ে। তিনি বর্ত্তমান ধর্ম্মবিধানে চিন্ময়ী মাতৃমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ, তাঁহার জগদ্বাসী ছোট, বড়, সকল পুত্রকন্যার প্রাণে প্রকাশিত হইবার জন্য। মায়ের স্নেহ করুণা নিম্নগামী। পৃথিবীতে যাহারা নিতান্ত নগণ্য, অস্পৃশ্য, সমাজ-প্রাসাদের সর্ব্ব নিম্নে যাহাদের স্থান, তাহারাও মায়ের সত্যদর্শনের অধিকারী, তাহারাও মায়ের শ্রীহস্ত হইতে অমরজীবনপ্রদ স্বর্গের অমৃতমাখা প্রসাদলাভের অধিকারী। তিনি আপনার স্বর্গীয় বাণীতে এবার এই অধিকার ঘোষণা করিয়াছেন; মাতৃদর্শনের আকাঙ্ক্ষা সকলের প্রাণে জাগাইয়া তুলিয়া, আপনি তাহাদের দ্বারে চিন্ময়ী মা রূপে উপস্থিত হইতেছেন। কৃপা সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নগামিনী, তাই আমাদের আশার মন্ত্র "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্"। নবধর্ম্ম অতি নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের নিকট, পৃথিবীর হিসাবে নিতান্ত নগণ্য যাহারা, তাহাদিগের নিকটও এই আশার বাণী ঘোষণা করিতেছেন। বাহ্য মন্দিরে দেবতার মৃন্ময়মূর্ত্তিদর্শনে যে ভেদাভেদ ছিল, ব্রহ্মকৃপাগুণে এবার জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলের নিকট সে বাহ্য মন্দিরের দ্বারও উন্মুক্ত হইল। দেবতার চিন্ময়মূর্ত্তি-দর্শনে কোনই ভেদাভেদ নাই। সকলেই সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মের শ্রীমুখের বাণীশ্রবণ ও তাঁহার শ্রীহস্ত হইতে অমর-জীবনপ্রদ অমৃত প্রসাদলাভের অধিকারী।

বঙ্গের দুর্গোৎসব পারিবারিক, বঙ্গের দুর্গোৎসব জাতীয়। এই উৎসবে পারিবারিক সম্পর্ক নূতন ভাবে জাগিয়া উঠে। যে পরিবারে পূজার অনুষ্ঠান হয়, সে পরিবারে যেমন পারিবারিক সম্পর্কের বসন্ত সমাগম হয়, যে পরিবারে বাহিরে মূর্ত্তিযোগে দুর্গাপূজা না হয়, সে পরিবারেও পারিবারিক সম্পর্কের বসন্ত সমাগম হয়। ছোট, বড়, ধনী, দরিদ্র, সকলেরই গৃহে পারিবারিক আত্মীয়-তার মধুময় প্রকাশ জীবন্ত। যাহার যাহা আছে, সকলকে নূতন বস্ত্রদান, প্রীতি শ্রদ্ধার নূতন উপঢৌকন প্রদান; যাহার যেরূপ সাধ্য, এই আদান প্রদানের ভিতর দিয়া প্রীতি ও সদ্ভাবে পরস্পরকে গ্রহণ ও মিলনানন্দ-সম্ভোগ। নিতান্ত গরিবের ঘরেও এরূপ আদান প্রদানের বিরতি নাই। সকল গৃহেই উৎসবানন্দ।

এ উৎসব জাতীয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের ছোট, বড় সকল শ্রেণীর লোক এই উৎসবানন্দ সম্ভোগ করে। এ উৎসবের জাতীয় লক্ষণ, জাতীয় ভাব বিশেষ ভাবে মূর্ত্তিমান আকার ধারণ করে তখন, যখন শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে, সকলে বিজয়া উপলক্ষে পরস্পরকে প্রণাম করে, নমস্কার করে, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতিভরে একে অন্যকে

আলিঙ্গন করে। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা আসিয়া, বঙ্গের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের মধুর মিলন স্থলে দূরতা, ভিন্নতা, মিষ্টতা স্থলে কঠোর শুষ্কতার সৃষ্টি করিয়াছে।

আমরা নববিধানের লোক বঙ্গের প্রাচীন সমাজের সকল নষ্ট উদ্ধার করিব। এই উৎসব ব্যাপারে আমাদের যাহা কিছু শিখিবার ও গ্রহণ করিবার আছে, আমরা শিখিয়া ও গ্রহণ করিয়া, আমাদের নব ধর্ম্মকে, নব মণ্ডলীকে যেন পরিপুষ্ট করিতে পারি, নববিধানকে জয়যুক্ত করিতে পারি, পরম দেবতা এ বিষয়ে আমাদের সহায় হউন।

—০—

দুর্গোৎসবের উদ্দেশ্য।

বঙ্গবাসীর প্রধান উৎসব, জাতীয় উৎসব দুর্গোৎসব। বহু আড়ম্বরে, বহু আয়োজনে বঙ্গবাসী এই উৎসব সম্পাদন করেন। অন্যান্য বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া, এই উৎসবে দেশবাসী নরনারী কতই আনন্দ সম্ভোগ করেন। এই উপলক্ষে নূতন বসন ভূষণে, সাজ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, বঙ্গবাসী নরনারী, বালকবালিকা কতই উৎসবানন্দে আনন্দিত হন, আত্মীয় স্বজনদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া উপঢৌকনাদি দিয়া আদর অভ্যর্থনা করেন। এই সামাজিক ও পারিবারিক উৎসবাংশ বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম নববিধানে কখনই অননুমোদনীয় নহে। নরস জাতির প্রাচীন বৃক্ষোৎসব হইতে যেমন খৃষ্টমাস উৎসব উদ্ভূত, তেমনি এই দুর্গোৎসব হইতেও আমাদের শারদীয় উৎসব পবিত্র উৎসবরূপে সাধিত। আবার এই দুর্গোৎসবে যে মূর্ত্তিপূজার ব্যবস্থা আছে, তাহার গভীর আধ্যাত্মিক ভাব উদ্ভাবন করিয়া, নিরাকারা চিন্ময়ী শক্তিপূজার পর্য্যবসিত হইলে, এই উৎসবই আমাদের সর্ব্বাবয়বপূর্ণ নব-দুর্গোৎসব বা সর্ব্বজাতীয় মহা মহোৎসবে পরিণত হইবে। বাস্তবিক মৃন্ময়ী মূর্ত্তির পূজাও প্রকৃত শাস্ত্রকারদিগের উদ্দেশ্য নয়। কেননা, মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া, তাহাতে "ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ" বলিয়া সর্ব্ব প্রথমে চিন্ময়ী আদ্যাশক্তি ভগবতীকে আরাধনা প্রার্থনা করিয়া, প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ব্যতীত পূজা হয় না। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, মৃৎ-পুত্তলিকা কিছুই নয়, বাহিরের আড়ম্বর মাত্র; আসল সেই নিরাকারা চিন্ময়ী আদ্যাশক্তিই আরাধ্য এবং উপাস্য। তিনিই জ্ঞানশক্তি সরস্বতী এবং প্রেমশক্তি লক্ষ্মী সহযোগে পাপাসুর নিধন করেন এবং পুণ্য ও সৌভাগ্যরূপ সন্তানদ্বয় বিধান করেন, ইহাই দুর্গোৎসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বাহিরের আবরণ চির বিসর্জ্জন দিয়া, যদি ইহার ভিতরকার বস্তু গ্রহণ করিয়া আমরা সাধন করি, জড়াসুর পাপাসুর সকলই নিধন করিয়া, জীবন্ত আদ্যাশক্তির পূজায় প্রকৃত জ্ঞানপ্রেমপুণ্য-সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়া, অধ্যাত্মশক্তিলাভে আমরা সমগ্র জাতি সমুন্নত ও ধন্য হইতে পারি।

—০—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

পরলোকগত আত্মার দর্শন।

পক্ষিগণ খুব উচ্চ আকাশে উঠিলে যেমন তাহাদের পা লেজ কিছুই দেখা যায় না, কেবল তাহাদের অস্তিত্ব মাত্র লক্ষ্য হয়, কিম্বা এখন যেমন আকাশযান অতি উর্দ্ধে উচ্চ আকাশে উঠিলে তাহার পাখা বা আকার প্রকার কিছুই দেখা যায় না, কেবল মাত্র তাহার ভিতর যে বৈদ্যুতিক আলোক দেওয়া থাকে, তাহাই দৃষ্ট হয়, ঠিক তেমনি মানুষ যখন দেহত্যাগ করিয়া চিদাকাশে উত্থান করেন, তখন কেবল তাঁহার চরিত্রের অস্তিত্ব বা গুণের জ্যোতি মাত্র দেখা যায়, তাঁহার জড়দেহ দেখা যায় না, বা তাহার সংসৃষ্ট জড়ীয় দোষ ত্রুটি দুর্ব্বলতাও দৃষ্টিপথে পড়ে না, তাহা দেখিবারও বিষয় নহে। বাস্তবিক পরলোকগত ব্যক্তিদিগের দোষ অপেক্ষা গুণের কথাই মনে পড়ে এবং যত আমরা তাহা আলোচনা করি, চিন্তা করি, ধ্যান করি, ততই আমাদের তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম উদ্দীপিত হয় এবং তদ্দ্বারা আমাদের আত্মার কল্যাণ হয়।

নববিধানের মত।

নববিধান মতে "সকল ধর্ম্মই সত্য।" ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নববিধান বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ করেন। তাঁহারা বলেন, যদি "সকল ধর্ম্মই সত্য" হয়, তাহা হইলে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৈষ্ণব ইত্যাদি ধর্ম্মের ভিতর যে পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারাদি আছে, তাহাও সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। ইহা নিতান্তই তাঁহাদের ভুল। "সকল ধর্ম্মই সত্য" মানে—সকল ধর্ম্মই যে ঈশ্বরের বিধান, ইহা সত্য; কিন্তু মানববুদ্ধি যে জড়বাদ বা কুসংস্কার তাহাতে সঞ্চার করিয়াছে, তাহা মানবীয়, সুতরাং তাহা কেমনে বিধাতার বলিয়া গ্রহণীয় হইবে? যাহা বিধাতার, তাহাই বিধান, তাহাই ধর্ম্ম, তাহাই সত্য; যাহা বিধাতার নয়, মানুষের কল্পিত, তাহা মানবীয়, তাহা অসত্য। হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে দুগ্ধই পান করে, তেমনি আচার্য্য বলিলেন, "পরমহংস হইয়া দুধটুকু ছাকিয়া লইবে"।

অর্থাৎ কুসংস্কারাদিমিশ্রিত ধর্ম্ম হইতে শুধু ধর্ম্ম দুগ্ধ পান করিয়া আমাদিগকে বিধানজীবনে পরিপুষ্ট হইতে হইবে। পবিত্রাত্মার আলোকে সত্যতত্ত্ব চিনিয়া লইয়া তাহাতে ভূষিত হইতে হইবে।

নববিধানের মধ্য বিন্দু।

নববিধানের মধ্যবিন্দু পবিত্রাত্মা। এই পবিত্রাত্মা ব্যক্তিরূপে মূর্ত্তিলাভ করিলেন, আচার্য্যজীবনে ও শ্রীদরবারে। তাই আচার্য্য বলিলেন, "শ্রীদরবার, তুমি দেবতা"। এই শ্রীদরবারই যথার্থ মূর্ত্তিমান নববিধান। এই এক মধ্যবিন্দুতে সকলকার আমিত্ব বিসর্জ্জিত। সর্ব্বধাতু গলাইয়া অগ্নি যেমন একধাতু করে, তেমনি প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ ভাব মত যেখানে মিলিয়া একালোকে এক নির্দ্ধারণ হয়, তাহাই নববিধানের শ্রীদরবার। চূণের এক রং, আলতার আর একটি রং, কিন্তু চূণে আলতায় মিশ্রিত হইলে আর একটি নূতন রং হয়; চূণ ও হলুদ মিশাইলে যেমন আর একটী নূতন রং হয়, তাতে চূণের রংও থাকে না, হলুদের রংও থাকে না। ঠিক তেমনি নববিধানে শ্রীদরবারের কারখানা। যাঁহারা এই কারখানায় প্রবেশ করেন, তাঁহাদের আমিত্বটি আগে বলিদান করিতে হয়। গণেশকেও হস্তিমূর্খের মস্তক লইতে হয়।

"ধর্ম্ম-সাধন"।

(আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের সঙ্গতের আলোচনা)

৩১শ—৪২ সংখ্যা—২৫শে মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৩।

(গিরিধির ডাঃ ভি, রায় হইতে প্রাপ্ত)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সঙ্গতসভার সাম্বৎসরিক উৎসব।

৮ই মাঘ, সোমবার, রাত্রি ৭॥টার সময় ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভবনে সঙ্গতসভার সাম্বৎসরিক উৎসবক্রিয়া অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। ১১ই মাঘ উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক কালব্যাপী যে মহোৎসব হয়, ইহাই তাহার প্রারম্ভ। সভামণ্ডপ চন্দ্রাতপাচ্ছাদিত, পুষ্পদাম-শোভিত এবং আলোকমালাকৃত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়াছিল। অন্যূন দুইশত ব্যক্তি সভাস্থ ছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত মহাশয় কার্য্যারম্ভ করেন। তৎপরে সম্পাদক সঙ্গতসভার ইতিবৃত্ত এবং গত বৎসরের কার্য্যবিবরণ অবগত করেন। অনন্তর কয়েকজন সভ্য স্ব স্ব জীবনের সার কথা পাঠ করেন। সর্ব্বশেষে কেশববাবু সঙ্গত সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ এবং ইহার কল্যাণ ও উন্নতির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া কার্য্য সমাধা করেন। উৎসবের আদি, অন্তে ও মধ্যে মধ্যে সুন্দর ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া শ্রোতাদিগের হৃদয় মন পুলকিত করিয়াছিল। সভার কার্য্যবিবরণ, সভ্যগণের লিখিত সার কথা এবং সভাপতির বক্তৃতার সারাংশ নিম্নে প্রকটিত হইল।

সঙ্গতসভার ইতিবৃত্ত ও গত সাম্বৎসরিক বিবরণ।

ত্রয়োদশ বর্ষ হইল, যৎকালে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বয়ঃক্রম ত্রিংশ বৎসর এবং ভক্তিভাজন বাবু কেশবচন্দ্র সেন পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সংমিলিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন, ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া জীবন্ত ধর্ম্মোপদেশে ধর্ম্মার্থীদিগের মন বিশেষরূপে আকর্ষণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে সঙ্গতসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর (১৭৮২ শকাব্দের পৌষ) শুক্রবার এই সভার জন্মদিন। ধর্ম্মোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল সেন মহাশয়ের নারিকেল ডাঙ্গার উদ্যানে ইহার প্রথম সূচনা হয়; পরে ইহা এই কলুটোলাস্থ ভবনে রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমতঃ ৯জন ব্রাহ্ম ভ্রাতা একত্র হইয়া এই সভাটির প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহাদিগের মধ্যে ৮জন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র, অবশিষ্ট মহোদয় তাঁহাদিগের শিক্ষক ও ধর্ম্মজীবনের প্রবর্ত্তক। কি কারণে ইঁহারা এই সভাটী সংস্থাপন করেন, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তৎকালে ইঁহারা প্রতি বুধবারে উপাসনা-মন্দিরে গমন করিয়া আত্মার অন্ন ধর্ম্মভাব প্রচুর পরিমাণে লাভ করিতেন, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে ধর্ম্মবুদ্ধিকে বিকশিত করিয়া সত্যান্বেষণে প্রবল উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াছিলেন; কিন্তু অস্থায়ী ভাব বা শুষ্ক জ্ঞান লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। যাহাতে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া জীবনকে উন্নত ও পবিত্র করিতে পারেন, এইজন্য তাঁহারা দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহারা ধর্ম্মসাধনে নিতান্ত আগ্রহান্বিত এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন বটে, কিন্তু দেখিলেন, আপনার আপনার চেষ্টায় তাহা সম্পন্ন করা অসম্ভব। এইজন্য পরস্পর সমভাবাপন্ন কয়েকটী ভ্রাতা একহৃদয় হইয়া সঙ্গতসভা সংস্থাপন করিলেন।

"সঙ্গত" এই নামটী এদেশের পক্ষে নূতন। যাঁহারা ইহার সহিত পরিচিত, তাঁহারা ইহার নাম শুনিয়া একটা গানের আড্ডা মনে করিতে পারেন; কিন্তু ইহা সেরূপ স্থান নহে। ইহার নাম প্রথমে "Society of Sympathy" মিলনসভা ছিল। পরে লাহোরের একটী ধর্ম্মালোচনী সভার নাম হইতে "সঙ্গত" নাম গৃহীত হয়।

ব্রহ্মবাদী শঙ্করাচার্য্যের পজ্‌ঝটিকায় আছে :—

"নলিনীদলগতজলবত্তরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলং।

ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা

ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

সমজ্জনসঙ্গতি—ধর্ম্মকাম ব্যক্তিদিগের একত্র মিলনই—ভব-সাগরপারের একমাত্র তরণীস্বরূপ। এই সজ্জনসঙ্গতি হইতেই 'সঙ্গত' কথা উৎপন্ন, তাহার সন্দেহ নাই।

আমাদিগের এই সঙ্গতসভার মূল উদ্দেশ্য কি ছিল, তাহা ইহার প্রথম অধিবেশনদিবসের আলোচিত বিষয় পাঠ করিলেই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়। 'Sympathy' অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয় সমহৃদয়তা প্রথমদিনের আলোচনার বিষয় ছিল। নিজে ভাল হওয়া এবং পরস্পরকে ভাল হইতে সাহায্য করা সঙ্গতসভার সভ্যগণের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। এইভাবে সঙ্গতসভার কার্য্যারম্ভ ব্রাহ্মগণের মধ্যে একটী নূতন ব্যাপার বলিতে হইবে। এতকাল ব্রাহ্মগণ জানিতেন, 'সপ্তাহান্তে এক দিন করিয়া সমাজে গিয়া, সকলে মিলিয়া সমস্বরে প্রার্থনা করাই ধর্ম্মসাধন; কিন্তু সাধনের সাহায্যে প্রতিদিনের জীবনকে যে বিশুদ্ধ করিতে হইবে এবং ঈশ্বরের উপাসকগণকে যে ধর্ম্ম-যোগের নৈকট্য-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে, ইহা তাঁহাদিগের নিকট অপ্রকাশিত ছিল। এই ভাবটী বীজস্বরূপে ব্রাহ্মহৃদয়-ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়া, যে কি প্রকাণ্ড আশ্চর্য্য বৃক্ষ উৎপাদন করিল, পশ্চাৎ দেখিবার বিষয়। যাহা হউক, প্রথম হইতেই সঙ্গতের সভ্যগণ সকলে যে একহৃদয়, তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিলেন। প্রতি শুক্রবার তাঁহারা একত্র হইয়া, আপনাদিগের জীবন যাহাতে বিশুদ্ধ হয় এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান সকল যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, সেই বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহারা সপ্তাহের মধ্যে প্রতি মঙ্গল ও শুক্র দুই দিন করিয়া একত্র হইতেন। তাঁহারা যে বিষয়ের কথা কহিতেন, সকলের হৃদয় তাহাতে একবাক্য হইয়া সায় দিত; সে কথা এমনি সরস, এমনি মিষ্ট, এমনি হৃদয়গ্রাহী যে, যত পরস্পরের হৃদয় খুলিতেন, তত সকলে সুখী হইয়া শ্রবণ করিতেন। কথা কহিতে কহিতে কোন কোন দিন রাত্রি অবসান হইত, কোন কোন দিন প্রভাতের তোপ পড়িয়া যাইত। তখন তাঁহারা এত সময় গিয়াছে, অনুভব করিয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন।

কেবল সভার দিনেই সঙ্গতের সভ্যদিগের এইরূপ মিলন হইত না, কেবল বিদ্যালয়ে ও সমাজে তাঁহারা একত্র হইয়া সন্তুষ্ট হইতেন না; পরস্পরের সহিত যেন মধুর প্রাণের যোগ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া, সর্ব্বক্ষণেই পরস্পরকে দেখিতে ভালবাসিতেন এবং সুযোগ পাইলেই পরস্পর একত্র হইয়া ধর্ম্মযোগের মধুরতা আস্বাদন করিতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমন্মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ-তর্পণ।

(১৮ই সেপ্টেম্বর, কোচবিহারে স্মৃতিসভায় সেবক প্রিয়নাথ মল্লিকের অভিভাষণ)

শ্রীমন্মহারাজর্ষি নৃপেন্দ্রনারায়ণের পবিত্র স্বর্গারোহণদিনে তাঁহার দিব্য আত্মাকে অভিনন্দন করি।

বিশ্বাস করি, তিনি প্রাচীন কোচবিহার রাজ্যের নবজীবন-সঞ্চারের জন্য স্বয়ং ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত এবং এই রাজ্যের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত।

শৈশবে পিতৃহীন হইয়া তাৎকালিক রাজকীয় পরীক্ষার পেষণে মাতৃদেবীর স্নেহক্রোড়ে লালিতপালিত ও রক্ষিত হইয়া যে মাতৃভক্তি লাভ করেন, তাহাতেই তাঁহার সমগ্র জীবন অনুপ্রাণিত।

যৌবনের প্রারম্ভে ইংরাজরাজের শিক্ষাধীনে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব যেমন তাঁহার জীবনকে পাশ্চাত্য ভাবে গঠিত করিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু পূর্ব্ব পুরুষগণের ধর্ম্মপ্রাণতা এবং, দয়া-দাক্ষিণ্যাদি সহৃদয়তাও তাঁহার প্রাণে চির জাগ্রত ছিল। বাস্তবিক তাঁহার জীবন যেন পূর্ব্বপশ্চিমের মিলনাদর্শে গঠিত।

শ্রীনববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের প্রভাবাধীনে, বিধাতার অনির্ব্বচনীয় আশ্চর্য্য কৌশলে আসিয়া, তিনি যে নির্ভীকচিত্তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন, "আমি এক ঈশ্বর বিশ্বাস করি এবং এক পত্নী বিনা আর দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিব না", ইহা কোচ-বিহারের রাজপুত্রের পক্ষে সামান্য বীরত্বের পরিচয় নয়! তাঁহার এই স্বর্গীয় সঙ্কল্পে কোচবিহারের ভবিষ্যৎ সমুন্নতির অটল ভিত্তি নিহিত। ইহাতেই তিনি কোচবিহারকে নব কোচবিহারে পরিণত করিলেন।

দয়া এবং দানশীলতায় কর্ণ অপেক্ষাও সত্যই তিনি কম নহেন। প্রজাবাৎসল্য এবং অনুগতপালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের নাম যেমন সুপরিচিত হইয়াছে, শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণও সে সম্বন্ধে কিছুতেই ন্যূন নহেন। গার্হস্থ্য ধর্ম্মসাধনে জনক ঋষি যেমন চির পূজিত, শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণও ভবিষ্যতে সেইভাবে যে পূজিত হইবেন, তাহা নিঃসন্দেহ। বীরত্বের জন্য রামবোল্ড এবং অভিমন্যুর নাম যেরূপ কীর্ত্তিত, শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণেরও নাম সেরূপ কীর্ত্তিত হইবে। পরন্তু একাধারে তিনি যেমন বহুগুণ-সম্পন্ন ছিলেন, তেমন আর কে?

বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধানে তাঁহার স্থান অতি নিগূঢ় এবং মহোচ্চ। শ্রীব্রহ্মানন্দ-নন্দিনী শ্রীমতী সুনীতি দেবীর সহিত তাঁহার পরিণয় বিধাতার এক অদ্ভুত লীলা-রহস্য। ইহার গভীর মর্ম্ম এখন লোকে বুঝুক না বুঝুক, ইহার ফলে যে ব্রাহ্মসমাজের গর্ভ হইতে সর্ব্বসমন্বয় নববিধানের উদ্গম হইল, ইহা কেহই

অস্বীকার করিতে পারিবে না। এবং যখন সমগ্র জগতে এই নববিধানের রাজ্য একদিন নিশ্চয়ই বিস্তার পাইবে, তখন লোকে শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ এবং সুনীতি দেবীর পবিত্র উদ্বাহ-মিলনবার্ত্তার মহিমা চিরস্মরণীয় বলিয়া ঘোষণা করিবে।

বিশেষতঃ যখন স্মরণ করি, শ্রীমৎ নৃপেন্দ্রনারায়ণ প্রেরিত মহাপুরুষের ন্যায় সমুদয় জাতীয় সংস্কার উপেক্ষা করিয়া, কোচবিহারের রাজধর্ম্ম নববিধান বলিয়া ঘোষণা করিলেন ও রাজপুত্রদিগকে নবধর্ম্মে দীক্ষা দান করিলেন এবং রাজদরবারস্থ পুরোহিতের আসনে নববিধানের উপাচার্য্যের আসন স্থাপন করিলেন, এবং সর্ব্বসাধারণ প্রজাবর্গের জন্য নববিধান ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন তাঁহার এই মহানুভাবতা ও মহৎ হৃদয়ের নিকট অবলুণ্ঠিত না হইয়া কখনই পারা যায় না। তাঁহার এই সৎসাহসিকতার এবং উদারধর্ম্ম-প্রাণতার জন্য নববিধান-বিশ্বাসী বিশ্বাসিনীর নিকট তিনি চিরকৃতজ্ঞতা ও পূজা লাভ করিবেন এবং ভবিষ্যতেও তিনি জগতের নিকট চির গৌরবের মুকুটে মণ্ডিত হইবেন।

প্রেরিতে প্রেরিতে মতভেদকালে 'শান্তিসংস্থাপক' বলিয়া এবং মহাপ্রয়াণকালে "পরিণামে শান্তিসাধক" বলিয়া নিশ্চয়ই তিনি গৌরবান্বিত হইবেন।

এই কোচবিহার রাজ্যের তিনি যত কিছু কল্যাণ, মঙ্গল করিয়াছেন, তাহার সর্ব্বোচ্চ কল্যাণ, মঙ্গলের মূল ভিত্তি এই কার্য্যে নিহিত; কারণ সত্য সত্যই ইহা হইতে, নববিধানাচার্য্য যেমন বলিলেন, "সুনীতির সহিত সুনীতি, আলোক এবং পরিত্রাণ কোচবিহারের উপর স্বর্গের পুষ্পবর্ষণ হইবে।"

আমাদের অবিশ্বাসের জন্য যদিও আমরা বর্ত্তমানে কত অন্ধকার দেখিতেছি, কিন্তু ভবিষ্যতে সে অন্ধকার নিশ্চয়ই তিরোহিত হইবে এবং নববিধানাচার্য্যের ভবিষ্যৎ বাণী নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে।

আজ তাই প্রার্থনা, মহারাজর্ষি শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণের দিব্য আত্মা স্বর্গে চির গৌরবান্বিত হউন এবং মর্ত্তে বিশেষভাবে কোচবিহারে চির জীবিত থাকুন।

তাঁহার সহধর্ম্মিণী মহারাজমহিষীকেও স্মরণ করিয়া আজ বরণ করি। শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণের কার্য্য যাহাতে অসম্পন্ন না থাকে, তজ্জন্যও তাঁহার সহযোগে আমাদের সকলের প্রাণের প্রার্থনা ভগবচ্চরণে উত্থিত হউক। আমাদের তৎসম্বন্ধে যে গভীর দায়িত্ব, তাহা পালনে কৃতসংকল্প হই।

শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণের বংশধর বর্ত্তমান মহারাজ ব্রহ্ম-কৃপায় দীর্ঘজীবী হউন। শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণের এবং পিতা পিতৃব্যের পদাঙ্ক অনুসরণে, এই রাজ্যকে তিনি নববিধানের নবরাজ্যে সমুন্নত করিয়া ধন্য হউন। ইহাই ব্রহ্মানন্দ-জননীর চরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীব্রহ্মানন্দ সনে প্রার্থনা "হে দয়াসিন্ধু কৃপাময়, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন কেবল মুখে সাধুভক্তি না করি; কিন্তু তোমার সুপুত্রগুলির মায়াতে বদ্ধ হইয়া চিরকাল তাঁদের প্রেমঋণে জড়িত হইয়া থাকি।"

ভগিনী ক্ষীরোদাসুন্দরী।

আজ আমাদের নিকট কোন মর্ম্মভেদী সংবাদ আসিল! তপস্বিনী ভগিনী ক্ষীরোদা সুন্দরী আর এ পৃথিবীতে নাই! তপস্বিনী মহা তপস্যায় ডুবিয়া গেলেন! এখনও তাঁহার জীবনের পুণ্য স্মৃতি হৃদয়ে স্পন্দিত হইতেছে! বাঁকিপুরে অবস্থানকালে আমাদের সোদরোপম জ্যেষ্ঠ কামাখ্যাবাবু যখন ভগিনী ক্ষীরোদাসুন্দরী ও পুত্রকন্যাসহ মণ্ডলীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন, তখন যেন মণ্ডলীর মজ্জার ভিতরে একটী নূতন শক্তি আসিয়া পড়িল। ভগিনীমণ্ডলীর ভিতরে তাঁহার একপ্রাণতা, প্রেম ও ভালবাসা আদর্শরূপে বর্ত্তমান। বাঁকিপুরে তাঁহার স্থান চিরস্মরণীয়। তিনি আদর্শ মাতা, আদর্শ সহধর্ম্মিণী, উপাসনায় নিষ্ঠাবতী ও আদর্শ পরিবারগঠনে যত্নবতী ছিলেন। সমুদায়গুণের উজ্জ্বল সামঞ্জস্য তাঁহার ভিতরে বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার জীবনের ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে ভগিনীমণ্ডলীর ইতিহাসে লিখিত হউক।

আজ এই দরিদ্রকুটীর হইতে তাঁহার রচিত 'আদর্শ পরিবারকে হৃদয়ের কোন সহানুভূতি ও কোন আবেগ জ্ঞাপন করিব, জানি না। আজ আমাদিগের উদ্বেলিত হৃদয়ের উদ্বেলিত উচ্ছ্বাস তাঁহার ঋষিসম স্বামী, প্রিয়তম পুত্রকন্যা, পুত্রবধূ, পৌত্র পৌত্রী ও দৌহিত্র দৌহিত্রী সকলের নিকট ছুটিয়া যাইতেছে। জ্যেষ্ঠপুত্র "নবজীবন" এখন সিন্ধুপারে। শ্রীভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আজ তিনি সন্তপ্ত পরিবারের হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন। আজ তপস্বিনী ভগিনীর আত্মা শান্তিময়ী জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে চির শান্তি লাভ করিতে থাকুন।

পোঃ নামকুম, রাঁচি। শোকসন্তপ্তা ভগিনী
১৩।৯।১৯৩২। সুমতি মজুমদার

ভগিনী সুনীতি।

আজ কোন হৃদয় লইয়া আমাদের শ্রদ্ধাস্পদা ভগিনী সুনীতির সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করিব, জানিনা। ইনি যে এক পুরাতন নববিধানবিশ্বাসী পরিবারের কন্যা। পুরাতন লক্ষ্ণৌ নগরে যে সকল ভক্তপরিবার নববিধানের নবালোকে আহুত হইয়াছিলেন ও যাঁহাদের হস্তে বিধানের দীপাধার আসিয়া পড়িয়াছিল, ভগিনী সুনীতি সেই পরিবারের গৌরবরূপে, আমাদের

সমক্ষে বিবেক, বৈরাগ্য, বিশ্বাস ও প্রেম পুণ্যের আদর্শরূপে জীবনের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছিলেন। জানিনা, আজ বিধাতার কোন্ ইচ্ছায়, আমাদের তপস্বিনী ভগিনী সেই অদৃশ্য ভবনে প্রবেশ করিলেন। যে ভূমি সাধু হীরানন্দ ও নন্দলালের পবিত্র শোণিতে অভিষিক্ত, সেই ভূমিতে বিধাতার বিধানে, ভগিনী সুনীতি আমাদিগের প্রিয় ভ্রাতা শ্রীমান্ সত্যানন্দের সঙ্গে পবিত্র উদ্বাহ-বন্ধনে মিলিত হইলেন। নববিধানভক্ত সিন্ধুবাসী ও কলিকাতা হইতে নববিধানভক্ত বন্ধুদিগের সমাগমে এবং বিধানপতির পবিত্র স্পর্শে সেই সময় সেই ভূমিতে স্বর্গের দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ঐ ক্ষেত্রে আমাদিগের পরমশ্রদ্ধাস্পদা মহারাণী সুচারু দেবীও উপস্থিত ছিলেন। বৎসরেক কাল অতীত হইতে না হইতে, আজ আমাদিগের ভিতর কি বিচ্ছেদের ছায়া আসিয়া পড়িল! আজ এই মহা শ্মশানের ভিতর হইতে যে নবীন শিশু আশার শতদলরূপে ফুটিয়া উঠিল, বিধাতার কৃপায় সে শিশু নববিধানের নূতন দান রূপে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকুক। আজ সেই শিশুর পিতা এবং সমগ্র মণ্ডলী বিধাতার এই নূতন দানকে মস্তকে তুলিয়া লউন এবং শান্তিলাভ করিতে থাকুন। আমরা শিশুর পদ চুম্বন করি ও বিধাতার চরণে বিলুণ্ঠিত হইয়া সেই ভগিনীর আত্মার কল্যাণ জন্য প্রার্থনা করি। "জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে"।

পোঃ নামকুম, রাঁচি। শোকসন্তপ্ত

১৮।৯।৩২ শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার

—o—

আমাদের অমিয়।

আমাদের ক্ষুদ্র নববিধানপরিবারে কোন্ পরীক্ষা আসিয়া পড়িল, জানিনা! একে একে যাত্রীর মত ভাই ভগিনী কোন্ অদৃশ্য নিবাসে চলিয়া যাইতেছেন! ভ্রাতা অবিনাশের পর ভগিনী ক্ষীরোদাসুন্দরী ও সুনীতি চলিয়া গেলেন। তাঁহার পর সঙ্গে সঙ্গে স্নেহের অমিয় তাঁহাদের সহযাত্রী হইলেন! স্নেহের অমিয়ের স্মৃতিও এক মহা পরীক্ষার সঙ্গে জড়িত। ইনি আমাদের স্বর্গীয় ভ্রাতা অধ্যাপক শরৎকুমার দত্ত মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। ভ্রাতা শরৎকুমার মহা আন্তর্জাতিক সংগ্রামের সময় যখন জার্ম্মাণিতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী দেবী শশাঙ্কপ্রভা, কন্যা রমা ও পুত্র অমিয় তাঁহার সঙ্গে সে বিপুল সংগ্রামপূর্ণ প্রদেশে বাস করিতেছিলেন। সে সময়ে ভারতে তাঁহাদের সংবাদ পাওয়া অসম্ভব হইয়াছিল। সেই মহা পরীক্ষার ভিতরেও, তাঁহারা বিধাতার প্রসাদে সে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, অতি কষ্টে সন্তান দুটীকে রক্ষা করিয়া ভারতে চলিয়া আসিয়াছিলেন। দেশে ফিরে আসার কিছুকাল পরে, দেশের ও মণ্ডলীর গৌরব ভ্রাতা শরৎকুমার অকালে সকলের প্রাণ শূন্য করিয়া অমরলোকে চলিয়া গেলেন! জানিনা, আজ বিধাতার কোন্ ইচ্ছায়, তাঁহার একমাত্র পুত্র স্নেহের অমিয়ও তপস্বিনী মাতা ও স্নেহের ভগিনী ও আর আর আত্মীয়বর্গকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেলেন। স্নেহের অমিয় মাতার একমাত্র আশার বস্তু ছিলেন। আজ কোন প্রতিকূল বায়ুতে সে বিকাশোন্মুখ কুসুম শুকাইয়া গেল! আজ আমরা সন্তপ্তহৃদয়ে শোকসন্তপ্তা মাতা, ভগিনী, ও আর আর আত্মীয়দের এ দারুণ শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। শোকসন্তপ্ত

১৮।৯।৩২। শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—•—

গান।

(কমলকুটীরে ব্রহ্মানন্দের উপাসনাকালে ভাবসামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া রচিত ও তাঁহার সম্মুখে গীত)

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দাও মা আমায়।
এদীন তনয়ে রাখ হে মাতায়ে,
এ মিনতি তব পায়॥

শীতলতা যেন না পশে জীবনে,
বাড়ে দিন দিন উৎসাহ প্রাণে,
সতত পরাণ ধায় তোমা পানে—
তোমা পানে শুধু ধায়।

যেন হৃদাকাশে মেঘ নাহি আসে,
নিরাশা জড়তা পলায় তরাসে,
ধায় তব কাজে তোমারি উদ্দেশে
মনোবৃত্তি সমুদয়;—

প্রেম-অনুরাগ-ভক্তিরসে মাতি'
তোমাতেই র'বে থাকি দিবারাতি,
দূরে রয় দুঃখ-ভাবনা-ভীতি,
তোমারি সেবায় দিন যায়।

তোমারি আদেশ সদা শিরে বহি,
তব প্রিয় কাজে সকাল সহি,
সুখ-দুঃখ শুধু তোমারেই কহি,—
শুধু কহি মা তোমায়;

পাপ-বাধা-বিঘ্ন গরবে দলিয়া,
কর্ত্তব্যের পথে যাই মা ছুটিয়া,
নিজে মেতে "জয় জননী" বলিয়া,
মাতাইয়া আর সবায়॥

শ্রীবিপিনচন্দ্র দত্ত।

—•—

বারিপদার ব্রহ্মোৎসব।

বিগত ২৩শে জুলাই হইতে ২৮শে জুলাই পর্য্যন্ত ছয় দিনব্যাপী ময়ূরভঞ্জের বারিপদা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সপ্তম

সাম্বৎসরিক উৎসব, মার কৃপায় বেশ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। বালেশ্বরের উৎসব সম্পন্ন করিয়া সেবক ভাই অখিলচন্দ্র রায় সুগায়ক গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা প্রভৃতি সহ ২৩শে জুলাই বারিপদায় গমন করেন। অদ্য সায়ংকালে বারিপদা ব্রহ্মমন্দিরে আরতি-যোগে উৎসবের উদ্বোধন হয়। ২৪শে জুলাই রবিবার প্রাতে সরল ভক্ত ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা বিনয়কুটীরে হয়; সেবক ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করেন এবং ভাই নগেন্দ্রনাথ সংগীত ও সকাতরে প্রার্থনা করেন। সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে প্রথমে জমাট কীর্ত্তন হইয়া উপাসনা হয়; "সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে প্রেম" বিষয়ে প্রার্থনাপাঠ ও তদবলম্বনে আত্মনিবেদনাদি হয়।

২৫শে জুলাই প্রাতে সহর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে পূর্ণচন্দ্রপুর নামক দরিদ্র পল্লীর পাঠশালায় ছাত্রছাত্রীদের ব্রহ্মোৎসবে উপাসনা হয়; খোলামাঠের মধ্যে পাঠশালাকুটীরে উপাসনা ও সংগীতাদি বেশ সুন্দর হইল। সেবক ভাই অখিলচন্দ্র আরাধনান্তে আচার্য্যের প্রার্থনা "বালকত্ব" বিষয়টী পাঠ করেন ও তদবলম্বনে বালক বালিকাদিগকে সরলভাবে উপদেশ দেন, এবং শিক্ষক হরিমোহন দাস কাতরভাবে প্রার্থনা করেন। উপাসনান্তে প্রীতিভোজন হয়। সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে সংকীর্ত্তনে উপাসনা হয়। ভাই নগেন্দ্রনাথ সুগায়ক গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডার সহযোগে খুব ভক্তি ও জমাটভাবে সংকীর্ত্তনে উপাসনার কার্য্য করেন।

২৬শে জুলাই, মঙ্গলবার, সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। আজ ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠার দিন, প্রাতে দ্বারে দ্বারে উষাকীর্ত্তন, ৮টার সময় সংগীত সংকীর্ত্তন ও ৯টার সময় উপাসনা—সেবক ভাই অখিলচন্দ্র রায় বেদীর কার্য্য করেন; আচার্য্যের "যথার্থ ভালবাসা" বিষয়ে প্রার্থনাটী পাঠান্তে, "ভাই ভগিনীদের সেবা অকৃত্রিম প্রেমে করিলে মা স্বয়ং সকল ভার লইয়া আশ্রিত সেবকদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন" ঐ ভাবে উপদেশ হয়। মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্নে তেমন কিছু হয় না, সায়ংকালে জমাট সংকীর্ত্তনান্তে সংক্ষেপে উপাসনা হয়; সেবকের নিবেদন হইতে "প্রত্যাদিষ্ট" বিষয়ের কতকাংশ পাঠ ও ঐ ভাবেই কাতর প্রার্থনা হয়।

২৭শে জুলাই, প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে ভাই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন, গভীর ভক্তিভাবে আরাধনা ও প্রার্থনা হয়, আচার্য্যের "মত্ততা" বিষয়ক প্রার্থনাটি পঠিত হয়। এ রাজ্যের দেওয়ান বাহাদুর ভক্তি ও অনুরাগের সহিত এই উপাসনায় যোগ দেন। সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দির হইতে নগরসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া মিউনিসিপ্যাল বাজার পর্য্যন্ত যাইয়া, তথায় "হরিগুণকীর্ত্তন ও হরিদর্শনেই প্রকৃত শান্তি, তাহা না হলে কিছুতেই অশান্তির আগুন নিবিবে না," এবিষয়ে বক্তৃতা হয়। তৎপরে পুনরায় মত্ততার সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তদল রাজবাটীর ২য় ও ৩য় আঙ্গীনায় প্রায় একঘণ্টা সংকীর্ত্তন করেন। এই সংকীর্ত্তন রাজপরিবারের অনেকেই আগ্রহ ও অনুরাগের সহিত শ্রবণ করেন। তথা হইতে মত্ততার সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তদল বিনয়কুটীরে গমন করেন, তথায় প্রার্থনান্তে সংকীর্ত্তন শেষ হয়, ও তৎপরে ভক্তদলের প্রীতিভোজন হয়।

২৮শে জুলাই, প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়, সেবক ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনায় ব্যবহৃত হন। "মহর্ষি ঈশার ক্রুশারোহণের দৃষ্টান্তে শত পদাঘাত সহ্য করিয়া, ভাই ভগিনীকে ও বিশ্বপরিবারকে বিশুদ্ধহৃদয়ে ভালবাসাই নববিধানের মহান্ আদর্শ" এবিষয়ে উপদেশ হয় ও ঐ ভাবে কাতর প্রার্থনা হয়। অদ্য ৩টার গাড়ীতে যাত্রিদল কলিকাতায় ও বালেশ্বরে প্রত্যাগমন জন্য যাত্রা করেন। সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে ভাই নগেন্দ্রনাথ শান্তিবাচন করিয়া উৎসব সম্পন্ন করেন। এই উৎসবে নগরবাসী অনেক হিন্দুগণ, উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ, রাজকর্ম্মচারিগণ ও হিন্দু মহিলাগণ কয়েকদিন আগ্রহের সহিত দলে দলে আসিয়া যোগদান করেন। মা বিধানজননীর কৃপায় দেখিতে দেখিতে সাত বৎসর কাল ক্রমাগত এই নগরের মধ্যে নববিধানের বিধাতার অতুল মহিমা বিঘোষিত হইতেছে। এই ব্যাপারে ভক্ত ব্রহ্মানন্দের আত্মার কতই না আনন্দ; কেননা, তিনি তো চাহিয়াছেন, সকল রাজ্য মা বিধানজননীর রাজ্য হইবে ও সকল রাজ্যেই রাজরাজেশ্বরের বিশ্ববিজয়ী বিধানের নিশান উড়িতে থাকিবে। জয় মা বিধানজননীর জয়! শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

ত্রিষষ্টিতম ভাদ্রোৎসব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৬ই আগষ্ট, মঙ্গলবার, সন্ধ্যায়, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে একটী সভার অধিবেশন হয়। সঙ্গীতান্তে ভাই অখিলচন্দ্র রায় প্রার্থনা করেন। ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ ও ডাক্তার জগন্মোহন দাস বক্তৃতা করেন। ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ বলেন, এই বিপুল মানবসমাজের মধ্যে একে অন্যের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া বাস করিতে পারেনা। পার্থিব জীবনধারণে এবং জীবনের সকল প্রয়োজনে আমরা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যের উপর কতই নির্ভর করি। এই যে আমরা দৈনিক আহার করি, এই আহার্য্য সামগ্রী কত অজানিত শত শত ব্যক্তির পরিশ্রমের ফল। এইরূপে আমাদের আহারে, পরিচ্ছদে, গৃহ পরিবারে যে সকল সামগ্রী আমাদের প্রয়োজন হয়, তাহা স্বদেশের, বিদেশের কত শত ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের ফল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই বিশ্বমানবমণ্ডলী একে অন্যের সহায়তায় বাস করে, সকল লইয়া এক পরিবার, এবং সকলেই একে অন্যের নিকট ঋণী। সাংসারিক ব্যাপারে যেরূপ সকলের সঙ্গে প্রয়োজনের ভিতর দিয়া এক অখণ্ড

যোগ, তেমনই ধর্ম্মক্ষেত্রেও আমরা স্বদেশের, বিদেশের, অতীতের, বর্ত্তমানের কত সাধু, ভক্ত, মহাজনদিগের নিকট ঋণী। সকল হইতেই গ্রহণ করিয়া আমাদের ধর্ম্মসাধন, সমন্বয়সাধন। নববিধানের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির ভিতর দিয়া, এই বিশ্বমানবমণ্ডলীর সঙ্গে একতা-সাধন বা অখণ্ডত্বসাধন আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

ডাক্তার জগন্মোহন দাস বলেন, ভাদ্রোৎসবের মূল কোথায়? কি উপলক্ষে এই ভাদ্রোৎসব? ৬ই ভাদ্র মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ভারতে ব্রহ্মোপাসনা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং ৭ই ভাদ্র, ভক্ত ব্রহ্মানন্দ এবং তাঁহার দল এই ব্রহ্মোপাসনা এই ব্রহ্মমন্দিরে নব প্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই উপাসনা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষেই ভাদ্রোৎসব। এই ভাদ্রোৎসব ভারতের ছোট, বড়, ধনী, দরিদ্র, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেরই উৎসব। কেননা, নবযুগে এই ব্রহ্মোপাসনা-প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া সকলে ব্রহ্মোপাসনার স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে ছোট বড় সকলের অধিকার, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলের অধিকার তো ব্রহ্মোপাসনায় ছিল না। ব্রহ্মোপাসনায় জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ছোট বড় সকলের অধিকার, ইহা এ দেশের পক্ষে, সমস্ত জগতের পক্ষে কি শুভ সংবাদ! ব্যক্তিগত জীবনের, সামাজিক জীবনের, জাতীয় জীবনের, সকল জীবনের প্রকৃত স্বাধীনতার উৎস কোথা হইতে উৎসারিত হইবে? বাহিরে অন্য উপায়ে যে স্বাধীনতালাভের চেষ্টা, তাহা হইতে প্রকৃত স্বাধীনতা-লাভের আশা নাই; প্রকৃত স্বাধীনতা এই ব্রহ্মোপাসনা হইতে মানব লাভ করিতে পারে এবং লাভ করিবে। এইজন্যই এই ব্রহ্মোপাসনা-প্রতিষ্ঠা। ভাদ্রমাসে এই সার্ব্বভৌমিক ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বঙ্গ, ভারত, সমস্ত জগৎ স্বাধীনতা ও সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ লাভ করিবে; এই জন্য এই ভাদ্রোৎসব সকলের উৎসব। এই ভাদ্রোৎসবে বঙ্গদেশের আনন্দ, ভারতের আনন্দ, জগতের আনন্দ।

১৭ই আগষ্ট, বুধবার, শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক। পূর্ব্বাহ্ণে নবদেবালয়ে শ্রদ্ধেয় ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে স্মৃতিসভা হয়। মেয়েরা একটী সঙ্গীত করিলে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করেন। প্রার্থনায় ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ভক্ত পরমহংস রামকৃষ্ণের শুভমিলন শুধু নববিধানমণ্ডলীর নিকট নয়, সমস্ত বঙ্গ ভারতের নিকট স্বর্গের বিশেষ আশীর্ব্বাদ, ইহা উল্লেখ করিয়া মঙ্গলময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

তৎপর হিন্দুমিশনের সভাপতি স্বামী সত্যানন্দ বক্তৃতা দান করেন। তিনি আরম্ভে ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে বিশেষ সম্মাননার সহিত হৃদয়ের অভিবাদন অর্পণ করিয়া, তাঁহার বক্তব্য বিষয় বলেন। তিনি বলেন, ব্রাহ্মসমাজের ভিন্ন ভিন্ন শাখা, রামকৃষ্ণমিশন, হিন্দুমিশন, ইঁহারা সকলেই একই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন—যদিও তাঁহাদের বাহিরের আকার প্রকারে একটু ভিন্নতা আছে। সেই মহৎ উদ্দেশ্য এই, খণ্ড খণ্ড ভারতকে ধর্ম্মসাধনার ভিতর দিয়া, ব্রহ্মজ্ঞানদানের ভিতর দিয়া, এক অখণ্ড ভারতে পরিণত করা। তিনি আশা করেন, নিশ্চয়ই পরিণামে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে। তিনি রাশিয়া দেশের বল্‌শিভিজ্‌ম্‌ ও মানব-চেষ্টাপ্রধান কার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, ধর্ম্ম যে পশ্চিমদেশে জয়যুক্ত হইতে পারে নাই, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সকল চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া, শুধু মানব-চেষ্টাকে ভিত্তি করিয়া দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতি ও কল্যাণসাধনে তাঁহারা যে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহা সে দেশেই শোভা পায়। কেন না, সে দেশে মানবসমাজের উপর, মানবনিয়তির উপর ধর্ম্ম তেমন প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে নাই; তাই তাঁহারা অবাধে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে চূর্ণ করিয়া, ধর্ম্মবলকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করিয়া, মানবসমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতি ও কল্যাণ মানবীয় শক্তিবলে সম্পাদন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ভারতের অবস্থা এ বিষয়ে অন্যরূপ। ভারতে উপনিষদের ধর্ম্ম ও গীতার ধর্ম্ম মানবপ্রকৃতির ও মানবসমাজের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারত শিখিয়াছে, ধর্ম্ম ভিন্ন মানবের যথার্থ উন্নতি ও কল্যাণ অসম্ভব। ধর্ম্মবলেই প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ উন্নতি হইয়াছিল, সত্য ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া ভারতের পতন হইয়াছে, আবার সত্য ধর্ম্মের বলেই ভারতের উদ্ধার হইবে। অতএব বর্ত্তমানে এই যে সত্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার ব্যাপার ভারতে আরম্ভ হইয়াছে, এই সত্যধর্ম্মের প্রভাবেই ভারতের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার হইবে, ধর্ম্মবলেই ভারত সকল বিষয়ে জয়লাভ করিবে।

তৎপরে হিন্দুমিশনের পণ্ডিত গিরিজাকান্ত গোস্বামী কাব্য-সাংখ্য-স্মৃতিতীর্থ বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁহার যৌবনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহের অনুকূলে এবং বহুবিবাহের প্রতিকূলে যুক্তিপূর্ণ লেখা বা কথা সকল পাঠ ও আলোচনা করিয়া, এই সত্যে উপস্থিত হইয়াছেন যে, হিন্দুসমাজের প্রচলিত অনুষ্ঠান ও আচার ব্যবহারের সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। তৎপর রামমোহন রায়-প্রবর্ত্তিত সামাজিক সংস্কার ও ধর্ম্মসংস্কার এবং তাঁহার ধর্ম্মমতের প্রভাবে তিনি বিশেষ প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তৎপর তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ অবস্থা অনুসন্ধানের পথে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, পরমহংস রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি ভক্তদিগের প্রভাবাধীনে আসিয়াছিলেন। তিনি বেদান্ত উপনিষদ্‌ প্রভৃতি হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইলেন যে, ব্রাহ্মসমাজ মতে এই উদার এবং উচ্চ সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াও, দেশের সকল শ্রেণীর লোককে, বিশেষ ভাবে যাহারা হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে কেন উঠাইয়া লইতে পারিতেছেন না। এখন ব্রাহ্মসমাজের সকল দলের মিলনের সময় এবং হিন্দুসমাজের সঙ্গেও তাঁহাদের মিলন সংস্থাপন

প্রয়োজন। যত প্রাণের কথা মন খুলিয়া একে অন্যকে বলিবেন, ততই মিলন সহজ হইবে, স্বাভাবিক হইবে। এই মিলনে সকল প্রকার কল্যাণ সাধিত হইবে, দেশের অনেক কঠিন সমস্যার পূরণ হইবে।

তৎপর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীমৎ পরমহংস দেবের উচ্চ আচরণাদি যাহা নিজে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিয়া তাঁহার জীবনের গভীর আধ্যাত্মিক সাধনার সাক্ষ্যদান করেন। তৎপর হিন্দুমিশনের বক্তাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া, ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ সমস্ত উপাসকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, হিন্দুমিশনের বক্তাগণ ঘন ঘন এই স্থানে আগমন করিয়া, যদি এইরূপ বক্তৃতাদি দ্বারা ভাবের বিনিময় করেন এবং উপনিষদ্ ও গীতাদির বিশদ ব্যাখ্যা দ্বারা প্রাচীনকালের আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব সকল প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বিশেষ কল্যাণ হয়। সেই সঙ্গে ডাক্তার ঘোষ প্রদর্শন করেন যে, বর্ত্তমানে রামকৃষ্ণ এবং কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মের বড় ভুল ব্যাখ্যা রামকৃষ্ণ মিশন হইতে দেওয়া হইতেছে। অনেকদিকে এইরূপ প্রচার করা হইয়াছে যে, পরমহংসদেব উদারভাবে ধর্ম্মের এই মত প্রচার করিয়াছেন যে, ধর্ম্মের যত মত, তত পথ এবং পরমহংসদেব হইতেই কেশবচন্দ্র এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল কথা। কেশবচন্দ্র পূর্ব্বাপর এই মত প্রচার করিয়াছেন যে, নানা মত, কিন্তু সাধনের একই পথ। কেশব এই এক পথেই পৃথিবীর বিবিধ ধর্ম্মমত সকল জীবনে গ্রহণ করিয়া সাধন করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে লীলাময় ঈশ্বর এমন একটী ধর্ম্মসাধনের নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, যে পথে অতীত ও বর্ত্তমানের সকল ধর্ম্মমতকে এই একই পথে গ্রহণ করিয়া, সকল ধর্ম্মপথের সমন্বয় সাধনা সম্ভব হইতে পারে। বক্তা নববিধানের সাধনার বিশদ ব্যাখ্যা দ্বারা তাহা প্রদর্শন করেন। তৎপর মেয়েরা ভাবের উপযোগী একটী সঙ্গীত করিলে, এ বেলার কার্য্য শেষ হয়।

১৮ই আগষ্ট, ২রা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সভা হইবার কথা ছিল; কিন্তু এ দিন অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যায় ঘন বৃষ্টিপাতে, রাস্তা ঘাটের উপর বৃষ্টির জল অধিক পরিমাণে জমিয়া লোকের যাতায়াত কঠিন হওয়ায়, সভা হইতে পারে নাই।

১৯ই আগষ্ট, সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে খুব জমাটভাবে কীর্ত্তন হইয়াছিল। শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

২০শে আগষ্ট, ৪ঠা ভাদ্র, শনিবার, জেনারেল বুথের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক। প্রাতে নবদেবালয়ে এই উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু এদেশে জেনারেল বুথের মুক্তিফৌজদলের আগমন উপলক্ষে শ্রীমদাচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করেন। সন্ধ্যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় মুক্তি ফৌজের দল ব্রহ্মমন্দিরে সঙ্গীত, প্রার্থনা ও বক্তৃতাদি করেন। কার্য্যের আরম্ভে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু প্রার্থনা করেন।

২১শে আগষ্ট, ৫ই ভাদ্র, রবিবার, স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র ও শ্রদ্ধেয় ভাই বলদেবনারায়ণের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক। পূর্ব্বাহ্ণে নবদেবালয়ে ভাই অক্ষয়কুমার নধ উপাসনা করেন। "ভৃত্যের আত্মপরিচয়" হইতে, কান্তিচন্দ্রের জীবনের বিশেষ কথা পঠিত হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, ভাই অখিলচন্দ্র রায় প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন। তাঁহার আত্মনিবেদনে শ্রদ্ধেয় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের আত্মত্যাগ, সেবা ও কর্ম্মের জীবন অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হয়।

২২শে আগষ্ট, ৬ই ভাদ্র, সোমবার, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনা-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক। এই উপলক্ষে সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। মহাত্মা রামমোহনের জীবনচরিত হইতে, এই ৬ই ভাদ্র তাঁহা কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনাপ্রতিষ্ঠার বিবরণ পঠিত হয়, এবং কি উদার সার্ব্বভৌমিক ভিত্তির উপর রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা উজ্জ্বলরূপে বর্ণনা করিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ১৮৬৫ সনের মিরার পত্রিকায় যে ইংরেজি প্রবন্ধ বাহির করেন, সেই প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পঠিত হয়। আত্মনিবেদনে বিশেষ দুইটী কথা উল্লেখ করেন। পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আপন আপন ভাবানুসারে উপাসনার মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাচীন হিন্দু সম্প্রদায় যদি পূজা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন, তবে হিন্দু ভিন্ন অন্য কাহারও সে মন্দিরে উপাস্য দেবতার পূজায় যোগদানের অধিকার থাকে না। মুসলমান সম্প্রদায় যদি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন, এস্‌লামধর্ম্মবিশ্বাসী ভিন্ন অন্য কাহারও সে মস্‌জিদে পূজা করিবার অধিকার নাই। খ্রীষ্ট সম্প্রদায় যদি ঈশ্বরোপাসনা জন্য গির্জ্জা ঘর প্রতিষ্ঠিত করেন, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরাই সেখানে উপাসনার অধিকার। কিন্তু মহামনা রাজা রামমোহন রায় নব যুগে ভারতে ব্রহ্মোপাসনার প্রতিষ্ঠা করিয়া, সে ব্রহ্মোপাসনার জন্য যে ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করিলেন, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, সে গৃহে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকের, জগতের স্রষ্টা, পাতা, পরিত্রাতা, একমাত্র ঈশ্বর যিনি, তাঁহার পূজায় সমভাবে অধিকার। এবং এই পূজার ভিতর দিয়া ক্রমে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলের যে স্বর্গীয় সম্মিলন, ইহা পৃথিবীতে এক নূতন কীর্ত্তি। এই কীর্ত্তিই রামমোহনের দীর্ঘ জীবনের বহু প্রকার মহৎ কার্য্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। ৬ই ভাদ্র, রামমোহন কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনা-স্থাপন যদিও অল্প কয়েকটী বন্ধুর সঙ্গে মিলনে আড়ম্বরশূন্য ব্যাপাররূপে আরম্ভ হয়, কিন্তু ইহারই সুমহৎ পরিণাম মহাসম্মিলনের ধর্ম্ম, প্রকাণ্ড নববিধান। দ্বিতীয় কথা, রামমোহন প্রাচীন ভারতের ঋষিজীবনের যে ব্রহ্মো-

পালনা নূতন আকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন, সে ব্রহ্মোপাসনা বিশেষভাবে অন্তর্ম্মুখীন আধ্যাত্মিক ব্যাপার, ইহা বিশদরূপে উল্লেখ করা হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী স্বর্গে।

আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দদেবের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী, ৬৭ বৎসর বয়সে, হঠাৎ গত ২২শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৬ঘটিকার সময়; ৭৬নং লিটনথিয়েটার রোডে, জ্যেষ্ঠা কন্যা ও জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীমতী সুধাংশুবিকাশিনী দেবী ও ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে, শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা ও রোগ শোক হইতে মুক্ত হইয়া, অমরলোকে ভক্ত পিতা মাতার সকাশে, সত্যবান্ পুতচরিত্র স্বামী দেবতার সঙ্গে দেবদেবীদলে মিলিত হইয়াছেন। যদিও তিনি হৃদ্‌রোগে অনেকদিন ভুগিতে ছিলেন, ইদানীং কিছুদিন জ্যেষ্ঠ জামাতার চিকিৎসাধীনে থাকিয়া, জ্যেষ্ঠা কন্যা ও জামাতার অক্লান্ত সেবা ও শুশ্রূষায় কথঞ্চিৎ ভালই বোধ করিতেছিলেন। সে দিন সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইবেন বলিয়া, স্নানাগার হইতে পরিষ্কৃত হইয়া আসিয়া, পূত বসন পরিতে পরিতে, হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, তাঁর পূত আত্মা স্বর্গোদ্যানে চিরবসন্তের রাজ্যে বেড়াইতে চলিয়া গেল। কুচবিহারের মহারাজা স্যার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের জ্ঞাতিভ্রাতা পুতচরিত্র কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ (senior) বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া দেশে ফিরিলে, স্বয়ং ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে জামাতারূপে বরণ করিয়া, তাঁহার প্রিয়তমা মধ্যমা কন্যা সাবিত্রী দেবীকে দান করিলেন। গজেন্দ্রনারায়ণের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজ্যের রাজরাণী, আর মধ্যমা কন্যা দীন প্রজার গৃহিণী। অনেক বৈষম্য হইলেও সাবিত্রী দেবী আত্মসম্মান ও আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, সংসারকে সুখের সংসারেই পরিণত করিয়াছিলেন। শারীরিক সৌন্দর্য্যে তিনি যেমন রূপবতী ছিলেন, অন্তরের সৌন্দর্য্য তাঁহার ততোধিক ছিল। বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তি, স্নেহবাৎসল্য, দয়া দাক্ষিণ্য, স্বজনপ্রীতি, বিনয়, দীনতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে ও সতীত্বের উজ্জ্বল গৌরবে তাঁহার জীবন মণ্ডিত ছিল। স্বামী স্ত্রী দুই জনে মিলিয়া, ভক্ত ব্রহ্মানন্দের অনুসরণে, অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সহিত কুচবিহারে নববিধানের সেবায় নিরত ছিলেন। সাবিত্রী দেবী পিতৃদেবের মুখবিনিঃসৃত অনেকগুলি প্রার্থনাও লিপিবদ্ধ করিয়া মণ্ডলীকে অশেষ ঋণে ঋণী করিয়াছেন। নববিধানের রাজ্য যাহাতে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয় এবং পিতৃদেবের লেখা ও উক্তি সকল সকলের অনায়াসলভ্য হয়, এইজন্য তাঁহার বড়ই আগ্রহ ছিল। প্রায় ১১ বৎসর হইল, স্বামী দেবতা অমরলোকে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পুণ্যস্মৃতি বক্ষে লইয়া, সে লোকে যাবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। ৫।৬ বৎসর হইল, অতি যত্নে ও পরিশ্রমে স্বামী দেবতার জীবনের পুণ্যকাহিনী পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া নিজকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার অভাব ভ্রাতা ভগ্নী পুত্র কন্যা ও আত্মীয় স্বজনগণের সহিত মণ্ডলীও বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন। আচার্য্যদেবের পঞ্চকন্যার মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম স্বর্গগামিনী হইলেন। জ্যেষ্ঠা ভগ্নী কুচবিহারের মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী শোকে তাপে বার্দ্ধক্যে জরাজীর্ণ হইয়া, অভিন্নহৃদয় চিরসহচরী ভগ্নী "বিমর" (সাবিত্রী দেবীর) শোকে বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। বিধানজননী সকল শোকার্ত্ত প্রাণে শান্তি বিধান করুন এবং পরলোকগত সতী আত্মাকে তাঁর অনন্ত শান্তিবক্ষে রক্ষা করুন।

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১৭ই সেপ্টেম্বর, শনিবারে, বঙ্গের কারখানার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অনিলকুমার ঘোষের একবৎসর বয়স্ক শিশুপুত্রের জন্মদিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—গত ২৬শে সেপ্টেম্বর, সোমবার, ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত সেনগুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ অসিতরঞ্জন সেন গুপ্তের সহিত, ধুবড়ি-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সরকারের কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী কৃপাকণার শুভবিবাহ নবসংহিতানুসারে, কলিকাতায়, ৬৩নং হ্যারিসন রোডস্থ ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অক্ষয়কুমার লধ আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করেন। ভগবান্ নবদম্পতিকে স্বর্গের শুভাশীষ দান করুন।

বিশেষ উপাসনা—ভারতের বহুকাল প্রচলিত অস্পৃশ্যতা ও বৈষম্যের জঘন্য কলঙ্ক অপনোদন উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজ প্রথম হইতেই চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন এবং তজ্জন্য মহাত্মা গান্ধীও প্রাণ পণ করিয়া যে মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ব্রত উদ্‌যাপনের সফলতাকল্পে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে, গত ২০শে সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যা ৬৷৷০ঘটিকায়, 'এলবার্টহল' এ বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। হলটী সর্ব্বশ্রেণীর লোকসমাগমে ভরপুর হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উদ্বোধন ও আরাধনা করেন, শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী পাঠ করেন, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপদেশ দেন। উপাসনা, পাঠ, উপদেশ ও সঙ্গীতাদি সময়োপযোগী ও সুন্দর হইয়াছিল।

পরলোকগমন—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১লা আশ্বিন, গিরিধিতে, ডাঃ দি, রায় (D. L.) ৭৮ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

তিনি যেমন বিদ্বান্ ছিলেন, তেমনি ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করিতেন। তিনি কাহারও মুখপানে না চেয়ে অনেক কাজ করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট ব্রহ্মানন্দের "সঙ্গতের" আলোচনা, পুস্তকাকারে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত যাহা সংগৃহীত ছিল, তাহা ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশের জন্য দান করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আচার্য্যদেবের জীবনবেদ বইখানিও অতি নিপুণতার সহিত, ভক্তিভাবে ভাবসামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে ব্রাহ্মসমাজ অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইল। ভগবান্ শোকার্ত্ত পরিবারে স্বর্গের সান্ত্বনা দান করুন এবং পরলোকগত আত্মাকে অনন্ত শান্তিবক্ষে রক্ষা করুন।

পারলৌকিক—গত ১২ই সেপ্টেম্বর, কমলকুটীরের নবদেবালয়ে, কুচবিহারের মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবীর বিশেষ আগ্রহে, তাঁহাদের মাতুলানীর (স্বর্গীয় বিহারীলাল মজুমদারের সহধর্ম্মিণী) পরলোকগমন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। ভগবান্ পরলোকগত আত্মাকে অনন্ত শান্তি ক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত জনগণের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন.

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ১৮ই সেপ্টেম্বর, ৪৪নং নিউ থিয়েটার রোডে, ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী, ডাঃ নবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত দেবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতৃদেবী স্বর্গীয়া ক্ষীরোদাসুন্দরীর আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উদ্বোধন করেন, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার আরাধনা করেন, অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগী পাঠাদির কার্য্য করেন। জ্যেষ্ঠপুত্রের সিন্ধুপারে বিদেশে অবস্থান হেতু কনিষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত দেবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় "মাতৃ-তর্পণ" ও প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। বেদপাঠ, বৈদিক গান ও সুমিষ্ট সঙ্গীতাদি যোগে অনুষ্ঠানটী সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল।

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৩।১ হরলাল দাস ষ্ট্রীট, স্বর্গীয় শরৎকুমার দত্তের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ অমিয়কুমারের পরলোকগত আত্মার কল্যাণার্থ এবং পুত্রহীনা মাতার ও ভ্রাতৃহীনা ভগ্নীর শোকসান্ত্বনার জন্য পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, ১নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে, কর্পোরেশনের শিক্ষকদিগের ট্রেনিং কলেজের হলে, ডাঃ সত্যানন্দ রায়ের সহধর্ম্মিণী বিধান-সেবিকা স্বর্গীয়া সুনীতি রায়ের ("নুনুর") আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস আরাধনা করেন, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক শ্লোকপাঠ ও পরবর্ত্তী অংশ সম্পন্ন করেন। ডাঃ সত্যানন্দ রায় প্রধান শোককারীর প্রার্থনাপাঠান্তে, "নুনুর" উন্নত ধর্ম্মজীবন ও পূত চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার বন্ধুর লিখিত সাক্ষ্য হইতে সারাংশ পাঠ করেন। ভাই প্রিয়নাথ সর্ব্বশেষে হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনা করেন। সুনীতি আপন জীবন দিয়া যে শিশুপুত্র রাখিয়া গেলেন, এ শিশু "সুনীতির পুত্র ধ্রুব" হইয়া মণ্ডলীর গৌরব বৃদ্ধি করুক। এই উপলক্ষে ডাঃ সত্যানন্দ রায় লক্ষ্ণৌ সাধু প্রমথলাল আশ্রমে ১৫০৲, করাচি নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে ১২০৲, কলিকাতায় সাধু প্রমথলাল শিক্ষাতীর্থে ৫০৲, পুরী নববিধান মন্দিরে ১০৲, কলিকাতা পুণ্যাশ্রমে ১০৲ ও হিমালয় ব্রহ্মমন্দিরে ১০৲ এবং ভ্রাতা ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ নববিধান প্রেসে ১০০৲, পুরী নববিধান মন্দিরে ৫০৲, "Behold the Man" মুদ্রণ ফণ্ডে ৫০৲ ও মুঙ্গের নববিধান মন্দিরে ২০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর, ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, প্রচার-কার্য্যালয়ে, স্বর্গীয় রামেশ্বর দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র দাসের আদ্যশ্রাদ্ধ পুত্রগণ কর্ত্তৃক নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উদ্বোধন ও আরাধনা করেন, ভাই অক্ষয় কুমার লধ শ্লোকাদি পাঠ করেন, ভাই অখিলচন্দ্র রায় হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনা করেন। মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ সুকুমার দাস প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। এই উপলক্ষে পুত্রগণ কলিকাতা প্রচার ভাণ্ডারে ৪৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ২৲, সাধু প্রমথলাল শিক্ষাতীর্থে ২৲, হাজারিবাগ ব্রহ্মমন্দিরে ২৲ ও মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে স্বর্গধামে নিত্যশান্তিতে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে ও আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদিগের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ২রা সেপ্টেম্বর, হাওড়ায়, ২৮নং নরসিংহ দত্ত রোডে, স্বর্গীয় ডাঃ শরৎকুমার দাসের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। ভাই অখিলচন্দ্র রায় বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হয়।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর, ৪২।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীটে, কন্যার গৃহে, স্বর্গীয় কুঞ্জবিহারী দেবের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন।

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর, আলীপুর উডল্যাণ্ডে, কুচবিহারের রাজপ্রাসাদে, কুচবিহারের স্বর্গীয় মহারাজা সার নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের স্বর্গারোহণদিন স্মরণে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী শোকে তাপে জীর্ণ ও জরাজীর্ণ প্রাণে ব্যাকুল প্রার্থনা করেন। মহারাজার উন্নত জীবনের পবিত্র স্মৃতি সকলেরই প্রাণে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। মহারাণী এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ৪০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ভাই প্রিয়নাথ এই পবিত্র অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য কুচবিহার গিয়াছিলেন। সেখানকার বিবরণ আগামীবারে দেবার ইচ্ছা রহিল।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ১৮ই আশ্বিন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৭ ভাগ।
১৮।১৯শ সংখ্যা।

১লা ও ১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯ সাল, ১৮৫৪ শক, ১০৩ ব্রাহ্মাব্দ।
18th October & 2nd November, 1932.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে দয়াময় পরব্রহ্ম, তুমি হিমালয়ে কৈলাসে, আমাদিগের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষদিগকে "অহমস্মি" বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিলে; বর্ত্তমান যুগে তুমিই আমাদের মা হইয়া, নববিধানে স্বয়ং আমাদের ভারতকে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য, যেন সেই ঊর্দ্ধলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়াছ। পাহাড় ভেদ করিয়া, গঙ্গা যমুনা যেমন দ্রবময়ী হইয়া, দেশকে উর্ব্বর ও শস্যশালী করিতেছে, তেমনি তুমি কঠোর ব্রহ্মজ্ঞান ভেদ করিয়া, মাতৃ-প্রেমে ও স্নেহে বিগলিত হইয়া, নিম্নভূমিস্থ দীন দুঃখী অজ্ঞান মূর্খ সন্তানদিগকে, স্বয়ং ধর্ম্মান্নবিকরণে প্রতি- পালন ও নব নব জীবনে পরিপুষ্ট করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আসিয়াছ। যুগে যুগে তুমি তোমার সন্তানদিগের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া, তাঁহাদিগকে তোমার অবতাররূপে প্রেরণ করিয়া, জগতের কল্যাণ ও মঙ্গল সাধন করিয়াছ; বর্ত্তমান যুগে তুমি স্বয়ং সন্তানদের দেখা দিতে অবতীর্ণ হইয়াছ এবং তাহাদের দুঃখ দুর্গতি দুরবস্থা দেখিয়া তাহা নিবারণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছ। তুমি যে নিরাকারা চিন্ময়ী, তাহাই নিত্য আছ; অথচ জীবন্ত ব্যক্তিরূপে মূর্ত্তি- মতী হইয়া, সভক্ত ও সসন্তানে, নববিধানে দিব্যরূপে সকলকার কাছে দেখা দিতে, সবার সঙ্গে কথা কহিতে, সবার কথা শুনিতে ও যাহার যাহা প্রয়োজন—তাহাই তাহাকে দিয়া পরিতুষ্ট করিতে আসিয়াছ। আমাদের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণ কেবল তোমাকে আত্মিক যোগে উপলব্ধি করিতেন, পৌরাণিক ও তৎপরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষগণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে অবতারে এবং মূর্ত্তিতেও তোমার পূজায় রত হইয়া ছিলেন; কিন্তু ক্রমে ক্রমে চিন্ময় তোমাকে ভুলিয়া, মৃন্ময়ী দেবতার পূজায় আমাদের আর্য্যপরিবার শক্তিহীন ও মৃতবৎ হইয়া পড়িল এবং ভ্রম ভ্রান্তিতে পড়িয়া ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইল। তাহা দেখিয়া, এবার তুমি নিজ শক্তি বিক্রম প্রকাশ করিয়া, আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত সকল প্রকার দুর্ব্বলতা ও পাপাসুর বিনাশ করত, আমাদিগকে জ্ঞান প্রেম পুণ্য শান্তিতে পূর্ণ করিবার জন্যই, প্রত্যক্ষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ। আশীর্ব্বাদ কর, মা, তোমাকে যেন জীবন্ত মারূপে, দুর্গতিনাশিনী আদ্যাশক্তি- রূপে পূজা করি এবং তোমার জ্ঞানের স্বরূপ সরস্বতী, প্রেমের স্বরূপ লক্ষ্মী, পুণ্যের স্বরূপ কার্ত্তিক এবং শান্তি ও সিদ্ধির স্বরূপ গণেশরূপে আমরা সকল নরনারী মূর্ত্তিমান্ ও মূর্ত্তিমতী হইতে পারি। তোমার প্রকৃত পূজার ফল তোমার স্বরূপলাভ; যেন তদ্দ্বারা আমরা তোমার সিংহ- বলপরাক্রান্ত ভক্ত হইয়া, সর্ব্বপ্রকার পাপাসুর-নিধনে

ধন্য হই, এবং জাতীয় গৌরব রক্ষা করিয়া, তোমার নববিধানকে জয়যুক্ত করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ভারতের পুনরুদ্ধার।

প্রাচীন ভারত যে এখন অধঃপতিত, তাহা সকলেই স্বীকার করিতেছেন। ধর্ম্মবিজ্ঞানবিদ্গণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এ অধঃপতনের কারণ পৌত্তলিকতা বা জড়বাদ ও জাতিভেদ।

যে আর্য্যজাতি এক সময়ে হিমালয়ে সেই চিন্ময় নিরাকার পরব্রহ্মের যোগধ্যানে ও দর্শনশ্রবণে দিবানিশি মগ্ন থাকিতেন, সেই আর্য্যজাতির বংশধরগণ মৃৎপুত্তলিকা কল্পনা করিয়া তাহারই পূজা করিতেছেন এবং তাহাতেই শত শত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া কতই জাতিবিভাগ রচনা করিয়াছেন। মৃত্তিকা যার উপাস্য, সে মৃত্তিকাবৎ মৃত না হইয়া, আর কি হইবে? স্ব স্ব মত যাহাদের পথ, তাহারা বিভিন্নপথাবলম্বী হইয়া বিচ্ছিন্ন ত হইবেই।

তাই এই মৃৎপুত্তলিকাপূজার উচ্ছেদের জন্যই, বিধাতা বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া, সেই এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনের পূজা পুনঃ প্রবর্ত্তন করিলেন।

তাহার পর নববিধানে সেই একই নিরাকার পরব্রহ্মের পূজা-প্রণালী সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের আকারে পরিণত করিয়া, তাহার সঙ্গে সঙ্গে একধর্ম্ম-সাধনে এক জাতি, এক পরিবার হইবার উপায় বিধান করিলেন এবং চিরতরে সর্ব্বপ্রকার জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধন করিলেন। এই বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধান ভারতকে অধঃপতন হইতে পুনরুদ্ধার করিবার জন্যই অবতীর্ণ।

একমাত্র অদ্বিতীয় জীবন্ত জাগ্রৎ পরব্রহ্মের পূজাতেই জাতিভেদ বিনাশ পাইয়া, ভ্রাতৃত্ব-মিলন ও একজাতিত্ব-সমাধান হইবে; এবং তাহাতেই ভারত আবার পুনর্জীবন লাভ করিবে।

"Union is strength"—মিলনই বল। "United we stand and divided we fall."—একতাতেই আমরা উঠিব, বিচ্ছিন্নতাতেই আমাদের পতন চিরদিন থাকিবে। এই বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধান করিতে আমরা সকল ব্রাহ্মমণ্ডলীকে অনুরোধ করি।

আমরা একেশ্বরের পূজা ও এক মানব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা দ্বারা ভারতের ও জগতের উদ্ধারের জন্য বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম পাইয়াছি। কিন্তু কার্য্যতঃ, হায়! আমরা কি আমাদের উচ্চ ধর্ম্ম পালন করিতে পারিতেছি? নিঃসঙ্কোচে সত্য যাহা, তাহা যেন আমরা স্বীকার করি। রোগ ধরা পড়িলে চিকিৎসার সুব্যবস্থা হয়। রোগ গোপন করিলে মৃত্যু আসিয়া অচিরে গ্রাস করে। আমরা কি স্বীকার করিব না, আমরা বাহিরে পুত্তলিকা-পূজা ত্যাগ করিয়াছি বটে, কিন্তু এখনো আমরা নিজ নিজ মনঃকল্পিত দেবতা গঠন করিয়া পূজা করিতেছি, বা হয়ত শূন্যের পূজা করিতেছি? তাহা লইয়াই পরস্পরের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিতেছি ও নূতন ভাবে আবার যেন জাতিভেদ রচনা করিতেছি। একই জীবন্ত ঈশ্বরের পূজা করিলে, কি কখনও এত মতভেদ এবং দলভেদ আমাদের মধ্যে আসিতে পারে?

ব্রাহ্মসমাজের এক অখণ্ড মণ্ডলী এই যে ত্রিশাখায় পরিণত হইয়াছে, ইহার মধ্যে পরস্পরের ভিতর কতই মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে এবং সত্য সত্যই যেন জ্ঞাতিগত, জাতিগত ভেদাভেদের ভাব অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহা কি একান্তই সাংঘাতিক নয়? ইহাতে আমাদের সর্ব্বনাশ এবং ভারতেরও সর্ব্বনাশ আমরা আনয়ন করিতেছি। যে ধর্ম্মবলে ভারতকে ও সমগ্র জগৎকে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ হইতে উদ্ধার করিয়া, সর্ব্বত্র ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন করিতে আমরা আসিলাম, তাহারই বিরুদ্ধাচরণ করিলে আমরা কি ঘোর দণ্ডে দণ্ডিত হইব না?

কত নূতন নূতন ধর্ম্ম ও প্রতিষ্ঠান সকল উত্থিত হইয়া, এখনই আমাদিগকে কতই লজ্জা দিতেছে এবং আমাদের এ বিচ্ছিন্নতা, দলাদলি ও জ্ঞাতিবিবাদের সুযোগ লইয়া, কতই তাহারা আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া আগে আগে ধাবিত হইতেছে। ইহাতেও এক্ষণে কি আমাদের চক্ষু খুলিবে না? এখনও কি আত্মপরীক্ষা করিয়া, আত্মরোগ ধরিয়া, তাহা নিবারণের জন্য আমাদের সংকল্প হইবে না? ভারত যে বর্ত্তমান অধঃপতন হইতে উদ্ধার পাইতেছে না, ভারতের জাতিভেদ সম্প্রদায়ভেদ উচ্ছেদ না হইয়া বরং আরো যেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহার জন্য দায়ী কি ব্রাহ্মসমাজ নয়? তাহার জন্য অপরাধী কি আমরা প্রত্যেকে নই? ব্রাহ্মসমাজ যে সঙ্কীর্ণ দল হইয়া পড়িতেছে, নববিধানের দল যে এত

কমিয়া যাইতেছে, ইহার কারণ আমাদের নিজ নিজ মনঃ-কল্পিত দেবতার পূজা এবং পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্নতা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

জীবন্ত সত্য ঈশ্বরের পূজায় নিশ্চয়ই জীবন লাভ হয়। মৃত মৃত্তিকার বাঘের মুখে হাত দাও, সে কিছুই বলিবে না; কিন্তু জীবন্ত বাঘের মুখে হাত দিলে সে নিশ্চয়ই গ্রাস করিবে। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দিলে কেহ কি দগ্ধ না হইয়া বাঁচিতে পারে? তেমনি জীবন্ত সত্য দেবতার পূজা করিলে সকল আমিত্ব বিনাশ পাইবেই পাইবে, সকল মতভেদ ও দলভেদ চলিয়া যাইবেই যাইবে। তাহা করিতেছি না বলিয়াই আমাদের এত দুর্গতি হইতেছে।

দেশে যে মৃন্ময়ী দুর্গার পূজা হইল, তাহাতে কল্পনার তুলিতে কি উচ্চ ভাবই রচিত হইয়াছে; কিন্তু সাধকদের জীবনে কি সে ভাব মূর্ত্তিমান্ হয়? তাই ভারত মৃত পুত্তলিকার পূজায় এমন মৃতপ্রায় ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। যদি জীবন্ত আদ্যাশক্তির পূজা হইত, নিশ্চয়ই পাপাসক্তির নিধন হইত এবং জ্ঞানৈশ্বর্য্যে, পুণ্য সৌভাগ্যে ও নিত্য সিদ্ধিতে জীবন সমুন্নত হইত। তাহারই জন্য এখন মা দুর্গা নববিধানে জীবন্ত রূপে অবতীর্ণ। সেই একই জীবন্ত মার যদি পূজা করি, নিশ্চয়ই এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক পরিবার, এক অখণ্ড মণ্ডলী ও এক সম্প্রদায় হইয়া, দেশ, জাতি ও জগৎ ঐক্য-বন্ধনে আবদ্ধ হইবে এবং পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। মা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমাদের সবার দৃষ্টি এই একই মার চরণে নিপতিত হয় এবং একই মার পূজায় নিরত হইয়া, সমগ্র দেশ, জাতি ও জগতের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করিয়া, নববিধানের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন ও সপ্রমাণ করি, এবং সকল জাতিভেদ নির্ম্মূল করিয়া ঐক্যবন্ধনে এক পরিবার হই।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

মূর্ত্তি-পূজা হইতে শিক্ষা।

আদ্যাশক্তি ভগবতী নিরাকারা চিন্ময়ী। নিরাকারকে শূন্যাকার ভাবিয়া সাধক তাঁর ধারণা করিতে পারিলেন না, তাই উপমা-যোগে প্রতিমা গঠন করিয়া প্রত্যক্ষ দৃষ্টি-গোচর করিলেন, এবং তাঁহার নিরাকার স্বরূপগুলিকেও মৃত্তিকার মূর্ত্তিতে গড়িয়া, একখানি মেড়ে গাঁথিয়া বেদীতে বসাইয়া পূজা করিলেন। মৃত্তিকার মূর্ত্তির ত প্রাণ নাই, তাই মন্ত্রোচ্চারণে তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। সাধকের সাধ্য সাধনা যতদূর হয়, তাহা করিয়া তিনি উৎসবে মাতিলেন; কিন্তু বাস্তবিকই কি ইহাতে পূজার উদ্দেশ্য সংসাধিত হইল? প্রকৃত পূজার উদ্দেশ্য শক্তি-পূজায় শক্তিলাভ, স্বরূপারাধনায় জীবনে স্বরূপ মূর্ত্ত করা। যাহা মৃত্তিকায় মূর্ত্ত, তাহা যদি জীবনে প্রতিফলিত হয়, তবেই স্বরূপারাধনা যথার্থ হইবে, ইহাই শিক্ষা দিবার জন্য যেন এই মৃন্ময়ী প্রতিমা পূজার প্রবর্ত্তনা। আদ্যাশক্তিকে পূজা করিয়া যদি সেই শক্তি লাভ না হয়, যদ্দ্বারা পাপাসক্তিকে সিংহ-বলে নিধন করিতে পারি, তাঁর জ্ঞানস্বরূপের আরাধনায় যদি সরস্বতীর ন্যায় শুভ্র জ্ঞান-জ্যোতিঃ জীবনে প্রতিফলিত না হয়, প্রেমস্বরূপের আরাধনায় যদি জীবন লক্ষ্মীবন্ত না হয়, শুদ্ধস্বরূপের আরাধনায় যদি নবকার্ত্তিকের মত জীবন সুন্দর না হয়, আনন্দ-স্বরূপের আরাধনায় যদি সর্ব্বসিদ্ধি লাভ না হয় ও জীবন মানবশ্রেষ্ঠ গণেশের মত না হয়, তাহা হইলে স্বরূপারাধনা প্রকৃত হয় না। জীবনে স্বরূপ মূর্ত্তিমান্ হওয়াই প্রকৃত পূজার উদ্দেশ্য। এইভাবে যেন আমরা আরাধনা করিয়া, মার স্বরূপ জীবনে মূর্ত্তিমান করিতে পারি এবং মার শক্তিপ্রভাবে ভক্তসিংহ-বলে বলীয়ান্ হইয়া নববিধানকে জীবনে জয়যুক্ত করিতে পারি।

উপাসনায় একাত্মতা।

উপাসনায় একাত্মতা-সাধনের জন্য শ্রীমৎ আচার্য্যদেব এক বার প্রেরিতদিগকে লইয়া ব্রহ্মমন্দিরে মিলিত উপাসনা সাধন করেন। তিনি স্বয়ং উদ্বোধন করেন এবং প্রেরিতগণের এক একজনকে দিয়া এক একটি স্বরূপ আরাধনা করান, আবার প্রার্থনা শান্তিবাচন আচার্য্যই করেন। এরূপভাবে সাধন মাত্র একই বার হইয়াছিল। ইদানীন্তন আমরা মাঝে মাঝে, উপাসনার এক এক অঙ্গ এক এক জন সম্পাদন করিয়া, উপাসনায় একাত্মতা-সাধনের চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু সকল সময় ঠিক এক উপাসনা-সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি, বলিতে পারি না। একভাবাপন্ন, একসাধনশীল ব্যক্তিগণ একই পবিত্রাত্মা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, একই ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই, তবে যথার্থ একাত্মতা সাধন হয়। বিভিন্নভাবাবলম্বী ব্যক্তিগণ, যাঁদের মত, বিশ্বাস, ভাব, শিক্ষা, সাধন এক নয়, তাঁহাদের কেমন করিয়া উপাসনাতে ঐক্য হইবে? এক পবিত্রাত্মায় সকলে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিলেই, একাত্মতা সাধন হয়। কারণ তখন তিনিই এক উপাসনা করান।

প্রতাপ-চরিত্র।

(স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের স্মৃতিউপলক্ষে লিখিত)

"সেই নববৃন্দাবনে, নিত্য লীলা দরশনে,
করিব সদলে স্বর্গবাস।"

নববিধানে জীবনের আদর্শ এই—নববৃন্দাবনে নিত্যলীলা দর্শন, সদলে স্বর্গবাস।

"দীক্ষাগুরু, আপনার চরণতলে আজি কি মস্তক অবনত করিব না? যে দিন শান্তিকুটীরে, সেই সুগম্ভীর, প্রশান্ত মূর্ত্তির সম্মুখে, গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বনের প্রারম্ভে, আত্মীয়গণের সম্মুখে, যাঁহার সহিত চিরদিনের তরে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইবে, তাঁহারই সহিত সমস্বরে, নববিধানের মূলমন্ত্রে বিশ্বাস মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলাম, সেই দিন কি নববিধানের শ্রীমন্দিরের, শ্রীনববৃন্দাবনের দ্বার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয় নাই?"

আজ চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইল, "শ্রীনববৃন্দাবন" প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে, এই কথা লিখিয়াছিলাম। পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে, কমলকুটীরে রঙ্গমঞ্চে "নববৃন্দাবন" নাটক প্রথম অভিনীত হয়। মধুর ঐকতান বাদনের পর রঙ্গমঞ্চের যবনিকা উত্তোলিত হইল; তিনটী ঋষিক্ মূর্ত্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান—জটাজুটধারী, পরিধানে গৈরিক বসন, হস্তে একতন্ত্রী—ত্রিমূর্ত্তি। নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, নববিধানের সুদক্ষ বার্ত্তাবহ ঋষি প্রতাপচন্দ্র ও সঙ্গীতাচার্য্য চিরঞ্জীব ত্রৈলোক্যনাথ। সুকণ্ঠের মধুর সঙ্গীত নববৃন্দাবন দর্শনের জন্ম সকলকে সাদরে আহ্বান করিল। তখন আমি বালক, ১০ বৎসরের অধিক হইবে না, কিন্তু যাহা চক্ষে দেখিলাম, কর্ণে শুনিলাম, আজ ৫০বৎসর পরেও সেই সুন্দর মনোরম দৃশ্য, সেই মধুর সঙ্গীত, পূর্ণ মাত্রায় প্রাণে প্রতিভাত হইতেছে। সেরূপ যে দেখেছে, সে মজেছে, কোনও দিন ভুলিতে পারিবে না। অপরকে বোঝান অসাধ্য, সম্যক্ বর্ণনা করা অসম্ভব। "তাহা আকুল বর্ণিবারে, নাহি পায় কথা"।

শাস্ত্রে লিখিত হইল, পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া জানিবে; দীক্ষাগুরু তিনি পিতৃস্থানীয় ছিলেন, আর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতার স্থায়, তাঁর সুগম্ভীর প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তি দর্শনেই, কত লোকে কত ভাবে যে আকৃষ্ট হতেন, তাহা বলা যায় না। বক্তৃতাস্থলে, উপাসনাস্থলে, ধর্ম্মপ্রসঙ্গস্থলে, সকলে তাঁর মুখের দিকে নিনিমেষ নয়নে তাকাইয়া থাকিত; শুধু কথায় নয়, তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে, তাঁর নানাপ্রকার সুমধুর অঙ্গভঙ্গীতে মনের ভাব সকল সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইত। এই নশ্বর দেহ ভগবানের দান, তাঁর আবাসস্থান, ভগবদৈশ্বর্য্যে পূর্ণ রাখা যে কর্ত্তব্য, তাহার জলন্ত প্রমাণ তিনি দিয়াছিলেন। স্বাস্থ্যরক্ষা, শরীরের সৌন্দর্য্য-সাধন ধর্ম্মের যে একটী অঙ্গ, তাহা কতবার যে তিনি উপদেশ দিয়াছেন।

সেই অভিনয়ে অভেদানন্দ স্বামীর সাজে, যখন সদ্যমুক্ত, অনুতপ্ত 'অবিনাশ' ও তাহার সহধর্ম্মিণীকে গিরিগুহা মধ্যে ধর্ম্মোপদেশ দান করিতেছেন—সে আর এক দৃশ্য। নববিধানে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সাধন, সংসারে সন্ন্যাসী জীবন পালন, গৃহে তপোবন সৃজন, বিশুদ্ধ সুখী পরিবার সংগঠন—এই সকল কথা যখন সেই মুখ হইতে উচ্চারিত হইতেছিল, সমগ্র দর্শকবৃন্দ নিস্তব্ধ ও একাগ্র চিত্ত হইয়া শ্রবণ করিতেছিলেন। সে সকল কথা যে তাঁর প্রাণের কথা, সে সকল আলোচনা যে তাঁর জীবনবেদের আবৃত্তি; তাই ত এত মর্ম্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। গৃহস্থ তিনি ছিলেন গৃহস্বামী তিনি ছিলেন, গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালনে ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ তিনি হইয়াছিলেন। তাই তাঁর জীবন-পরিচয়ে, এই পথের পথিক যাঁরা, এই ভাবের ভাবুক যাঁরা, কত উপকৃত হন।

কলিকাতা টাউন হলে, 'মাঘোৎসব' উপলক্ষে বার্ষিকী বক্তৃতায় তাঁর আর এক প্রকাশ। সমগ্র বৎসরের সঞ্চিত হৃদয়ের ভাব, কত সাধনা, কত তপস্যার ফল, কত ব্যথিত হৃদয়ের প্রার্থনা ও আকুল ক্রন্দনের সমষ্টি, যখন সেই একদিনে উচ্ছ্বসিত হইয়া, উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া, উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত, কার সাধ্য যে বিবেক রুদ্ধ রাখে'।

খসিয়াংএ শৈলাশ্রম তাঁর যোগোদ্যান। প্রত্যহ প্রাতঃভ্রমণে প্রথম ঘণ্টা তিনি একাকী; প্রকৃতির উপাসক, প্রকৃতির দেবতাকে আপন প্রকৃতিতে একাকী নির্জ্জনে দর্শন করিতেন, সম্ভোগ করিতেন, আস্বাদ করিতেন, এই তাঁর যোগাভ্যাস। তৎপরে বন্ধু আত্মীয়গণের সহিত মিলিত হইয়া, গিরিশিখরে রম্যস্থানে পরিভ্রমণের আনন্দ সম্ভোগ করিতেন। সদা উন্নতশির, নীচের দিকে তিনি তাকাইতেন না, আর সকলকে সর্ব্বদা উচ্চের দিকেই লইয়া যাইতেন। "নীচতা, নীচাশয়তা সর্ব্বদা পরিহার কর", এই কথাই তাঁর মুখে শুনা যাইত। ধীরে ধীরে, সতেজে, সগর্ব্বে, উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রদেশে গিরিশিখরে তিনি আরোহণ করিতেন। ক্লান্তি তাঁর ছিল না, শ্রান্তিবোধ হত না, অতি সত্বরে, অতি উচ্চস্থানে তিনি অধিরোহণ করিতেন; তাঁর সঙ্গ রাখা, তাঁর সঙ্গে সমভাবে চলা অনেকেরই ক্লেশকর বোধ হইত। আর এক দৃশ্য ঐ পর্ব্বতোপরি অশ্বারোহণে তাঁর পরিভ্রমণ। সেই তেজস্বী বীরের মূর্ত্তি, সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। "Galahad—The Pure and Strong."

"দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি, কোথা তুমি যাওরে,
সমর তুরঙ্গ যেন, হ্রেষে না ফিরাও রে।"

জীবন-সংগ্রামে, জলন্ত জীবন্ত তেজস্বী বীরের মূর্ত্তি।

সত্যের পথে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায়, সূক্ষ্ম ধর্ম্মের পথে, পাপ অপবিত্রতার সহিত ভীষণ সংগ্রামে, এই বিজয়ী পুরুষের মূর্ত্তি সকলের আরাধ্য, উপাস্য। সকল প্রকার নির্য্যাতনের ক্রুশ তিনি শান্ত সমাহিত চিত্তে বহন করিয়াছিলেন। স্বর্গস্থ পিতার প্রিয়সন্তান সেই ক্রুশবাহী যিশুদেবকে, জীবনের আদর্শস্থানে, পরম পিতার সন্তানদের আদর্শস্থানে তিনি বরণ করিয়াছিলেন। যিশুখ্রীষ্ট যে "Oriental, Asiatic," প্রাচ্যদেশের নিজস্বধন, তাহা তিনি তাঁহার লেখায়, তাঁহার নিজের জীবনে অকাট্য ভাবে প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। শৈলাশ্রমে "তুমি আর আমি, মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে", এইভাবে সাধন করিতেন; আবার কলিকাতা নগরে, উপাসনা-মন্দিরে, সভাসমিতিতে, মণ্ডলীর কত পরিবারে সজন সাধন, পরিবার গঠন, মণ্ডলী গঠন, এই সকল কার্য্যে নিজেকে নিয়োজিত করিতেন। পাপকে তিনি ঘৃণা করিতেন, পাপীকে সক্রোধে তিরস্কার করিতেন, কিন্তু তিনি ক্ষমার পরিচয় দিতে কোন দিন পরাঙ্মুখ হন নাই। ক্রুশে নিবদ্ধ তাঁর আদর্শ পুরুষের ন্যায়, সকলকে তিনি ক্ষমা করিতেন, পরম পিতার নিকট সকলের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন। আকুল প্রার্থনা কালে দরদর ধারে নয়নকোণে অশ্রু প্রবাহিত হইত। সমাজের জন্য, মণ্ডলীর জন্য, ভাই ভগিনীদের জন্য, সমগ্র জগতের জন্য কতই না ব্যাকুল প্রার্থনা তিনি করিয়াছেন। "আহা কাঁদিলেন কাতরে কত, হরিপদ বক্ষে ধরি।"

পরিবারে তাঁর নিজের সন্তান ছিল না, কিন্তু যুবক যুবতীকে তিনি স্নেহের চক্ষে, ভালবাসার চক্ষে দর্শন করিয়া, সন্তানতুল্য আদর যত্ন ও শিক্ষা দিয়াছেন। ভারতাশ্রমে মহিলাদিগের শিক্ষার ভার তিনি লইয়াছিলেন, কতজন তাঁর কক্ষায় স্থান পাইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার অভাব দেখিয়া, উচ্চতর শিক্ষা দিবার জন্য, যুবকদিগকে যথার্থ মানুষ তৈয়ার করিবার জন্য, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নত করিবার জন্য, "Society for The Higher Training of Young Men" গঠিত করিলেন; দেশের সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে সম্বদ্ধ করিলেন এই উদ্দেশ্যে। তাঁর চরিত্রপ্রভাবে, সেই পরশমণিসংস্পর্শে কত যুবক চরিত্রবান্ হইলেন, তাঁর যথার্থ সন্তান নামের যোগ্য হইলেন।

চির সুন্দর দেবতার পূজা আরাধনায়, উপাসক পূজারী কিরূপ সৌভাগ্য লাভ করে, তিনি তাহার জলন্ত প্রমাণ। সত্যের সাধনায়, জীবনপথে সত্যনিষ্ঠ হইয়া কিরূপ অসমসাহসিকতার সহিত, সত্যের প্রচার করিতে হয় এবং অবশেষে সংগ্রামে জয়ী হইয়া, সত্যের বিজয় নিশান উড়াইয়া, সত্যধামে প্রবেশ করিতে হয়, চিরশান্তিতে সমাহিত হইতে হয়, এই জীবনই তাহার পরিচয়। আর সেই মঙ্গলময় দেবতার পূজা আরাধনার বরলাভে, জগতের কল্যাণ-সাধনে নিজেকে কিরূপে বিলাইয়া দিতে হয়, আত্মবিতরণে সকলের কল্যাণ সাধন ও আত্মবিসর্জ্জনে সকলকে আপনার কিরূপে করিতে হয়, তাহা এই মহান্ চরিত্রে সকলে দর্শন করুন।

সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের পরপারে, মার্কিন যুক্তপ্রদেশে, 'সিকাগো' নগরে, Parliament of Religionsএর মহাসভায়, যুগধর্ম্মবার্ত্তা লইয়া প্রেরিত প্রতাপচন্দ্র উপস্থিত। সেখানে অশোকরাজার সকল ধর্ম্মের সখ্য, বাদশা আকবরের সুখস্বপ্ন সকলের প্রত্যক্ষ। বজ্রগম্ভীরস্বরে প্রাচীন ভারতের মহিমার কথা, গৌরবের কথা সর্ব্বসমক্ষে যখন তিনি কীর্ত্তন করিলেন, নূতন ভারতে নবধর্ম্মের অভ্যুদয়ের কথা, সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় নববিধানের কথা ঘোষণা করিলেন, তখন সকলেই স্তম্ভিত, মুগ্ধ; সকলেরই তনু রোমাঞ্চিত, প্রাণমন পুলকিত। সমগ্র জগতে যে সমন্বয়ের ভাব সবে মাত্র অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহারই সম্বন্ধে কত উচ্চ কথা, কত গভীর কথা, কত আনন্দের সুসমাচার তাঁরই মুখে শুনিয়া সকলে আনন্দিত হইলেন। কত আদর, কত অভ্যর্থনা, কত শুভ সম্ভাষণ তিনি লাভ করিলেন; বিদেশকে স্বদেশ করিলেন, বিদেশবাসিগণকে আপনজন আত্মীয় স্বজনে পরিণত করিলেন। পিতার প্রিয়সন্তানের কণ্টক-মুকুট গৌরবময় স্বর্ণমুকুটে পরিণত হইল।

তাই "বলরে বলরে বলরে, ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্"।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন।

—•—

"ধর্ম্ম-সাধন"।

(আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের সঙ্গতের আলোচনা)

৩১শ—৪২ সংখ্যা—২৫শে মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪।

(গিরিধির ডাঃ ডি, রায় হইতে প্রাপ্ত)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী সঙ্গতসভার সাম্বৎসরিক উৎসব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথম বৎসর সঙ্গতে যে সব বিষয়ের আলোচনা হয় তাহার সিদ্ধান্ত সকল পরে পুস্তকাকারে 'ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান' নামে প্রচারিত হয়। তাহাতে এই কয়েকটী বিষয় প্রকটিত হইয়াছে:—

১। উপাসনা। ২। আত্মপরীক্ষা। ৩। আমোদ। ৪। অর্থব্যয়। ৫। অভ্যর্থনা। ৬। সময়। ৭। সত্য বাক্য। ৮। নির্ভর। ৯। কর্ত্তব্য। ১০। কৌতুহল। ১১। পৌত্তলিকতা। ১২। সংসার। ১৩। প্রীতি। ১৪। মোহ। ১৫। ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ। ১৬। পবিত্রতা। ১৭। কর্ত্তব্যশ্রেণী। ১৮। লোকভয়। ১৯। ত্যাগস্বীকার।

এই সকল বিষয় কেবল কথায় ছিল, তাহা নহে। আলোচনার সময় সকলে তৎসম্বন্ধে আপনার আপনার মনের ভাব

অকপটে প্রকাশ করিতেন এবং যাহা সিদ্ধান্ত হইত, যে উপায় নির্দ্দিষ্ট হইত, প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক সকলে তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন এবং তৎপরক্ষণ হইতেই সকলের কার্য্যে তাহা প্রকাশিত হইত। একদিন স্থির হইল, 'প্রতিদিন দুইবার ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য,' তৎপর দিন প্রত্যেকের জীবনে মিলাইয়া লও, তাহার পরিচয় পাইবে। যে দিন সিদ্ধান্ত হইল, 'পৌত্তলিক কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করা পাপ,' তৎপরক্ষণ হইতেই সকলে পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব একবারে কাটিয়া ফেলিলেন। যে দিন নির্দ্দিষ্ট হইল, 'লোকভয়ে ব্রাহ্মোচিত কোন কার্য্য করিতে বিরত হইব না,' তদ্দিন হইতেই সকলে স্বর্গীয় সাহসে কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তাড়না, গঞ্জনা, সহস্র ত্যাগস্বীকার সকলি ঈশ্বরের আজ্ঞায় মস্তক পাতিয়া সহ্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। সঙ্গতের সভ্যগণের এইরূপ কথা লইয়া 'ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান' পুস্তক সংরচিত হয়। ১৭৮৩ শকে সঙ্গতের প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে, মহর্ষি দেবেন্দ্রবাবু অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন এবং ইহা অদ্বিতীয় পুস্তক, যতকাল চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ইহার কথা সকল অখণ্ড্য থাকিবে, এইরূপে সহস্র স্বরে ইহার গুণগান করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ তৎকালে তিনি এই পুস্তকখানি বেদবাণী স্বরূপে অন্তরের সহিত গ্রহণ করেন এবং 'উপবীতধারণ পৌত্তলিকতার চিহ্ন' ইহাতে লিখিত দেখিয়া আপনি উপবীত পরিত্যাগ করেন।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, ৯জন সভ্য লইয়া প্রথমে সঙ্গত-সভা হয়। ক্রমে ইঁহাদিগের সহিত অন্যান্য ব্রাহ্মগণ যোগ দেওয়াতে, সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইঁহারা সকলেই উৎসাহবান্ এবং অনুষ্ঠানে অগ্রসর। যাঁহারা সে প্রকার ধাতুর ব্রাহ্ম নহেন, তাঁহারা প্রায় ইহাতে যোগদান করিতেন না। সঙ্গতের সভ্যসংখ্যা যখন বৃদ্ধি হইল, তখন শুক্রবার কলুটোলার ভবনে যেরূপ সঙ্গত হইত, কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে তদনুরূপ কয়েকটী পারিবারিক সঙ্গত সংস্থাপিত হইল। আবার ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রবাবুর বাটীতে এক একটী মাসিক সাধারণ সঙ্গত হইতে লাগিল। ইহাতে ব্রাহ্মমণ্ডলী মধ্যে ধর্ম্মের যেরূপ মধুর যোগ ও জীবন্ত ভাব লক্ষিত হইতে লাগিল, সেরূপ আর কখন দৃষ্ট হইল না।

১৭৮৩ হইতে ৮৬ শক পর্য্যন্ত সঙ্গতের কার্য্য সুন্দররূপে চলিতে লাগিল। ১৭৮৪শকে ব্রাহ্মবন্ধুসভার সহিত ইহার গূঢ় যোগ সংস্থাপিত হয় এবং ব্রাহ্মবন্ধু সভায় যে সকল আলোচনা হইত, কি উপায়ে তাহা কার্য্যে পরিণত করা যাইবে, সঙ্গত নির্দ্ধার্য্য করিয়া দিতেন। এতদিন স্ব স্ব জীবনসংক্রান্ত কথা হইত, এখন তাহার সহিত সামাজিক কার্য্য সংযুক্ত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার, অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিসাধন এবং ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণ ও প্রকটন এই কয়েকটী প্রধান উদ্দেশ্য হইল। সঙ্গতের সভ্যগণ কিছুকাল এই সকল বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছিলেন, কিন্তু তৎসঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধীয় আলোচনা করিতে বিস্মৃত হন নাই। উল্লিখিত কয়েকটী বিষয়ের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার বিষয়েই সঙ্গত হইতে সমধিক স্থায়ী ও কার্য্যকর উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। সঙ্গতের প্রত্যেক সভ্যকে সাধ্যমত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে, ইহা একটী নিয়মস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়; এতদ্ব্যতীত কতকগুলিকে যাবজ্জীবন প্রচারব্রতে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে স্থির হয়। সভাপতি মহাশয় সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন, প্রত্যেক সভ্য আপনার আপনার (Mission) ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কার্য্য স্থির করিয়া লন। তিনি শেষোক্ত প্রস্তাবের যখন প্রথমোল্লেখ করিলেন, সকলে তাহা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া অগ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু অনেকদিন ক্রমাগত এই বিষয়ের আন্দোলন চলিতে লাগিল। তিনি নিজে ইতিপূর্ব্বে এক প্রকার বিষয়কার্য্য ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রথমে প্রকাশ্যে প্রচারব্রত অবলম্বন করেন। অন্যান্য উৎসাহী ব্রাহ্ম ক্রমে তদনুবর্ত্তী হন। এবং কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে একটী স্বতন্ত্র প্রচারবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭৮৬ শকের ফাল্গুন মাসে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের গৃহ-বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। একদিকে ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টী বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ, অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন অধ্যক্ষগণ। এই শেষোক্ত ভ্রাতৃগণ সকলেই সঙ্গতসভার সভ্য। অতএব প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন দলের সহিত সঙ্গতসভার সভ্যগণেরই বিরোধ উপস্থিত হইল। প্রাচীন সম্প্রদায় জাতিভেদ, উপবীতধারণ প্রভৃতির পোষকতা করিতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিতান্ত ভীত হইয়া হিন্দু সমাজের আবরণে আপনাদের শরীর ঢাকিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গতের সভ্যগণ 'সত্যমেব জয়তে নানৃতং, 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং' এই মহাবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া সমুদায় পৌত্তলিকতার বন্ধন ছেদন করিতে এবং সাহসপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অনেক দিন হইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 'শির দেয়াত রোপা কেয়া' ইহা তাঁহাদের স্বর্গীয় সাহসবাক্য ছিল। এখন কি কোন প্রকার অনুরোধ, প্রলোভন বা ভয়ে তাঁহারা পৌত্তলিকতা ও সংসারের সহিত সন্ধি করিয়া চলিতে পারেন? সুতরাং তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। সঙ্গতের সভ্যগণ এই সময়ে যে কিরূপ পরীক্ষার অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। প্রাচীন ব্রাহ্মসমাজের সমুদায় কার্য্যভার হইতে তাঁহারা বিদায়প্রাপ্ত অথবা দূরীভূত হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ধনহীন এবং জগতের গণনায় নিতান্ত বহির্ভূত। কোন স্থানে বিশুদ্ধ সামাজিক উপাসনা সম্ভোগ করিবার যে সান্ত্বনা লাভ করিবেন, সে পথও রহিল না। এই অবস্থায় তথাপি তাঁহারা সঙ্গতসভা ছাড়িলেন না, বরং নিরুপায়

কয়েক ভ্রাতা পরস্পরের মুখদর্শন ও হৃদয় বিনিময় করিয়া যাহা কিছু শান্তিলাভ করিতে লাগিলেন। বিপদের সময়ে তাঁহাদিগের আত্মীয়তা অধিকতর গাঢ় ও মধুর হইল। সঙ্গতের সভ্যগণের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, অবশিষ্ট কয়েক ভ্রাতা সেই ব্রত জীবনের সার করিয়া লইলেন।

১৭৮৭ শকের আষাঢ় পর্য্যন্ত সঙ্গতসভার কার্য্য নিয়মিত-রূপে নির্ব্বাহিত হয়। পরে প্রচারকগণ ধর্ম্মপ্রচারার্থ নানা দেশে বহির্গত হইলে, সঙ্গতসভার কার্য্য কিছুদিন স্থগিত রহিল, অথবা তাঁহাদের জীবনের সহিত একীভূত হইয়া গেল, বলা যায়। ১৭৮২ হইতে ৮৭শক পর্য্যন্ত সঙ্গতসভা জীবন ধারণ করিয়া, যদি আর কিছু না করিয়া থাকেন, তাঁহার সুপক্ব ফলস্বরূপ কয়েকটী ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক প্রসব করিয়াছেন। এ ফল সামান্য হইলেও, অন্য কোন বিদ্যালয় বা সভাকে এ প্রকার মহৎ ফল প্রদর্শন করিতে দেখা যায় না। জগতে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের জন্য ৮।১০টী জীবন সংগঠিত হইল। মনুষ্য সংসারের সকল সুখ ও আশা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের জন্য ভিখারী হইবেন, সকল ক্লেশ স্বীকার করিয়া জগতের নরনারীদিগের নিকট স্বর্গীয় প্রেম বিতরণ করিতে জীবন উৎসর্গ করিবেন, পৃথিবীতে এরূপ একটী দৃষ্টান্ত দুর্লভ। যে সঙ্গতের প্রসাদে আমরা এতগুলি দৃষ্টান্ত দেখিতেছি, তাঁহাকে কি প্রকার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা দান করিব? যে মহাত্মা সঙ্গতের জীবনস্বরূপ হইয়া, ইঁহার এ প্রকার উপাদেয় ফলোৎপাদনে অবিশ্রান্ত যত্ন, পরিশ্রম ও সাহায্য করিলেন, তিনি যে আমাদিগের চিরশ্রদ্ধার আস্পদ, বলা বাহুল্য। যে করুণাময় পিতা ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য সামান্য উপায়ে আপনার মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, তাঁহাকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ করি। ভবিষ্যতে যে কোন সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্ত আলোচনা করিবেন, তিনি তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী বিশ্বব্যাপী আন্দোলন এই ক্ষুদ্র সঙ্গতের অন্তর্ভূত দেখিতে পাইবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী।

(১)

পাটনাতে অকস্মাৎ একটী ভগিনীর মুখে শুনলাম, গত ২২শে সেপ্টেম্বর আমাদের শ্রীআচার্য্যদেবের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী আর ইহ জগতে নাই। কোন্ অদৃশ্য লোকে, পরমজননীর কোলে, প্রিয়তম স্বামীর সহবাসে, আজ কি বহু বৎসরের প্রাণের ব্যথা দূর করেছেন? অনেক দিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি। তাঁর প্রিয় নূতন বাড়ী যতদিন নির্ম্মিত হয়েছিল, কতবার যেতে বলিয়াছিলেন, আর তো যাওয়া হল না। তাঁর স্নেহ-সহবাস অপূর্ণ রহিল।

শ্রীআচার্য্যদেবকে ইনি অত্যন্ত ভক্তি করতেন। একে একে অনেকবার কঠিন পীড়া হতে রক্ষা পেয়েছিলেন; কিন্তু জন্মদাতা প্রজা-বৎসল ভগবানের নিয়মে আজ সংসারমুক্ত হয়ে, পিতার দলে মিশে সুখী হয়েছেন।

এই সাবিত্রীদেবীকে আমরা বিনিদিদি বলে ডাকতাম। শোভাময় পুণ্য সমৃদ্ধিতে পূর্ণ কমলকুটীরে প্রথম বীণাধারিণী সরস্বতীরূপিণী এই বিনিদিদিকে দেখেছিলাম। সে কি রূপ তাঁর ছিল! যখন Miss Pigateএর Schoolএ পড়তাম, বিনিদিদিও পড়তেন। হঠাৎ একদিন শুনলাম, তাঁর বিয়ে। আজ দীক্ষা হবে। Schoolএর গাড়ী এলে যেমন যেতাম, উপরের ঘরে তাঁকে ডাকতে গেলাম। বল্লেন, যাবেন না। দেখলাম, স্নানান্তে নব বস্ত্র পরিধান করে, দীক্ষাগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে উপাসনাস্থলে যাচ্ছেন। এলোকেশে একটী সকণ্টক পল্লবপত্রে উজ্জ্বল গোলাপ তাঁর মাথার উপোর স্থাপিত রয়েছে। সে কি মনোহর দেবী মূর্ত্তি দেখেছিলাম! আজিও সে দৃশ্য ভুলতে পারিনি।

আমাদের ছোট ছোট বন্ধুদের মধ্যে আমরা উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করতে আরম্ভ করি। মঙ্গলবাড়ীতে আমরা তখন থাকতাম। কমলকুটীরের নবদেবালয়ে সেই উপাসনা প্রতি সপ্তাহে একদিন করে হত। দৈব যোগে একদিন ঠিক সেই সময় বিনিদিদি সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁর সম্মুখে উপাসনা করতে লজ্জিত হয়ে, তাঁকে সেদিনকার উপাসনা করতে অনুরোধ করলাম। গান করলেন, "আহা কি সুন্দর মনোহর সেই মূরতি।" সে গান তাঁর মুখেই প্রথম শুনলাম ও তাঁর কাছেই শিখেছিলাম। তাই মনে হচ্ছে, ভক্তগৃহে জন্ম নিয়ে, সেই অনন্তসৌন্দর্য্যময় শ্রীহরির কোমল মাধুর্য্যমাখা আকৃতিখানি লাভ করেছিলেন। তেমনি সহিষ্ণুতাও ছিল।

একটী কন্যা প্রসূত হবার কয়েকদিন পরেই চলিয়া যায়। সে সময়ে এবং সান্ত্বনা নামে আর একটী ছোট মেয়ে যখন পরলোক গমন করে, বিনিদিদির নিকটে থাকিয়া তাঁর আশ্চর্য্য ধৈর্য্যের পরিচয় যা পেয়েছিলাম, তা সংসারে বিরল। আরও নানারূপ পরীক্ষা তাঁর জীবনে অনেকবার এসেছে, তিনি পূর্ণ বিশ্বাসে অটল থেকে সকল সহ্য করে রক্ষা পেয়েছিলেন।

আমাদের বিনিদিদি ধর্ম্মপরায়ণা সাধ্বী থাকিয়া, তাঁর সাবিত্রী নামটী গৌরবান্বিত করে গিয়েছেন। বহু সন্তান সন্ততির জননী হয়ে, স্বামী ও পুত্রকন্যাগণের সেবা ও প্রতিপালন করিয়াছেন। তাঁর শাসন অত্যন্ত কোমল ও স্নেহে ভরা ছিল। বাহিরের আড়ম্বর তাঁর একটুও ছিল না। সকল সময়ে বিষয় মধ্যে ও নানা অবস্থার মধ্যে পড়েও, তিনি ভক্তিবিশ্বাস-ন্যায়নিষ্ঠা-যুক্ত ও সদাচারসম্পন্ন ছিলেন। গৃহকর্ম্ম সকল স্বহস্তে করিতে ভালবাসিতেন এবং তাঁর সব কাজ এত শীঘ্র, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও

পরিপাটী ছিল যে, দেখে অবাক্ হইতাম। এই সাবিত্রীদেবীর সঙ্গে চিরদিন আমাদের মনের যোগ ছিল। সবাইকে ধর্ম্মের যোগে ভালবাসতেন।

যখন তাঁর প্রিয়তম স্বামী কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের জীবনী লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, অযোগ্য আমাদের মত বোনকে ডেকে সাহায্য করতে অধিকার দিলেন। জীবন-গ্রন্থখানি ছাপা হলে, দূর দেশে আবার মনে করে একখানি উপহার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে দেখলেই আনন্দ হত, চিরকাল স্নেহ-চক্ষে দেখেছেন। প্রাণ খুলে অন্তরের কথা, হৃদয়ের ব্যথা বলতেন। কতদিন যে দেখা হয় নি। সে পুণ্যধামে আর এক বার কি বিনিদিদির পদতলে বসবার উপযুক্ত হব!

একে একে প্রিয় ও স্নেহের ধনগুলি অনেকেই এ ধাম থেকে চলে যাচ্ছেন। সেখানে বিধানসভাতে আবার দেখা হবার আশা করে আছি। ধর্ম্মপ্রাণা বিনিদিদির মত যেন ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে পারি। কবে তাঁর সঙ্গে আবার মিলিত হয়ে, আর্য্যনারীর উৎসবে বস্‌ব, প্রার্থনা শুনব!

মূর্খ অযোগ্য আমরা, সে মহৎ জীবন কতটুকু জানি। এইটী বার বার মনে হচ্ছে, একবার রাঁচিতে আমাকে বাড়ী দেখতে বলেছিলেন Changeর জন্য ও সেই সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করবার জন্য। ঠিক হবার পরে জানালেন, সংসারের নানা গুরু-ভারে আর রাঁচিতে যেতে পারলাম না।

যতবার ইদানীং দেখা হয়েছে, হেসে বলেছেন, কোথাও যাবে? তীর্থে তীর্থে ধর্ম্মবন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে ইচ্ছে করেছিলেন। নবদ্বীপ বেড়াতে যাবার জন্য আমাকে অনেকবার বলেছিলেন। এখন যে মহাতীর্থে চিরদিনের জন্য চলে গেছেন, সেখান থেকে কি ডাকছেন?

প্রিয় বিনিদিদি নববিধানের পূর্ণ আদর্শ জীবনে লাভ করেছিলেন। নববিধান ব্যতীত অন্য কিছু তাঁর প্রাণে স্থান পায়নি। দয়াময়ী নববিধানজননী এখন আমাদের প্রিয় ভগিনীকে, বিধানের ঘরে সাবিত্রী নামের সতী কন্যাকে পতি-সহবাসে সুখে রাখুন। বিনিদিদি ব্রহ্মানন্দদলে অনন্ত আনন্দ সম্ভোগ করুন। এখানে শোকার্ত্ত পুত্র কন্যা ও আত্মীয় স্বজন সকলকে বিধানজননী শান্তি দিন।

২রা অক্টোবর, ১৯৩২। সেবিকা—হেমলতা।

—•—

(২)

"পিতা, পিতা, তুমি কি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে?" মৃত্যুর পর মৃত্যু, শোকের পর শোকের ক্লেশে আহত হইয়া, আমরা কি ঈশার ন্যায় এই বলিয়া ক্রন্দন করিব?

হায়! শ্রীব্রহ্মানন্দদেবের কন্যা সাবিত্রী দেবীর আকস্মিক পরলোকগমনবার্ত্তা যেন বজ্রসম আমাদিগকে আহত করিল। তিনি অনেকদিন হইতেই হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন। ইতিপূর্ব্বে জ্যেষ্ঠা ভগ্নী মাননীয়া শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবীর ক্যামাক্‌ষ্ট্রীটস্থিত প্রবাসভবনে অবস্থান করিয়া, তাঁহার যত্ন ও সেবায় তিনি যথেষ্টই স্বাস্থ্যোন্নতি লাভ করিয়াছিলেন এবং পুরী-ধামে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ছিলেন; কিন্তু জ্যেষ্ঠা কন্যা সুধা দেবী অন্যত্র যাইতে না দিয়া, নিজগৃহে রাখিয়া প্রাণগতভাবে তাঁহার সেবা করেন। মা সুধা ও জামাতা ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষায়, তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিয়া তিনি অনেকটা ভালই হইয়াছিলেন। এরূপ আকস্মিক ভাবে যে দেহরক্ষা করিবেন, কেহ কল্পনা করিতেও পারে নাই।

বিধাতার অভিপ্রায় কে বুঝিবে! তিনি তাঁর সুকন্যাকে সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা ও রোগ শোক হইতে মুক্ত করিয়া, ভক্ত পিতামাতা ও দেব স্বামীর সঙ্গে মিলিত করিয়া, নিত্য-ব্রহ্মানন্দ লোকে লইয়া গেলেন। রাখুন তাঁর আত্মাকে নিত্য শান্তিতে; এবং তাঁর এই আকস্মিক তিরোধানে, তাঁহার সহিত অভিন্নহৃদয় জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা ভগ্নীগণ ও ভ্রাতৃগণ এবং প্রাণ-প্রিয়তম সন্তান সন্ততি ও বহু বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনবর্গকেও এই গভীর শোকবিরহে তিনি ভিন্ন আর কে শান্তি সান্ত্বনা দান করিবে।

দেবী সাবিত্রী আমাদের প্রিয়তম শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের ও মা জগন্মোহিনী দেবীর বড়ই আদরের মধ্যমা কন্যা ছিলেন। পিতৃদেব আদর করিয়া নাম দিয়াছিলেন 'সাবিত্রী,' কিন্তু তাঁকে সকলে "বিন" বলিয়া ডাকিত। কোলের পিঠের বলে "বিন" দাদা দিদির অত্যন্ত অনুগত ছিলেন, তাঁরা তাঁকে প্রাণের সহিত ভাল-বাসিতেন। বিন গৃহে ও ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ে বেশ লেখা পড়া শিক্ষা করেন।

জ্যেষ্ঠা কন্যাকে রাজার সঙ্গে বিবাহ দেওয়াতে, আচার্য্যদেবকে তাঁর বিরোধিগণ কতই নিন্দিত করেন। নিষ্কাম দেবাত্মার নিকট রাজা দারিদ্র সবাই সমান; তাই তাঁর যেন মনে হইয়াছিল, এবার নিঃস্ব সৎপাত্র পাইলেই মধ্যমা কন্যার বিবাহ দিবেন।

কোচবিহারের "রাজগণ" বংশীয়, মহারাজার জ্ঞাতিভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া আসিলে, তাঁহার শান্ত শিষ্ট নিরীহ বিনয়ী ভাব দেখিয়া, আমরাই আচার্য্যদেবের নিকট প্রস্তাব করিলাম, বিনর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলে হয় না? আচার্য্যদেব তখনই নহবত বসাইয়া দিলেন, এবং সে প্রস্তাব আদরে গ্রহণ করিলেন এবং কন্যাকে পাত্রস্থ করিলেন। তখন কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ মাত্র পাশ করিয়া আসিয়াছেন, উপার্জ্জনসক্ষম হন নাই।

একদিকে জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজ্যের রাজরাণী, আর একদিকে মধ্যমা কন্যা একরূপ নিঃস্ব রাজভ্রাতার সহধর্ম্মিণী। অবস্থার অনেক বৈষম্য হইলেও, দেবী সাবিত্রী আত্মসম্মান এবং আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, সংসারকে কি সুখের সংসারেই পরিণত করিয়া

ছিলেন। শিবের সমান স্বামী সংসারের কিছুই খবর রাখিতেন না।

শ্রীগজেন্দ্রনারায়ণ প্রথমে হাইকোর্টে ভর্ত্তি হন। পরে কোচবিহারের মহারাজার আগ্রহে, সেখানে দ্বিতীয় জজের পদে অল্প বেতনে নিযুক্ত হন। তাহার পর মহারাজের চাকলাজাত জমীদারির ম্যানেজারের পদে অভিষিক্ত হইয়া বহুদিন কার্য্য করেন। এই সময়ে তাঁহাদের আর্থিক সচ্ছলতা কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইলেও, অনেকগুলি ছেলেমেয়ে লইয়া, সাবিত্রীদেবী তিনি তাঁহার সুগৃহিণীপণার দ্বারাই, সুখস্বচ্ছন্দময় সংসার রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীগজেন্দ্রনারায়ণ পেন্সন প্রাপ্ত হইয়া, কোচবিহারে "সাবিত্রী লজ" গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, চির অবস্থান করিতে কৃতসংকল্প হন। এবং নববিধানসমাজের সম্পাদকরূপে অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সহিত নববিধানের সেবায় নিরত হন। রাজ্যের রাজা ও রাণী নববিধানকে রাজধর্ম্ম বলিয়া পরিবারে ও রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেন, ব্রহ্মমন্দিরস্থাপনাদি নানা প্রতিষ্ঠান, প্রেরিত প্রচারকনিয়োগ এবং উৎসবাদি দ্বারায় প্রচারের জন্য বহু অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা করেন; আর কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ ও শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী রাজা রাণীর প্রতিনিধিরূপে, কোচবিহারের নববিধান প্রতিষ্ঠান সকল রক্ষণাবেক্ষণ এবং নববিধানের অনুষ্ঠানাদি অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিপালন করিয়া নববিধানের সেবা করিয়াছেন। তাহার জন্য মণ্ডলী তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী আচার্য্যদেবের পবিত্রমুখ-বিনিঃসৃত বহু প্রার্থনা এবং উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াও মণ্ডলীকে অশেষ ঋণে ঋণী করিয়াছেন।

কি জানি, আমাদের কি দুর্ভাগ্য বশতঃ, কি এক রাজনৈতিক পরীক্ষায় পড়িয়া, যখন শ্রীগজেন্দ্রনারায়ণ ও সাবিত্রী দেবী সপরিবারে কোচবিহার ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন, তখন হইতেই যেন নববিধানের বাতি কোচবিহারে ক্রমে ক্রমে নিবু নিবু হইতে লাগিল। হায়! এই সময় হইতেই স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই বিষম হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সাবিত্রী দেবীর প্রভাবে শ্রীগজেন্দ্রনারায়ণের চরিত্র কি পূর্ণ মিতাচারী এবং সুনীতিসম্পন্ন হইয়াছিল। কোচবিহারের রাজপদের যে সমুদয় দোষ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাঁহার কিছুই ছিল না। তাই তাঁহাকে সকলে দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ বলিত এবং মহারাজা শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণও তাঁহাকে সহোদরের ন্যায় আদর করিতেন।

নববিধানের প্রচারক প্রেরিতগণের সেবা ও সহায়তা করিতে স্বামী স্ত্রী উভয়ে কতই চেষ্টা করিতেন। কোচবিহার হইতে আসিয়া উভয়েরই শরীর মন ভাঙ্গিয়া গেল। আবার স্বামী দেবকে অকালে হারাইয়া, দেবী সাবিত্রী যেন সেই সঙ্গে পুনঃ মিলিত হইবার জন্যই, এতদিন ব্যাকুল অন্তরে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। স্বামীর পুণ্যস্মৃতি সংরক্ষণ জন্য তাঁহার এক খানি সুন্দর জীবনীও প্রকাশ করেন।

পিতৃধর্ম্ম অনুসরণ এবং দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত তাহা রক্ষা করিবার জন্য, সাবিত্রী দেবীর কি উদ্যম এবং প্রতিজ্ঞা ছিল। অন্যান্য ভগ্নীদের ন্যায় তিনি প্রকাশ্যে উপাসনাদি বেশী করিতেন না, কিন্তু তাঁহার উপাসনা ও প্রার্থনা অতি মিষ্ট ও গভীর ভক্তিপূর্ণ ছিল।

তাঁহার পরলোকগমনে আমাদের বিধানপরিবারের আর একটী স্থান শূন্য হইল। ভক্তপরিবারস্থ ভগ্নীগণের মধ্যে এই প্রথম একজন চলিয়া গেলেন। স্বামী ও রাজপুত্রকন্যাগণকে অকালে হারাইয়া জ্যেষ্ঠা ভগ্নী মহারাণী দেবীর প্রাণ যে শোকে, তাপে ও বার্দ্ধক্যে একেবারে জরাজীর্ণ; হায়, তাঁর চিরসহচরী ভগ্নী বিনয় শোক কেমন করিয়া তিনি বহন করিবেন! তবে কিনা নববিধানে পরলোক আমাদের নিকট হইয়াছে, এই বিশ্বাসই আমাদের সকল শোকের সান্ত্বনা। মা ভক্তজননী তাঁর ভক্তপরিবারস্থ সকলকে এবং মণ্ডলীস্থ আমাদিগকে এই শোকভারবহনে সক্ষম করুন এবং তিনি তাঁহার উজ্জ্বল প্রেমমুখ দেখাইয়া শান্তি সান্ত্বনা বিধান করুন।

সেবক—প্রিয়নাথ মল্লিক।

---

(৩)

আজ এই সুদূর প্রদেশে আমাদের নিকট কোন হৃদয়বিদারক নিদারুণ সংবাদ আসিল! আমাদের সেই কোমলমতি শ্রদ্ধাস্পদা ভগিনী দেবী সাবিত্রী আর এ পৃথিবীতে নাই! সেই পবিত্র স্নেহমূর্ত্তি কোন্ অদৃশ্য প্রদেশে লুক্কায়িত হইলেন! তাঁহার জীবনকাহিনী যে আমাদের পুরাতন ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। সেই আমাদের কলুটোলার বাড়ী হইতে আমরা এক মধুর সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। কেবল পারিবারিক সম্বন্ধে আমরা এক ছিলাম না, নববিধানের সম্বন্ধে আরও এক হইয়াছিলাম। ভক্তিভাজন শ্রীমদাচার্য্যের সময়ে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনায় এবং তাঁহার নেতৃত্বে নর্ম্মালস্কুলেও ছাত্রীজীবনে আমরা একই ছিলাম। আমাদের কুচবিহার অবস্থানকালে এ সম্বন্ধ আরও ঘনীভূত হইয়াছিল। যে ভূমিতে শ্রীমদাচার্য্যদেব ভগবানের মহা আদেশ মস্তকে বহন করিয়া, ক্রমান্বয়ে প্রথমা ও দ্বিতীয়া কন্যাকে লইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে ভূমিতে আরও যেন একটা উচ্চতর সম্বন্ধ সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল। যে কুচবিহার বিবাহের নিগূঢ় তত্ত্ব ও সত্য অবিশ্বাসী মানুষ ধরিতে পারে নাই, সেই তত্ত্ব ও সেই সত্য যেমন একদিকে মাননীয় মহারাজা বাহাদুর ও কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ সাহেবের জীবনে প্রমাণিত, তেমনি অপরদিকে শ্রীমদাচার্য্যের পবিত্র-জীবন-শোণিতে সম্বর্দ্ধিত কন্যাদ্বয়ের জীবনেও প্রমাণিত। বিধাতার মহা প্রত্যাদেশে প্রবুদ্ধ জীবনের প্রভাব ও নববিধান-ক্ষেত্রে তাঁহাদের আত্মদান আমাদের সম্মুখে প্রত্যাদেশের পূর্ণতা এবং নববিধানের গুপ্ত

রহস্য আরও স্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিয়াছিল। এই প্রবুদ্ধ জীবন সমূহের প্রভাবে কুচবিহার প্রদেশে যে একটা যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইঁহাদের প্রভাবেই এদেশে নববিধানপ্রচার, স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ও নানাবিধ সামাজিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইয়াছে।

দেবী সাবিত্রী আমাদিগের জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রদ্ধাস্পদা সুনীতি দেবীর কুচবিহার-প্রবেশের অব্যবহিত পরে প্রবেশ করিয়া, কুচবিহার-বিবাহ-তত্ত্বকে আরও বিশদ করিয়া দিয়াছেন। কোন গভীরভাবপূর্ণ গ্রন্থকে বিশদ করিবার জন্য টীকার প্রয়োজন। সমুদ্রের সঙ্গে সমুদ্র মিশিয়া গেলে, জলপথ আরও সুগম ও সহজ হইয়া যায়। অল্পবিশ্বাসীর ভীষণ আন্দোলনে যে পথ সাধারণের পক্ষে সহজগম্য ছিল না, দেবী সাবিত্রী সেই আন্দোলিত তরঙ্গপূর্ণ প্রদেশে প্রবেশ করিয়া, আদেশশাস্ত্রের টীকারূপে বিধাতা কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিলেন। আদেশের পথ বন্ধ থাকে না।

আজ আমরা এই সুদূর প্রদেশ হইতে দেবী সাবিত্রীর স্বর্গতীর্থে হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি ও ভক্তি-অশ্রু প্রেরণ করিতেছি। শান্তিদাতা বিধাতা আজ তাঁহার ভাই ভগিনী ও পুত্রকন্যাদিগের হৃদয়ে শান্তিবিধান করুন। তাঁহার নববিধান তাঁহাকে চিরদিন নূতন করিয়া রাখিবে।

নামকুম, পোঃ রাঁচি ; শোকসন্তপ্তা ভগিনী
৩।১০।৩২। সুমতি মজুমদার।

—•—

শ্রীমতী সুনীতি রায়।

[১]

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব প্রার্থনা করিলেন—"We beseech thee to grant us firm faith, large-hearted charity, fervent prayer, deep communion, justice harmonised with mercy, unfaltering veracity, meekness, child-like simplicity with mature wisdom, asceticism mingled with domestic virtues, unflagging energy and devout contentment amid the trials of life, O Lord."

এই প্রার্থনার প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক ভাবটী যেন শ্রীমতী সুনীতি দেবীর জীবনে ভগবান্ ফুটাইয়া তুলিতে ছিলেন। হায়! কেন যে এত শীঘ্র শীঘ্র তিনি এ ফুলটীকে তুলিয়া লইলেন, কি করিয়া বুঝিব?

আদর করিয়া সাধক সাধিকা পিতা মাতা সুনীতিকে "সুকু" বলিয়া ডাকিতেন। এই নামেই তিনি সবারই কাছে আদৃত।

ভাইবোনেরা শৈশব থেকে তাঁর ভালবাসার আকৃষ্ট, সহপাঠীরা তাঁহার সৌহার্দ্দ্যে মুগ্ধ, তাঁর ছাত্রীরা তাঁর সেবায়, স্নেহে, বাৎসল্যে এবং শিক্ষাদানের গাম্ভীর্য্যে, যুগপৎ ভয়, ভক্তি ও ভালবাসা দিয়া ধন্য। আর আমরা তাঁর সমবিশ্বাসী সমধর্ম্মিগণ তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা, উদার সেবাপরায়ণতা, গভীর প্রার্থনাশীলতা, জ্ঞানগর্ভ চিন্তাশীলতা, স্নেহপূর্ণ ন্যায়-পরায়ণতা, শিশুর ন্যায় সরলতা, অটল সত্যবাদিতা, গভীর নীতি-প্রাণতা এবং বৈরাগ্যময় সংসার সাধন দেখিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে কতই যে আশা করিতেছিলাম, তাহা বলা যায় না।

বিদুষী হইয়াও বিনীত শিষ্যপ্রকৃতি যেমন তাঁর ছিল, এমন যেন আর দেখিতে পাই না। সদা হাস্যমুখ, সদা পরদুঃখকাতর এমন কে? স্বর্গের পবিত্রতা যেন তাঁর ঢুলু ঢুলু চক্ষু দুটীতে মাখান ছিল।

নববিধানে দীক্ষা লইয়া, সেবিকা-ব্রত লইয়া তিনি কেবল তৃপ্ত হন নাই, চাকুরী ছাড়িয়া প্রচারিকা-ব্রত লইতেও তিনি আবেদন করেন এবং নববিধানের সেবার্থ শ্রীদরবারেরও অঙ্গীভূত হইয়া জীবন উৎসর্গ করিতে সংকল্প করেন। আমাদিগের ভগ্নীদিগের মধ্যে এতদূর অগ্রসর আর এ পর্য্যন্ত কে হইয়াছেন?

উৎসবাদিসম্পাদনে এবং নানাপ্রকার সদনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে অদম্য উৎসাহই বা তাঁর কত! বাস্তবিক তিনি নববিধানের একটী প্রকৃত আদর্শ লক্ষ্যরূপে গঠিত হইতেছিলেন।

বৈরাগ্য তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য, তাই চাকুরী ছাড়িয়া নববিধানের ভিক্ষুণীব্রতগ্রহণে তিনি আকাঙ্ক্ষিত হন এবং প্রচারকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেই কৃতসংকল্প হন। কার্য্যত্যাগ করিবার সময় যখন মনে একটু আন্দোলন উপস্থিত হয়, আমাদের সঙ্গে একদিন একটি প্রার্থনাতেই সংকল্প স্থির করেন এবং সকল বাধা অগ্রাহ্য করিয়া কার্য্যত্যাগ করেন।

কিন্তু কেবল বৈরাগ্যেই নববিধানের পূর্ণ জীবন লাভ হয় না বলিয়াই, ঈশ্বরের অলৌকিকলীলায়, এক কথাতেই কুমার সন্ন্যাসী সত্যানন্দকে পতিত্বে বরণ করেন এবং স্বল্পকাল মাত্র নববিধানের গৃহস্থ বৈরাগ্যজীবন যাপন করিয়া, নববিধানের আদর্শ সংসার প্রদর্শনে কৃতকার্য্য হন।

শেষে সন্তানবতী হইয়া, সন্তানের জন্য মাতার আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেই, কি আমার সুকু মা এমন আকস্মিক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন? অথবা আমাদের পরমজননী যেমন তাঁর অপার স্নেহে পার্থিব সন্তান আমাদিগকে প্রসূত করিয়া, আমাদের রক্ষার জন্য আপনাকে অদেহী অদৃশ্য করিয়া আত্মত্যাগিনী হইয়া রহিয়াছেন, তাহারই বাহ্য আদর্শ দেখাইবার জন্যই কি এই "সুকু"মার আত্মবলিদানলীলা সংঘটন করিলেন? যাহা হউক, শিশু ধ্রুবকে জীবনে রক্ষা করিবার জন্যই দেবী সুনীতি আত্মজীবন দান করিয়া, অমরলোকে ব্রহ্মানন্দ-অঙ্গে আত্মবিলীন হইলেন। মহাভারতের সুনীতি ধ্রুবের জন্য বনবাসিনী হইয়াছিলেন, নববিধানভারতের সুনীতি ধ্রুবের জন্য একেবারে

দৈহিক জীবন ত্যাগ করিয়া চির বৈকুণ্ঠবাসিনী হইলেন। ধন্য, ধন্য, তাঁর সাধনা! থাকুন তিনি দেব দেবী পিতা মাতা এবং ব্রহ্মানন্দদলে নিত্যানন্দে। যদিও বাহ্যভাবে তাঁর প্রিয়তম স্বামী সত্যানন্দ ও শিশুপুত্র ধ্রুব সঙ্গে আমরা তাঁহা হইতে পৃথক হইয়া পড়িলাম, কিন্তু অধ্যাত্মযোগে যেন একই মার কোলে সদলে আমরা বাস করিতে পারি এবং যখন আমাদের সময় আসিবে, যেন ঐ দলে মিশিতে পারি।

সেবক—প্রিয়নাথ মল্লিক।

---

[২]

আমাদের "সুনীতিদি" কি আর এ পৃথিবীতে নাই! পাটনায় যখন এ সংবাদ আসিল, হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। যাহা ঘটিয়াছে, তাহা পরে বিশ্বাস করিতে হইল। আজ তাঁহার সম্বন্ধে দুইচারিটী পংক্তি লিখিতে গিয়া একবার তাঁহাকে ডাকি।

সুনীতিদি! তুমি কি চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলে? তুমি কি আর আমাকে "ধনা" বলিয়া ডাকিবে না? যখন আমাদের ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ে আমরা তিন বোনে তোমার ছাত্রী, তখন হইতে আমাদের উপর তোমার স্নেহ, ভালবাসা! তুমি যে আমাকে কত সুমিষ্ট ভাষায় কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ এবং আরও অন্যান্য স্থান হইতে কত চিঠি লিখিয়াছ! তোমার ভাষা এখনও প্রাণের অভ্যন্তরে ঝঙ্কারিত হইতেছে! এখনও তোমার সুমধুর আহ্বান আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তলকে স্পর্শ করিতেছে! তুমি যখন কলিকাতা ও লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের গমনাগমন পথে পাটনা ষ্টেসন অতিক্রম করিয়াছ, তখনই ষ্টেসনে তোমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য চিঠি লিখিয়াছ। এক আধবার তুমি আমাদের পাটনার বাড়ীতেও আসিয়াছিলে। আজ বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে যে, তুমি তিনচারি মাস পূর্ব্বে তোমার ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ আমাকে একখানি নূতন সাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলে! এখন মনে হইতেছে যে, তোমাকে চিরদিন স্মরণ রাখিবার জন্যই তুমি এ ব্যবস্থা করিয়াছিলে! বিধাতা যে তোমার ভিতরে অনেক জিনিষ দিয়াছিলেন। তোমার ভিতরে আমাদের "নববিধান" প্রতিক্ষণই স্পন্দিত হইত। তোমার সামনে নববিধানের বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র আসিয়া পড়িয়াছিল। তোমার প্রস্থানের পর আমাদের "সতুমামা" তাহা জানিতে দিয়াছেন। তুমি চলিয়া গেলে। তোমার পবিত্র স্মৃতিবাসরে কত চক্ষু হতে কত অশ্রুজল খসিয়া পড়িল। তুমি তোমার প্রিয় লক্ষ্ণৌনগরেও সকলকে কাঁদাইয়াছ। লক্ষ্ণৌনগরে তুমি যে থোবর্ণ কলেজের ছাত্রী ছিলে। তুমি যে সে কলেজে শিক্ষয়িত্রীও হইয়াছিলে। তোমার সেই ইয়ুরোপিয়ান শিক্ষয়িত্রীগণ তোমার জন্য সে কলেজক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মৃতিসভা আহ্বান করিয়া অশ্রুজল বর্ষণ করিয়াছেন। সিন্ধুদেশ তোমার জন্য কাঁদিয়াছেন। আমাদের "নববিধান" ও "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রও যে তোমার জন্য শোকাশ্রুতে প্লাবিত হইয়াছে। আজ আর কি বলিব। সুনীতিদি! তুমি আর একবার চক্ষু উন্মীলিত কর। দেখ, তোমার জন্য আজ সকলে ব্যস্ত। তুমি এখন স্বর্গে দেবদেবীদিগের মধ্যে। তুমি এখন "শ্রীব্রহ্মানন্দ" ও আর আর পিতৃমাতৃগণের মধ্যে। তোমার নববিধান সেখানে পূর্ণ। তোমার প্রেত আত্মার নিকট মস্তক অবনত করি।

নামকুম, পোঃ রাঁচি; তোমার শোকসন্তপ্তা ভগিনী
১১।১০।৩২। ধনা মজুমদার।

ডাক্তার ভি, রায়।

আমাদিগের ব্রাহ্মসমাজের প্রাঙ্গণভূমি হইতে গিরিডিবাসী প্রবীণ ব্রাহ্ম ডাঃ ভি, রায় চলিয়া গেলেন! রায় মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহের যুগে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াও, বয়োবৃদ্ধিসহকারে নববিধানের ভাব ও শ্রীমদাচার্য্যের মহাভাবপূর্ণ জীবনের প্রভাব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তরল ইক্ষুরস উত্তাপের প্রক্রিয়ায় শর্করায় পরিণত হয়। রায় মহাশয় জীবনে তাহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। যখন বাঁকিপুর-নিবাসী নববিধান-ভক্ত প্রকাশচন্দ্র সশরীরে বর্ত্তমান, তখন তিনি বাঁকিপুরে আসিয়া ভক্ত প্রকাশের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার সহিত প্রথম আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। এই সময়েই তাঁহার ভিতরে নববিধানের নবীন উন্মেষের একটা ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গের ভিতর বুঝিতে পারিলাম, তাঁহার ভাব কোন্ দিকে চলিয়া যাইতেছে। অবশ্য তিনি কুচবিহারবিবাহের মহা আন্দোলনের যুগে, যুবকবয়সে এক প্রতিকূল স্রোতে পড়িয়াছিলেন। অগভীর জল বায়ুবেতাড়িত হইয়া চঞ্চল ভাব ধারণ করে, কিন্তু গভীর জল শান্ত ও অচঞ্চল অবস্থায় প্রবাহিত হইতে থাকে। মনীষা-সম্পন্ন ডাঃ ভি রায়ের জীবনে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর অতীত হইল, অধ্যাত্মজ্ঞানসম্পন্ন ডাঃ ভি রায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের "Indian Messenger" পত্রে, শ্রীমদাচার্য্যদেব-ঘোষিত "All Religions are true" এই সত্যের এক সুদীর্ঘ ভাব ও ব্যাখ্যাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধের উপক্রমণিকাতেই লিখিয়াছিলেন যে, "Keshub Chunder Sen is one of the misunderstood teachers of the world." ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে যিনি প্রথম জীবনে বুঝিতে পারেন নাই এবং তাহার পর বুঝিয়াছিলেন, তিনিই একথা লিখিতে পারেন। ডাঃ ভি রায় মহাশয় তাঁহার এই উপলব্ধি তাঁহার পরিণত বয়সে বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদাচার্য্যের যে সকল উপদেশ "জীবনবেদ"

রূপে বিশেষগ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে, সেই পুস্তকের ইংরাজি অনুবাদ এবং আচার্য্যদেবপ্রণীত "True Faith" পুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া, আচার্য্যসম্বন্ধে তাঁহার পূর্ণ অভিজ্ঞতার পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন। জীবনবেদের ইংরাজি অনুবাদ পুস্তকের মুখবন্ধেই লিখিয়া গিয়াছেন যে, "Keshub Chunder Sen, up to row, is the highest water-level in the uni-versal religion of the Brahmo Somaj." ডাঃ ভি রায় মহাশয়ের এ সাক্ষ্যদান যে অনেকের চক্ষু উন্মুক্ত করিয়া দিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। দূর হইতে প্রকাণ্ড হিমালয়কেও আকাশের মেঘ বলিয়া প্রতীত হয়। নিকটে না আসিলে হিমালয় সম্বন্ধেও এই অন্ধকার। সেই যে সার উইলিয়মসের মাতা তাঁহার জিজ্ঞাসু পুত্রের প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে পুত্রকে বলিতেন যে, "Read and you will know." একথা মহাজনকে বুঝিবার সম্বন্ধেও ধ্রুব সত্য। অনেক দিন অধ্যয়নের পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় আচার্য্যদেব সম্বন্ধে বলিলেন, "Behold the Man." সেইরূপ ডাক্তার ভি রায় মহাশয়ও সাক্ষ্য দিয়া গেলেন। আজ রায় মহাশয়ের প্রস্থানে নববিধানসমাজও ক্ষতিগ্রস্ত। আজ আমরা তাঁহার বিশ্বাসী পরিবারের প্রতি হৃদয়ের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

নামকুম, পোঃ রাঁচি ; শোকসন্তপ্ত
৪।১০।৩২। গৌরীপ্রসাদ মজুমদার

—•—

পূর্ব্ববঙ্গালা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের দ্বাপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক।

পূর্ব্ববাঙ্গলা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের দ্বাপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, সমাজের সভ্যগণ ১৮ই ভাদ্র, শনিবার হইতে ২রা আশ্বিন, রবিবার পর্য্যন্ত জমাট ব্রহ্মোৎসব সম্ভোগ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে মৈমনসিংহ হইতে শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস এবং কলিকাতা হইতে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ এবং ভাই অখিল-চন্দ্র রায় আসিয়া উৎসবানন্দ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। মত্ত হইতে ভ্রাতা রুক্মিণীকান্ত চন্দ আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন।

১৮ই ভাদ্র, শনিবার, পূর্ব্বাহ্ণে বিধানপল্লীস্থ দেবালয়ে, বিশেষ ভাবে উপাসনা ও প্রার্থনা হইয়া উৎসবের ভাবে কার্য্য আরম্ভ হয়। ভ্রাতা মতিলাল দাস উপাসনা করেন এবং ভ্রাতা রাজকুমার দাস বিশেষ প্রার্থনা করেন। তাঁহাদের উভয়েরই প্রার্থনার বিষয় এই ছিল যে, বিধানজননী আপনার অনন্ত করুণা-গুণে ভক্তদলসহ অবতীর্ণ হইয়া এবার আনন্দোৎসব বিধান করুন। সায়ংকালে আর্ম্মানিটোলাস্থ ব্রহ্মমন্দিরে ভাই দুর্গানাথ রায় "নবলীলা" বিষয়ে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাতে বিশেষভাবে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনে এবং চরিত্রে নবলীলা প্রকট-ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

১৯শে ভাদ্র, রবিবার, পূর্ব্বাহ্ণে দেবালয়ে ভ্রাতা রাজকুমার দাস উপাসনা করেন। ঐ দিন শ্রদ্ধাস্পদ গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের স্বর্গারোহণসাম্বৎসরিক থাকাতে, ভাই দুর্গানাথ ও মহিমচন্দ্র তাঁহার উয়ারীস্থ ভবনে আহূত হইয়া মধ্যাহ্নে উপাসনা করেন। ভাই দুর্গানাথ উপাসনা করেন এবং মহিমচন্দ্র ও শ্রীমতী ক্ষীরোদাসুন্দরী সেন বিশেষ প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার ভিতরে শ্রদ্ধাস্পদ গোপীকৃষ্ণের জীবনের বিশেষত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল। যথা—উপাসনাতে তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা, পরোপকারে তাঁহার গভীর অনুরাগ ও মুক্তহস্ততা, মন্দির, দেবালয় ও বিধানপল্লীনির্ম্মাণে তাঁহার অদম্য উৎসাহ এবং ভগবানে ও ভক্তে তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ প্রকাশিত হইয়াছিল। সায়ং-কালে ব্রহ্মমন্দিরে প্রথমতঃ সংকীর্ত্তন হয়। তৎপর উপস্থিত বন্ধুদের আগ্রহে, ভাই মহিমচন্দ্র দীর্ঘকাল পরে বেদী গ্রহণ করিয়া, ব্রহ্মোৎসবের উদ্বোধনসূচক উপাসনা করেন। সে দিনের উপদেশ সংক্ষিপ্ত হইলেও, উহা জীবন্ত ও বলপূর্ণ বাক্যে প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহার সার এইভাবে সংগৃহীত হইতে পারে। যথা :—ব্রহ্মোৎ-সবের বিশেষত্ব ব্রহ্মের সহিত সজ্ঞানে বিশেষ যোগ। এজন্য বলা হইল, "চল ভাই যাই সবে, মহা মহোৎসবে, অমরধামে যোগবলে। নিরখি আনন্দে, আনন্দময়ী রে, মিশে সাধু অমর-দলে।" স্বর্গে নিত্য ব্রহ্মোৎসব হইতেছে। প্রেমদাস সেজন্য গাইলেন "আনন্দধামে, মাতি তব নামে, ভক্তগণ সদানন্দে রয়েছে মগন। (কিবা শোভা মরিবে)।" এই যে স্বর্গে আনন্দ, ইহা বিশেষভাবে কাহাদের লইয়া ? না, অনুতপ্ত পাপীকে লইয়া আমরা শুনিয়াছি। "আমি বলিতেছি, যাহাদিগের অনুতাপের কোন প্রয়োজন নাই, তাদৃশ নবনবতি জন পুণ্যাত্মা অপেক্ষা, একজন পাপী অনুতাপ করিলে স্বর্গে সেইরূপ আনন্দ হইবে।" (লুক ১৫।৭) বস্তুতঃ পাপের জন্য অনুতপ্ত না হইলে, ব্রহ্মানন্দ উপ-ভোগ করা যায় না। ঈশ্বর অনুতপ্ত আত্মার নিকট স্থিতি করেন। তিনি বলেন, "অহঙ্কারী পাপী যারা, আমার দেখা পায় না তারা, দীনজনের বন্ধু আমি সকলে জানে। (ভগ্নহৃদয়বাসী আমি সকলে জানে)" যদি আমি বলি, আমার পাপ নাই, তবে নিশ্চয়ই আমাতে সত্য নাই। আমরা সকলেই পাপী, সুতরাং পাপ স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হই। আমাদিগকে পাপবোধ কে দিবে ? অন্তরে পবিত্রাত্মার অবতরণ অনুভব না করিলে পাপ-বোধ হয় না। এজন্য ধর্ম্মপিতামহ রামমোহন বলিলেন—"ওরে মন, কর আত্মানুসন্ধান।" কঠোপনিষৎ বলিলেন—

> "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
> ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
> দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

ইহার অর্থ এই :—"হে জীবসকল, উত্থান কর, অজ্ঞাননিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হও, এবং উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকট যাইয়া জ্ঞানলাভ কর। পণ্ডিতেরা এই পথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম

বলিয়াছেন।" বিশ্বাসী ভাই ভগিনীগণ, স্বয়ং অন্তর্য্যামী আমাদের গুরু, সুতরাং আমরা জ্ঞানশিক্ষার জন্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট আচার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছি। অন্তর্য্যামী পবিত্রাত্মা প্রতি জীবের অন্তরে স্থিতি করিয়া বলিতেছেন—"জীব, তোর সঙ্গে আমি আছি বর্ত্তমান। নিত্যকাল আছি রে সঙ্গে, দিতে তোরে পরিত্রাণ।" এই যে পরিত্রাণ দিবার জন্ত স্বয়ং পবিত্রাত্মা ভগবান্ অন্তর্য্যামী হইয়া আমাদের অন্তরেই স্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে দেখিলে এবং তাঁহার বাণী শ্রবণ করিলেই জীবের পাপ-বোধ জন্মে। এই পাপ-বোধেই আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলিলেন, "আমি পাপীর সর্দ্দার।" এই পাপবোধেই আচার্য্য বঙ্গচন্দ্র বলিলেন—"আমি নরক, এবং দেখ, সেই নরকে ব্রহ্মমার অবতরণ হইয়াছে।" ভাই ভগিনীগণ, আমরা এই অন্তর্য্যামী সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুরুর নিকটে বসিয়া জ্ঞান শিক্ষা করি। সেই জ্ঞানে আমাদের প্রতি অন্তরে পাপবোধের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে এবং আমরা অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া দেখিতে পাইব, স্বর্গরাজ্য কত নিকটে আসিয়াছে। ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

২০শে ভাদ্র, সোমবার, পূর্ব্বাহ্নে দেবালয়ে উপাসনা ভাই চন্দ্রমোহন দাস করেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে করোনেশন পার্কে নগরবাসীদিগকে উৎসবে আহ্বান করা হয়। ভাই মহিমচন্দ্র, শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস এবং পণ্ডিত সারদাপ্রসন্ন সেন ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। তৎপর দিক্‌বাজার স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে উপাসনা হয়। উপাসনা-কার্য্য শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস করেন।

২১শে ভাদ্র, মঙ্গলবার, দেবালয়ে উপাসনা ভাই দুর্গানাথ রায় এবং সায়ংকালে ভ্রাতা রাজকুমার দাসের ভবনে উপাসনা ভ্রাতা মতিলাল দাস করেন। এই উপলক্ষে ভ্রাতা মতিলাল দাস সময়ের উপযোগী একটী নূতন সঙ্গীত রচনা করেন, এবং উহা তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা ললিত পঞ্চমে গাহিয়া আনন্দবর্দ্ধন করেন।

২২শে ভাদ্র, বুধবার, সায়ংকালে মন্দিরে সঙ্গতসভার সাম্বৎসরিক উৎসব হয়। রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় এম,এ, অসুস্থ থাকাতে, ঐ দিনের কার্য্যভার ভ্রাতা ডাক্তার উমাপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের উপরে ন্যস্ত হয়। উৎসবের দেবতা এ কার্য্যটী তাঁহা দ্বারা আশাতীতরূপে সম্পন্ন করাইয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। তাঁহার নবোৎসাহ এবং প্রগাঢ় নবানুরাগ দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন।

২৩শে ও ২৪শে ভাদ্র, পূর্ব্বাহ্নে দেবালয়ে উপাসনা এবং সন্ধ্যা ৭টাতে ফরাসগঞ্জে স্বর্গীয় আনন্দমোহন দাস মহাশয়ের ভবনে এবং স্বর্গীয় অধরচন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। ভাই চন্দ্রমোহন দাস দুই স্থলেই উপাসনা করেন। ঐ দিন কলিকাতা হইতে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ভাই অখিলচন্দ্র রায় আসিয়া উৎসবানন্দের জমাটভাব বৃদ্ধি করেন।

২৫শে ভাদ্র, শনিবার পূর্ব্বাহ্নে দেবালয়ে উপাসনা, এবং সায়ংকালে মন্দিরে যুবকদিগের সম্মিলন হয়। প্রথমতঃ একটী যুবক ইংরেজিতে সুদীর্ঘ একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে ভ্রাতা সারদাপ্রসন্ন সেন এবং রমেশচন্দ্র সমাদ্দার কিছু কিছু বলেন। অতঃপর অধ্যাপক পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার উপাসনা ও উপদেশ দিয়া কার্য্য শেষ করেন।

২৬শে ভাদ্র, রবিবার, দিনব্যাপী উৎসব হয়। পূর্ব্বাহ্নে ৮টাতে সঙ্গীত হইয়া ৯টাতে উপাসনা আরম্ভ হয়। ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন। "প্রেম" বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হয়। ১২টাতে সাধু-সেবা হইয়া, পুনরায় ২টাতে মাধ্যাহ্নিক উপাসনা হয়। ভাই অখিলচন্দ্র উপাসনা করেন। তৎপর ভাই দুর্গানাথ শাস্ত্রপাঠ করেন। পাঠান্তে আলোচনাতে অনেকে উৎসাহসহকারে যোগ দিয়াছিলেন। অন্যান্ত বিষয়ের মধ্যে আলোচ্য বিষয় একটী এই ছিল যে, "আমরা গোলমালে দিন কাটাইতে পারি না। 'ভক্তের নাম চৈতন্য'। 'তিনি মৃতদিগের নহে, কিন্তু জীবিতদিগের ঈশ্বর, কারণ তাঁহাতে সকলে জীবিত।'"

আলোচনান্তে ভাই মহিমচন্দ্র ধ্যানের উদ্বোধন করেন এবং ধ্যানান্তে ব্যক্তিগত প্রার্থনা হয়। প্রার্থনা শেষ হইলে জমাট কীর্ত্তন হয় এবং তৎপরে ভাই চন্দ্রমোহন দাস বেদী গ্রহণ করিয়া উপাসনা করেন এবং উপদেশ প্রদান করেন। উপদেশে আনন্দময়ী জননীর আগমন বিশেষভাবে প্রকাশিত হয় এবং আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের একটী উক্তিরও বিশেষ উল্লেখ হয়। সে উক্তিটী এই—"মার গুপ্তসুধা উথলিয়া পড়িতেছে, খুব খাও, খুব খাও।"

২৭শে ভাদ্র, সোমবার, পূর্ব্বাহ্নে দেবালয়ে, দেবালয় প্রতিষ্ঠার উপাসনা, এবং সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে সংকীর্ত্তনে আরাধনা ও ধ্যান হইয়া সাধারণ প্রার্থনান্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তন হয়। যে দুইটী নূতন সঙ্গীত সেদিন সংকীর্ত্তিত হইয়াছিল, এস্থলে তাহা প্রদত্ত হইল।

সনৃত্য কীর্ত্তন।

(১)

তোরা আয়রে মায়ের শ্রীমন্দিরে, আজ নাচি গাইরে।
মা মা বলে আয়রে তোরা, প্রেমে গলে আয়রে।
(মায়ের শ্রীমন্দিরে রে)
মা আমাদের আমরা মায়ের, আর ভাবনা নাই রে।
মা আমাদের জগদম্বা, আমরা সবে ভাই রে;
নূতন বিধানে পাপী সাধুর বিচার নাই রে।
(মায়ের ঘরে যেতে)
যাই সব, যাই সব, অন্য ভজন নাই রে;
মা নরকেতে অবতীর্ণ, বড় আশা তাই রে।
'মাতৃ-প্রেম সহজ সাধন' তাকি শুন নাইরে;
মায়ের মহাপ্রদর্শনী, একবার দেখে যাওরে।

ব্রহ্মানন্দী দলে মিশে, মায়ের কাছে যাইরে ;
মায়ের ঘরে প্রেম পুণ্য, উদর পুরে খাইরে।
মায়ের কাছে নেচে নেচে ঘুরিয়ে বেড়াইরে ;
ঈশা, মুসা, গৌর, শাক্য আমাদের ভাইরে।
পাষণ্ড পামর জুড়া, আমার মত নাইরে ;
তবু ত মায়ের প্রেম আমার ছাড়ে নাইরে।
নূতন বিধানে কারো, ছাড়াছাড়ি নাইরে ;
সুর নর সবে মিলে, এক হয়ে যাইরে।
নবভক্তদলে মিশে, মার গুণ গাইরে ;
ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে মায়ের অন্তঃপুরে যাইরে।

(২)

হরি হরি হরি বলে, মিশিয়ে অমরদলে,
হরি বলে এস নাচি গাই। (ভাইরে)
হরি পিতা, হরি মাতা, হরি গুরু জ্ঞানদাতা,
শ্রীহরি বিনে গতি নাই। (ভাইরে)

ভক্তরত্নহার গলে, হরিপদ হৃদকমলে, ধরি, করি নামসুধা পান ; (ভাইরে) সুধ-সিন্ধু উর্দ্ধদিকে, সুর নর এক হবে, প্রবেশিব নিত্যানন্দধাম। (ভাইরে)

নূতন বিধানসুরা, পানে হয়ে মাতোয়ারা, ধন্য করি এ পাপ জীবন ; (ভাইরে) বল বিধানের জয়, জগন্মাতার জয়, যা বলে যাই অমর ভবন। (মা মা মা বলে)

(হয়ে) জ্ঞানে প্রবীণ, যোগে শান্ত, কর্ম্মে উৎসাহী জীবন, প্রেমে মত্ত মাতঙ্গের প্রায় ; (ভাইরে) হব সবে মূর্ত্তিমান, জীবন্ত নববিধান, যে বিধানে পাপী স্বর্গে যায়। (ভাইরে)

গৌরপদধূলি লয়ে, মহাভাবে বিভোর হয়ে, প্রেমসিন্ধু-জলে দিব ঝাঁপ ; (ভাইরে) চিদানন্দে ডুবিয়ে, রহিব বিলীন হয়ে, পাশরিয়ে ভবশোকতাপ। (ভাইরে)

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন।

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সাম্বৎসরিক।

কোচবিহারের নবজীবনদাতা শ্রীমন্মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুরের একবিংশ স্বর্গারোহণসাম্বৎসরিক, গত ১৮ই সেপ্টেম্বর, কোচবিহারে অতি গম্ভীরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। সেবক ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক, ভগ্নদেহ, ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও, পুরীধাম হইতে আসিয়া অনুষ্ঠানটী সুসম্পন্ন করেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর, ভাই প্রিয়নাথ আসিয়া, কেশবাশ্রমে পারলৌকিক উৎসবের আন্তরিক উপাসনা করেন ; সন্ধ্যাতেও প্রচারাশ্রমে ভ্রাতা নবীনচন্দ্র ও ভ্রাতা কেদারনাথের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত উপাসনা হয়।

১৮ই, কেশবাশ্রমস্থিত সমাধিমণ্ডপে, রাজপ্রতিনিধির আমন্ত্রণে ও রাজকীয় অনুষ্ঠানরূপে, রাজকর্ম্মচারিগণ ও প্রজা-প্রতিনিধিগণ সহ, প্রাতে ৮॥টার সময় উপাসনা হয়। প্রত্যক্ষ ব্রহ্মবক্ষে পরলোকগত মহারাজের আত্মা "পরিণামে শান্তিলাভে" সমাধিস্থ, ইহা উপলব্ধি করিয়া, ভাই প্রিয়নাথ উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনা-যোগে পরলোকগত আত্মার সমাগম সাধন করেন।

অপরাহ্ণ ৪॥টার সময়, কাউন্সিল হলের বারাণ্ডার এবং শ্রীমন্মহারাজের মর্ম্মরমূর্ত্তির পশ্চাতে, মাননীয় রেভিনিউ অফিসার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্মৃতিসভা হয়। সঙ্গীত হইয়া একটি যুবকলিখিত রাজাভিনন্দন পদ্য আবৃত্তির পর, ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। তিনি শ্রীমন্মহারাজের তর্পণসূচক একটি মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ নিয়োগী, শ্রীযুক্ত বাবু অমূল্যরতন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বসু মজুমদার, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ, জজ মিঃ এস, এন, গুহ মহারাজের বিচিত্র গুণাবলী বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করিলে, সভাপতি মহাশয় অল্প কয়েকটি কথায়, এই সর্ব্বজনপ্রিয়, নব কোচবিহারনির্ম্মাতা শ্রীমন্মহারাজের বার্ষিক শ্রাদ্ধবাসরে যোগদান করিয়া, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার্পণের জন্য সমগ্র কোচবিহারবাসীকে বিশেষভাবে আহ্বান করেন। সর্ব্বশেষে ভাই প্রিয়নাথ সভাপতি ও বক্তাদিগকে ধন্যবাদ দান করেন।

স্থানীয় ধর্ম্মসভার সম্পাদক মহাশয়ের নেতৃত্বে সংকীর্ত্তনদল সভাভঙ্গের পর সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সমাধিস্থানে গিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উন্মত্তভাবে সংকীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করেন। রাজঠাকুরবাড়ীতেও এই উপলক্ষে অপরাহ্ণ হইতে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক দরিদ্রনারায়ণের সেবা হয়। ব্রহ্মমন্দিরেও সান্ধ্য সাপ্তাহিক উপাসনা ভাই প্রিয়নাথই সম্পাদন করেন। শ্রীমন্মহারাজ এই যে নববিধান মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, যেখানে সমুদায় কোচবিহারবাসী নরনারী আসিয়া, তাঁর নিরাকারা সচ্চিদানন্দরূপিণী জননীকে পূজা করিয়া, নববিধানের নবজীবন লাভ করিবেন এবং নূতন মানুষ হইবেন, ইহাই তাঁহাদের জন্য মহারাজের সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান ও দান। ইহাই উপলব্ধি করিয়া উপাসনা ও প্রার্থনাদি হয়।

পরদিন সোমবার প্রাতে সমাধিতে বিশেষ উপাসনাযোগে এই পারলৌকিক উৎসবের শান্তিবাচন হয়। শ্রীমন্মহারাজ কোচবিহারে রাজধর্ম্ম নববিধান বলিয়া যে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, কোচবিহারের প্রজাদিগের সমবেত উপাসনার জন্য যে নববিধানের শ্রীমন্দির স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং

তাঁহাদের সেবার জন্য যে নববিধানের এই পবিত্র তীর্থ কেশবাশ্রম করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া নববিধানবিশ্বাসী নরনারী মাত্রেরই তাঁহার প্রতি চিরকৃতজ্ঞতা দান করা কর্ত্তব্য। কোচবিহারে যাহাতে নববিধানের প্রসারণ হয়, তজ্জন্য প্রার্থনাশীল হই, এবং যে যতটুকু পারি, এই রাজ্যের সেবা করি, ইহাই যেন আমাদের সংকল্প হয়। এই ভাবে প্রার্থনা করিয়া, ভাই প্রিয়নাথ আজ যেখানেই থাকুন, কোচবিহারের জন্য বিশেষ প্রার্থনাদি করিবেন এবং পরলোকগত শ্রীমহারাজের আত্মার তৃপ্তিসাধন করিবেন, এই বলিয়া বিশেষ ব্রত গ্রহণ করেন। এই দিনই অপরাহ্ণে তিনি পুনঃ আশ্রমে পুনঃ যাত্রা করেন।

—•—

৺নৃপেন্দ্র-স্মরণে

(১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২, স্মৃতিসভায় পাঠার্থে বিরচিত)

(তুমি) ক'রেছিলে যাহা, পারে নাই তাহা,
কারবারে আজু কোনজন;
তব গুণগান, ওহে মহাপ্রাণ,
আজু গায় দেশবাসী পুরজন।
প্রজা-বৎসল, তব বাহুবল,
তব সুশাসন, ওহে নৃপবর!
কেহ ভুলে নাই, মনে জাগে তাই,
চোখে বহে বারিধারা ঝরঝর।
কথা অতীতের স্মরি, প্রজাদের—
মনে হাহুতাশ, জ্বলে দাবানল!
ভাবে মনে আজ, কবে মহারাজ,
পাবে তোমা সম দানী মহাবল।
দুখে প্রজাদের, তব হৃদয়ের—
মাঝে, উঠিত যে মহা আলোড়ন;
ত্বরা প্রতিকার, দূর করিবার—
তাহা, করিয়াছ কত আয়োজন!
ছিলে স্বরগের, তাই মরতের—
মাঝে, থাকিতে নারিলে বেশীদিন;
গেছ চলি' বীর, উঁচু করি শির,
করি মো'সবার চিরদীনহীন।
তোমা নমি' আজ, ওহে মহারাজ,
ওহে মহাবীর—ওহে মহাপ্রাণ!
দুখে মরে যাই, তোমা স্মরি' তাই,
মনে সুখ পাই—গেয়ে তব গান॥

শ্রীসত্যনারায়ণ মুকুল।

—•—

৺রাজেন্দ্র-স্মরণে

(১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩২, ধর্ম্মসভায় পঠিত)

হে রাজন্! আজি ঊনবিংশ বর্ষ পরে,
তব কমনীয় মূর্ত্তি উঠিয়াছে স্মৃতিপটে জাগি!
এই অভিশপ্ত দিনে—প্রতি ঘরে ঘরে,
বেহারনগরবাসী কেঁদেছিল, হায়! তোমা লাগি।
গম্ভীর সুধীর তুমি ছিলে, মহারাজ!
তোমার শাসনগুণে ছিল আশা দেশে উন্নতির;
গেলে চলি অসম্পূর্ণ রাখি' তব কাজ—
বেহারজননী চোখে বহাইয়া শোক-অশ্রুনীর!
ছিলে তুমি পিতৃ-ভক্ত, স্বদেশ-প্রেমিক,
ছিলে তুমি মহাবীর, তেজস্বী, স্বজনবন্ধু-প্রিয়;
রূপে গুণে অদ্বিতীয়, সতত নির্ভীক,
তাই তুমি আছ, রাজা, আজো হ'য়ে চিরস্মরণীয়।
শেষ বিদায়ের বেলা—শেষের সে কথা—
ক'রেছিলে যাহা তুমি জননীরে জানি অভাগিনীরে!
আজু যবে জাগে মনে,—সেই বক্ষ ব্যথা—
তব উক্তি, "হায় মৃত্যো! ডুবিতেছি আমি ধীরে ধীরে।—
দুর্দ্দিনের তরে গো মা, এসেছিনু নামি',
সাঙ্গ বুঝি হ'ল মোর, জননী গো! ধরণীর কাজ;
জীবনের অর্দ্ধ পথে রথ যাবে থামি',
ব্যথা শুধু—হায়! তোমা ছেড়ে গো মা যেতে হবে আজ।"
শেল বাজে কমনীয় পঞ্জরের মাঝে,
"হায় বাছা! হেন কথা শুনিতে হইল মোরে আজ?"
জড়াইয়া জননীরে যুগবাহু-হারে—
ঢেলে দিলে তাঁর কাণে সান্ত্বনার বাণী মহারাজ!
"শুন মাতা, তুচ্ছ রাজরাজেন্দ্র কি ছার—
রাজার উপরে যিনি—যাঁরে কহি রাজ অধিরাজ—
তাঁকেও মরিতে হবে—নাহি অধিকার—
যাত্রা-পথে বাধা দিতে—সাঙ্গ যার কাজ।"
হেন জ্ঞানগর্ভ বাণী করি উচ্চারণ—
আত্মীয় স্বজন মাতা ভ্রাতা বন্ধু সবারে তেয়াগি;
একত্রিংশ বর্ষে স্বর্গে করিলে গমন—
গত ঊনবিংশ বর্ষ—তবু আছো সর্ব্ব চিতে জাগি।
স্বর্গে থাক চির সুখে—শান্তিদাতা ঈশ্বরের শান্তিনিকেতনে!
শুভাশীষধারে সদা কর ধন্য, তব চিরদীন প্রজাগণে।

শ্রীসত্যনারায়ণ মুকুল।

—•—

ত্রিষষ্টিতম ভাদ্রোৎসব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২৩শে আগষ্ট, ৭ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক। এ দিন পূর্ব্বাহ্ণে ব্রহ্মমন্দিরে ডাক্তার জগন্মোহন দাস উপাসনার কার্য্য করেন। তিনি হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাসের সহিত উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। অদ্যকার প্রতিষ্ঠিত উপাসনার মহৎ ফল বঙ্গ, ভারত ও সমস্ত পৃথিবী লাভ করিয়া যাহাতে ধন্য হইতে পারে, তজ্জন্য বেদী হইতে আশাপূর্ণহৃদয়ে ব্যাকুল প্রার্থনা হয়।

সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন। তাঁহার উদ্বোধন, আরাধনা এবং তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ সরস ও অতি সারগর্ভ হইয়াছিল। "দেহে স্বর্গদর্শন" আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করিয়া, সেই প্রার্থনা অবলম্বনে উপদেশ দেওয়া হয়। এই দেহের মধ্যেই স্বর্গ, এই দেহের মধ্যেই নরক। ঈশ্বরবিহীন হইয়া হীন বাসনা ও প্রবৃত্তির অধীন হইলেই দেহের মধ্যে নরক, আর ঈশ্বরের অধীন হইয়া তাঁহার প্রেরণা প্রভাবে জীবন যাপন করিয়া দিব্য জীবন লাভ করিলেই দেহে স্বর্গ। পৃথিবীর অতীত ইতিহাসপাঠে দেখা যায়, সংসার কখনও দুঃখ, দৈন্য ও পরীক্ষা-শূন্য ছিল না, এখনও নয়। সুখ দুঃখ, সম্পদ্ বিপদ্, পূর্ণিমা অমাবস্যা, ইহার ভিতর দিয়াই মানুষের জীবন-যাপনের ব্যবস্থা। এই সকল অবস্থা অতীতেও কোন না কোন আকারে মানবসমাজে বর্ত্তমান ছিল, এখনও নানা আকারে তাহা বর্ত্তমান আছে। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া, তাঁহার প্রেরণার প্রভাবাধীন হইলে, সকল বিপদ্ পরীক্ষা এক সম্পদে পরিণত হয়। এ বেলার উপদেশে এইটী বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য বিষয়।

২৪শে আগষ্ট, ৮ই ভাদ্র, বুধবার, ব্রহ্মমন্দিরে অপরাহ্ণে ৩॥টায় নববিধানবিশ্বাসীদিগের সম্মিলন ও সন্ধ্যা ৭টায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সংকীর্ত্তন হয়। শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সংকীর্ত্তনে নেতৃত্ব করেন।

২৫শে আগষ্ট, ৯ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৭টায় শান্তি-কুটীরে "আমাদের সঙ্ঘের" উৎসব। মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী সুমিষ্ট উপাসনা ও প্রার্থনা করেন। পাঠ ও সঙ্গীতাদি হয়।

২৬শে আগষ্ট, ১০ই ভাদ্র, শুক্রবার, সন্ধ্যা ৭টায়, ব্রহ্মমন্দিরে কেবল মাত্র মহিলাদিগের জন্য উপাসনা। অতি বৃষ্টির জন্য অনেকেই উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অল্প কয়েকটী মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। ডাক্তার সত্যানন্দ রায় এ বেলায় উপাসনা করেন।

২৭শে আগষ্ট, ১১ই ভাদ্র, শনিবার, স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৭॥টায় নবদেবালয়ে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত উপাসনা করেন। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গ হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু শ্রদ্ধেয় ভাইয়ের জীবনী অবলম্বনে প্রসঙ্গ করেন।

২৮শে আগষ্ট, ১২ই ভাদ্র, রবিবার, ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিন-ব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৭টায় কীর্ত্তন। তৎপর ৮টায় উপাসনা, ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার প্রদত্ত এ বেলার উপদেশ ইতিপূর্ব্বেই ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছে। মধ্যাহ্নে ৩টায়, শ্রদ্ধেয় ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। তৎপর ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র রায় পাঠ করেন। পাঠান্তে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু আলোচনার কার্য্য করেন। ৬টায় কীর্ত্তন হয়। ৭টায় ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনার কার্য্য করেন। নিবেদনে তিনি বলেন, এই ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষেই ভাদ্রোৎসব। ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক ও মণ্ডলীগত জীবনে এই উপাসনা প্রতিষ্ঠিত এবং জয়যুক্ত হইলেই সর্ব্ববিধ কল্যাণ। এই উপাসনায় রুচি নাই, মন্দিরের প্রতি তেমন অনুরাগ নাই। এই সকল অপরাধেই মণ্ডলীতে এমন বিচ্ছিন্ন ভাব, মণ্ডলী মৃতপ্রায়, কোন উৎসাহ নাই, আশা ভরসা নাই। শ্রীভগবানের অপার করুণায় আমরা এই ব্রহ্মমন্দির পাইয়াছি এবং ব্রহ্মোপাসনা পাইয়াছি। আমরা বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত, অনুরাগভরে, নববিধানের শ্রেষ্ঠ সাধনা, এই ব্রহ্মমন্দিরে সমবেত উপাসনা-যোগে, যেন নববিধানের মহামিলনের ধন্য লাভ করিয়া, পুনরায় মণ্ডলীতে নূতন জীবনের সঞ্চার করিয়া দিতে পারি, ভগবান্ তাহাই বিধান করুন।

সমাপ্ত

চিন্ময়ী দুর্গার পূজা।

নববিধানের উপাসকমণ্ডলী—সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী—এই চারি দিন, পূর্ব্বাহ্ণে কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে ও সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, বঙ্গের দুর্গোৎসব উপলক্ষে, সত্যস্বরূপা চিন্ময়ী দুর্গতিনাশিনী বিশ্বজননীর উপাসনার ব্যবস্থা করেন। ২০শে আশ্বিন, সপ্তমীর দিন পূর্ব্বাহ্ণে, নবদেবালয়ে শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যা সাবিত্রীদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনাদি হয়। ইহাতে দুর্গোৎসবের উল্লেখ ছিল। দুর্গোৎসব উপলক্ষে এ বেলা আর সেখানে স্বতন্ত্র উপাসনা হয় নাই। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই অখিলচন্দ্র রায় ভক্তি ও অনুরাগ-রঞ্জিত-হৃদয়ে, ব্যাকুলচিত্তে উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। "দুর্গতিহারিণী" শীর্ষক আচার্য্যের উপদেশ পাঠ করিয়া, তদবলম্বনে আত্মনিবেদনান্তর প্রার্থনা করেন।

২১শে আশ্বিন, অষ্টমীর দিন পূর্ব্বাহ্ণে, নবদেবালয়ে ভাই

গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। শারদীয় উৎসবে শ্রীমদাচার্য্যের অষ্টমী তিথি উপলক্ষে একটী প্রার্থনা পাঠ করিয়া, সমযোগে প্রার্থনা করেন। শ্রীমতী হেমলতা চন্দ সঙ্গীত করেন। সন্ধ্যায় ডাক্তার সত্যানন্দ রায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন। "নারী-প্রকৃতির পূজা" শ্রীমদাচার্য্যদেবের এই প্রার্থনা-পাঠান্তে, তিনি উপদেশ দেন ও প্রার্থনা করেন। সপ্তমী ও অষ্টমী দুই দিন ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনায় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র-নাথ সেন সঙ্গীত করেন।

২২শে আশ্বিন, নবমীর দিনে পূর্ব্বাহ্ণে নবদেবালয়ে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু উপাসনা করেন। তিনি শ্রীমদাচার্য্যদেবের একটী উপদেশ ও নবমী পূজা উপলক্ষে প্রার্থনা পাঠ করিয়া নিজে প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। তিনি আচার্য্যদেবের প্রার্থনা "চিন্ময়ী দুর্গা লাভ" পাঠ করিয়া আত্মনিবেদনে যা বলেন, তাহা আগামী বারে প্রকাশিত হইবে।

২৩শে আশ্বিন, রবিবার, দশমীর দিন সন্ধ্যায়, ব্রহ্মমন্দিরে অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন। তিনি শ্রীমদাচার্য্য-কৃত দশমীর উপদেশপাঠান্তে, বিশেষ তত্ত্বপূর্ণ উপদেশ দান করেন। বেদ ও পুরাণের মিলনে নবধর্ম্মের মহাপূজা, তাঁহার বলিবার বিশেষ বিষয় ছিল। তাঁহার বিস্তৃত উপদেশ আমাদের হস্তগত হইবে কিনা, আমরা জানিনা। তাঁহার উপদেশের বিশেষ কয়েকটী কথা এখানে উল্লেখ করা হইল। পরমজ্ঞানী শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যদেব বৌদ্ধধর্ম্মের মূল উচ্ছেদ করিয়া, বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ভারতে প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করিলেন। তিনি,দেখিলেন, এ কঠিন আধ্যাত্মিক সাধন সর্ব্বসাধারণের উপযোগী হইবে না; তাই তিনি জ্ঞানীদিগের জন্য ব্রহ্মের অদ্বৈতবাদসাধনা ও সাধারণের জন্য বাহ্যমূর্ত্তি অবলম্বনে পৌত্তলিক পূজাই নির্দ্ধারণ করিয়া গেলেন। ইহার ফল এই হইল, দেশের শ্রেষ্ঠ লোক যাঁহারা, জ্ঞানী সাধক-শ্রেণী যাঁহারা, তাঁহারা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া অদ্বৈতবাদসাধ-নায় রত হইলেন, আর গৃহপরিবারে সর্ব্বসাধারণ বাহ্য মূর্ত্তিপূজাই অবলম্বন করিলেন। তাই গৃহপরিবারে দেশময় মূর্ত্তিপূজা। নবযুগে মহাত্মা রামমোহন গূঢ়রূপে এসলাম ধর্ম্মের প্রভাবা-ধীনে উপনিষদের একমেবাদ্বিতীয়ম্ নিরাকার ব্রহ্মের পূজা প্রতি-ষ্ঠিত করিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ভক্তিনয়নে ঈশ্বরের সকল খণ্ড প্রকাশকে অমূর্ত্ত এক অখণ্ড পূর্ণব্রহ্মে পরিণত করিতে যাইয়া, উপনিষদ্ ও পুরাণের মিলনে, ব্রহ্মের মহা উপাসনা প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত করিলেন।

—•—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ২৩শে সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যায় ৬৫।১নং হ্যারিসন রোডে, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের জন্মদিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। তিনি ৮৪ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৮৫ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে সহ-ধর্ম্মিণী ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২রা অক্টোবর, প্রেরিতপ্রবর স্বর্গগত ভাই প্রতাপচন্দ্রের জন্মদিনে, শান্তিকুটীরে, হাজারিবাগের অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২৯।১এ নিউপার্ক ষ্ট্রীটে, আমাদের প্রিয়তম ভ্রাতা ডাঃ সত্যানন্দ রায়ের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া সুনীতি রায়ের ("নুনুর") জন্মদিনে, হাজারিবাগের অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন। সকলের প্রিয় "নুনু" যে দিন মর্ত্তে জন্মলাভ করিয়া এমন পবিত্র সুন্দর জীবন লাভ করিয়াছিলেন, সে জন্মদিন আমাদের জীবনে শুভদিন হউক।

বিগত ১০ই অক্টোবর, প্রাতে রাঁচি-নামকুমে, শ্রীযুক্ত গৌরী-প্রসাদ মজুমদারের গৃহে, তাঁহার জ্যেষ্ঠা পৌত্রী শ্রীমতী চিত্রা মজুম-দারের জন্মদিনে, পিতামহ উপাসনা করেন। পিতামহী বিশেষ প্রার্থনা করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় কলিকাতা হইতে সমাগত কয়েকটী বন্ধু ও মহিলা এবং স্থানীয় দুইএকটী বন্ধু ও মহিলা উক্ত গৃহে মিলিত হন। সকলের অনুরোধে কলিকাতা হইতে সমাগত ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন একটী প্রার্থনা এবং তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ সুধীন্দ্র চট্ট একটী সঙ্গীত করেন।

জাতকর্ম্ম—গত ৬ই অক্টোবর, সায়ংকালে, রেঙ্গুনপ্রবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস তালুকদারের (বার-এট্-ল) নবজাত শিশু-পুত্রের জাতকর্ম্মানুষ্ঠান উপলক্ষে তদীয় বাসভবনে বিশেষভাবে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত কুলদাচন্দ্র নিয়োগী আচার্য্যের কার্য্য করেন ও শ্রীমান্ সংগ্রামসিংহ তালুকদার সঙ্গীত করেন। গত ২৫শে সেপ্টেম্বর শিশুটী জন্মগ্রহণ করে। ভগবান্ শিশুকে এবং তাহার পিতামাতা ও ভাইবোনকে আশীর্ব্বাদ করুন।

গত ১০ই অক্টোবর, পূর্ব্বাহ্ণে, ২৯।১এ নিউপার্ক ষ্ট্রীটস্থ ভবনে, ডাক্তার সত্যানন্দ রায়ের ও স্বর্গীয়া সুনীতি রায়ের শিশুপুত্রের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। শিশুটী গত ১০ই সেপ্টেম্বর, মেডিকেল কলেজের ইডেন হাসপাতালে জন্মিবার পরমুহূর্ত্তেই মাতৃদেবী স্বর্গারোহণ করেন। সর্ব্বমঙ্গলা পরমজননী মাতৃহীন শিশুকে মঙ্গলে কল্যাণে রক্ষা করুন ও তাঁর আশীর্ব্বাদের সঙ্গে স্বর্গস্থ মাতৃদেবীর আশী-র্ব্বাদও শিশুর মস্তকে দান করুন। শিশুরত্নটী পিতার বক্ষে চির সান্ত্বনা হয়ে থাকুক।

নামকরণ—গত ৩রা অক্টোবর, পূর্ব্বাহ্ণে, ৭৯নং অপার সার্কুলার রোড গৃহে, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দনের কন্যার নাম-করণ উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। কন্যা 'জ্যোৎস্না' নাম প্রাপ্ত হয়। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে। করুণাময় ঈশ্বর শিশুকন্যা ও তাহার জনক জননীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—গত ১৭ই আশ্বিন (৩রা অক্টোবর), ৩৬নং বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটস্থ বিদ্যাসাগর বাটীতে, নববিধানের শাস্ত্রসাধক স্বর্গগত ভাই কেদারনাথ দের দৌহিত্রী, শ্রীযুক্ত ডাঃ হৃদয়চন্দ্র দাস ও শ্রীমতী অশোকলতা দাসের দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী শান্তিলতা দাসের (M.A.) সহিত, ফরিদপুরনিবাসী খাঁ বাহাদুর আবুল খয়ের কবিরুদ্দিন আহমেদের দ্বিতীয় পুত্র, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক উচ্চশিক্ষিত কবি শ্রীমান্ হুমায়ুন কবিরের (M.A., B. A.—Oxon) শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করিয়াছেন।

অদ্য ১৷৩ নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য লেনে, স্বর্গীয় মদনমোহন সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ বিজয়মোহন সেনের সহিত, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ রায়ের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী কমলার শুভবিবাহও সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ এই বিবাহেও আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করিয়াছেন।

ভগবান্ নবদম্পতিযুগলকে স্বর্গের শুভাশীষ দান করুন।

পুরীতে শারদীয় উৎসব—গত শারদীয় পূর্ণিমা দিনে, পুরী নবশ্রীক্ষেত্রস্থ "সেবকের নবপর্ণকুটীর" নবসংহিতা অনুসারে প্রাতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, এইখানেই শারদীয় উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃ সন্ধ্যা উপাসনা, পাঠ ও কীর্ত্তন এবং মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজন সহকারে উৎসব সম্পন্ন হয়। কুটীর-প্রতিষ্ঠাকালে নবসংহিতার প্রার্থনা উচ্চারণ করা হইলে, শ্রীমতী হেমন্তকুমারী মল্লিক কতিপয় ব্রহ্মকন্যাসহ শঙ্খধ্বনি করিয়া দ্বারে প্রথম প্রবেশ করিলে পর উপাসকগণ প্রবেশ করেন। প্রাতঃ সন্ধ্যা ভাই প্রিয়নাথই উপাসনা করেন। প্রাতঃকালীন উপাসনাকালে ডাঃ গণপতি চক্রবর্ত্তী ও সন্ধ্যায় ডাঃ রসিকলাল রায় প্রার্থনা করেন। এই উৎসবে কলিকাতা, কটক, বালেশ্বর, বাগনান ও স্থানীয় বিশ্বাসী বন্ধুগণ যোগদান করিয়া উৎসবানন্দ বর্দ্ধন করেন।

প্রত্যাবর্ত্তন—আমাদের প্রিয়তম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন সস্ত্রীক, প্রায় বৎসরেক কাল আমেরিকা ও ইউরোপের বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়া, সুস্থশরীরে ও নিরাপদে, গত ২৯শে অক্টোবর কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের শুভ প্রত্যাবর্ত্তনে স্বগৃহে ১নং গিরীশ বিদ্যারত্ন লেনে, ভগবচ্চরণে কৃতজ্ঞতাদানসূচক উপাসনা হয়; প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন। ভগবান্ তাঁহার পুত্রকন্যার জীবনে জয়যুক্ত হউন।

বিলাত-যাত্রা—গত ২রা অক্টোবর, স্বর্গগত ভাই বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অমিয়বালা ঘোষ Laboratory সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতালাভার্থ বিলাতযাত্রা করিয়াছেন। সর্ব্বমঙ্গলা মা তাঁহাকে মঙ্গলে কল্যাণে রক্ষা করুন ও বিশেষ আশীর্ব্বাদ করুন।

পরলোকগমন—আমরা খবরের কাগজে পড়িয়া অতীব দুঃখিত হইলাম, আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রবীণ বন্ধু ডাঃ পি, চাটার্জ্জি ইংলণ্ডে পরলোক গমন করিয়াছেন। এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি একে একে পত্নী, দুই পুত্র, এক জামাতাকে হারাইয়া ভগ্নপ্রাণে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এখন অমরধামে, তাঁহাদের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়া, তাঁহার শোকার্ত্ত প্রাণ শান্ত হইয়াছে। ভগবান্ পরলোকগত আত্মাকে অনন্ত শান্তিধামে রক্ষা করুন এবং পৃথিবীস্থ পুত্র, কন্যা ও আত্মীয় স্বজনগণের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

পারলৌকিক—বিগত ২৫শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, প্রাতে ভাগলপুর লীলালজে, স্বর্গীয়া সুমুর (সুনীতি রায়ের) স্বর্গগত আত্মার কল্যাণার্থ বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। শ্রীমতী মনোমোহিনী বসু উপাসনার কার্য্য করেন। শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু 'পরলোকের সন্ধান' হইতে, আশীষ হইতে 'মানবপ্রকৃতিদর্শন' ও আচার্য্যদেবের প্রার্থনা হইতে 'ঈশ্বরেতে আত্মীয়তা' পাঠ করিয়া, শোকপূর্ণ কাতর অন্তরে ভগিনীর আত্মার জন্য বিশেষ প্রার্থনা করেন। উপাসনান্তে তাঁর উন্নত বিধানবিশ্বাসী জীবনের সাধুভাবগুলির আলোচনা হয়। শ্রীমতী অকিঞ্চনবালা বসু বলেন, সুমুর স্বভাব কি সুন্দর মিষ্ট অমায়িকভাবে যে পূর্ণ ছিল, সদাই তাঁর হাসিমুখ দেখতাম, আর উপাসনাদিতে একান্ত মুগ্ধভাবে যোগ দেওয়ায় খুব উন্নত ধর্ম্মজীবনের পরিচয় পাওয়া যেতো। শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ বলেন—তাঁর পিতৃদেবের (৺জগন্মোহন বীর) স্বর্গগমনের সংবাদ পাইয়া সুমু একখানি সহানুভূতিসূচক পত্র লেখেন, তাহা গভীর বিশ্বাস ও পরলোকের কথাতে পূর্ণ ছিল, এত অল্প বয়সে ঐরূপ লেখার ভাব অপরের মধ্যে কম দেখা যায়। এই উপলক্ষে ভগ্নী শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরে দান ২৲ এবং স্থানীয় কয়েকটী দুঃখী পরিবারে কয়েকখানা খদ্দর চাদর ও শাড়ী বিতরণের সংকল্প করিয়াছেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ১৫ই সেপ্টেম্বর, লণ্ডনে, আমাদের প্রিয়তম ভ্রাতা ডাঃ নবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁহার মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। ডাঃ পি, চাটার্জ্জি উপাসনা করেন এবং মিঃ পি, কে, দত্ত সঙ্গীত করেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর, কলিকাতায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ৬ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, ৭৮বি অপার সর্কুলার রোডে, নবদেবালয়ে, শ্রীমদাচার্য্যদেবের মধ্যমা কন্যা, কুচবিহারের স্বর্গীয় কুমার গজেন্দ্র নারায়ণের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া সাবিত্রীদেবীর পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান গম্ভীরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উদ্বোধন ও আরাধনা করেন, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ নবসংহিতার অনুষ্ঠানের প্রার্থনাপাঠানন্তর স্বয়ং প্রার্থনা করেন, ভাই অক্ষয়কুমার লধ শ্লোকাদি পাঠ ও অন্যান্য অংশ সম্পন্ন করেন, ভাই অখিলচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্তা হেমলতা চন্দ

সাধারণ প্রার্থনান্তে বিশেষ প্রার্থনা করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার বিকাশেন্দ্র নারায়ণ ভ্রাতৃগণের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে ৪টী ভোজ্য, ৩০খানা বস্ত্র, ৩খানা গৈরিক, ৩টী ছাতা, ১৫টী ঘটী, ৭খানা পাথরের রেকাবি, ৩খানা আসন ও ৩জোড়া বিনামা ব্যতীত, ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নগদ ২০০৲ দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫০৲ টাকার সুদ হইতে কুচবিহার সুনীতি-কলেজের জনৈক ছাত্রীকে প্রতিবৎসর সচ্চরিত্রতার জন্য পুরস্কার দেওয়া হইবে।

গত ৭ই অক্টোবর, কলুটোলায়, ৩৪নং রামকমল সেন লেনে, কৃষ্ণভবনে, শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দদেবের অনুজ ভ্রাতা স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী সরমা দেবী হৃদ্‌রোগে বহুদিন ভুগিয়া, হরিনাম করিতে করিতে, পিতৃমাতৃসদনে পরম জননীর ক্রোড়ে চলিয়া গিয়াছেন। সরমা দেবী (ধেবড়ি) পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নীগণের বড়ই আদরের ছিলেন। কুমারী থাকিয়া মাতৃদেবীর কত সেবা করেন; মাতৃবিয়োগের পর ভ্রাতৃগণের ও কনিষ্ঠা ভগ্নীর সেবার ভার মাথায় লইয়া, অক্লান্ত-শ্রমসহকারে সংসার পালন করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি অতি ধর্ম্মপ্রাণা ও সেবাপরায়ণা ছিলেন। উপাসনা বড় ভাল বাসিতেন, এবং নিষ্ঠাপূর্ব্বক উপাসনায় যোগ দিতেন। মৃত্যুশয্যায় এই প্রিয় গান তাঁর মুখে সর্ব্বদা শুনা যাইত, "মোহ আবরণ, কর উন্মোচন, প্রাণভরে একবার দেখিহে তোমায়"। এখন অমৃতধামে মুক্তাত্মা শ্রীহরির নিত্য দর্শনশ্রবণানন্দে ব্রহ্মানন্দদলে মিশিয়া কত আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন। গত ১৭ই অক্টোবর, তাঁহার পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান উক্ত ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উদ্বোধন ও আরাধনা করেন, ভাই সত্যানন্দ রায় শ্লোকাদি পাঠ করেন, ভাই অক্ষয় কুমার লধ অনুষ্ঠানের অন্যান্য অংশ সম্পন্ন করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অশোক সেন প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সঙ্গীত করেন। এই অনুষ্ঠানে তিনটি ভোজ্য ও বস্ত্র ব্যতীত নগদ ৪৲ টাকা প্রচারভাণ্ডারে দান করা হইয়াছে।

গত ৮ই অকটোবর, ১৬নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে, ডাঃ উপেন্দ্রনাথ সরকারের গৃহে, তাঁহাদের কনিষ্ঠ সহোদর (ধুবড়ীর স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ সরকারের কনিষ্ঠ পুত্র) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার, ৫।৬মাস অসহ্য রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, সহধর্ম্মিণী, একটি শিশুপুত্র, ভাই ভগ্নী ও বন্ধুবান্ধবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, অমরধামে পরমজননীর চির শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন। গত ২৩শে অকটোবর, রবিবার, তাঁহার পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান ঐ গৃহে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উদ্বোধন ও আরাধনা করেন, ভাই অখিলচন্দ্র রায় নবসংহিতা হইতে অনুষ্ঠানের প্রার্থনাপাঠানন্তর শেষ প্রার্থনা করেন, ভাই অক্ষয়কুমার লধ শ্লোকাদি পাঠ ও অন্যান্য অংশ সম্পন্ন করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দিননাথ সরকার স্বরচিত দুইটী গান করেন ও প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অপর দুইটি সঙ্গীত করেন। জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাস এবং উপেন্দ্রনাথ সরকার পরলোকগত আত্মার সুন্দর জীবনের কথা পাঠ করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ১০৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, ধুবড়ি ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, গিরিধি নববিধান সমাজে ৫৲, মসজিদে ৫৲, ভিখারীদিগকে ৩৲ টাকা দান করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে ভগ্নী শ্রীমতী সরোজিনী রায় (রায় সাহেব ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায়ের পত্নী) ১৫খানা কম্বল দান করিয়াছেন।

গত ১২ই অক্টোবর, স্বর্গগত ভাই রামচন্দ্র সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত জনকচন্দ্র সিংহ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, পৃথিবীর সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, পত্নী, ভ্রাতা, মাতৃসমা মাসীমা ও বন্ধুবান্ধবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, চিরমুক্তির রাজ্যে অমৃতধামে পিতৃমাতৃসদনে চলিয়া গিয়াছেন। যে একটা আসক্তি তাঁহার জীবনকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছিল, তজ্জন্য দুইবার দুইবার ছাদের উপর হইতে পড়িয়া রক্ষা পাইয়াও, সে আসক্তির হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছিলেন না; অবশেষে, অকস্মাৎ দুর্ব্বল নশ্বর শরীর দান করিয়া, মুক্ত হইলেন। তিনি সরলপ্রাণে নিজের অপরাধ সব সময় স্বীকার করিতেন। তাঁর প্রাণটা বড়ই উদার ছিল, অর্থের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি ছিলনা। পিতামাতার সাম্বৎসরিক দিনে প্রতিবৎসর ভক্তির সহিত প্রচার-ভাণ্ডারে কিছু কিছু দান করিতেন। তিনি বড় সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। নিজগৃহে হারমোনিয়মযোগে প্রাণ ভরিয়া গান করিয়া প্রায়ই তৃপ্তি অনুভব করিতেন। গত ২১শে অক্টোবর, তাঁহার পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান, মঙ্গলবাড়ীর নিজগৃহে, ৮৩।১ অপার সার্কুলার রোডে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উদ্বোধন, আরাধনা ও শেষ প্রার্থনা করেন। ভাই অক্ষয়কুমার লধ শ্লোকাদি পাঠ করেন, ভাই অখিলচন্দ্র রায় অনুষ্ঠানের অবশিষ্ট অংশ সম্পন্ন করেন। খুল্লতাত-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত লাবণ্যচন্দ্র সিংহের পুত্র প্রধানশোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন গান করেন।

শ্রদ্ধেয় ভাই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা, কটক ভিক্টোরিয়া স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার হালদারের মাতৃদেবী, গত ২০শে আশ্বিন, কটকে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। গত ৩০শে আশ্বিন, কটকে উৎকল ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ২৫শে আশ্বিন, বাগনান দেউলটী পল্লিতে, গিরিধির স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ, স্বর্গীয় শ্যামলাল ঘোষের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী প্রতিভা ঘোষ, দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, পিতৃগৃহ হইতে পরমমাতার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। দেউলটীতে পিতা শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সিংহের ভবনেই, তাঁর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধক্রমে, স্বামীর সাম্বৎসরিক

দিনে, গত ৩১শে আশ্বিন, আদ্যশ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অখিলচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু শ্লোক পাঠ করেন। চতুর্থ সহোদর প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। কলিকাতা হইতে ভাসুর শ্রীযুক্ত নীতিলাল ঘোষ সপরিবারে যোগদান করিয়া পিতামাতাকে সান্ত্বনা দেন। শ্রাদ্ধবাসরে সংক্ষিপ্ত জীবনী পঠিত হয়। ইনি বড়ই শান্তশীলা ও মিষ্টস্বভাবা ছিলেন। ইঁহার সেবাপরায়ণ জীবন শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা, স্বামীর সেবা, গিরিধির উৎসবে সমাগত যাত্রিগণের সেবা প্রাণপণে করিয়া ধন্য হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ৩৲, বালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয়ে ২৲, প্রচার-ভাণ্ডারে ২৲, গিরিধি নববিধান মন্দিরে ২৲, বাগনান ব্রহ্মনন্দাশ্রমে ১৲, এবং প্রমথলাল শিক্ষাতীর্থে ৫৲ টাকা এবং একটী ভোজ্য, একখানি বস্ত্র ও দুখানি গৈরিক দান করা হইয়াছে। ২ই কার্ত্তিক, কলিকাতায়, ৭৮।১ হ্যারিশন রোডে, ভাসুর শ্রীযুক্ত নীতিলাল ঘোষের গৃহেও শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান হইয়াছে। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা ও পাঠাদি করেন, ভাই অখিলচন্দ্র রায় নবসংহিতা হইতে অনুষ্ঠানের প্রার্থনা পাঠ করিয়া শেষ প্রার্থনা করেন। নীতিলাল বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। এই উপলক্ষে একটী ভোজ্য দান করা হইয়াছে।

আমরা শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের প্রতি হৃদয়ের গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবান্ পরলোকগত আত্মাসকলকে তাঁহার নিত্যপ্রেমক্রোড়ে পরম কল্যাণে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ২৩শে সেপ্টেম্বর, প্রাতে, ৬৫।১নং হ্যারিশন রোডে, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের গৃহে, তাঁহার শ্বশুরের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। কন্যা শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দত্ত বিশেষ প্রার্থনা করেন। গত ২৫শে সেপ্টেম্বর, ঐ গৃহে, শ্রীনাথবাবুর কন্যা স্বর্গীয়া সুপ্রভা ঘোষের সাম্বৎসরিক দিনে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন। কন্যা শ্রীমতী সুহাসি ঘোষ এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর, ৫৬বি বিডনষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় বরদাপ্রসাদ ঘোষের সাম্বৎসরিক দিনে, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের গৃহে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ পিতৃজীবন স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করেন।

গত ২রা অক্টোবর, ১০নং নারিকেলবাগান লেনে, স্বর্গগত পূর্ব্ববাঙ্গলা নববিধানসমাজের আচার্য্য ভক্তিভাজন বঙ্গচন্দ্র রায়ের সাম্বৎসরিক দিনে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের গৃহে উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

বিগত ১১ই, ১৬ই ও ২৩শে অক্টোবর তারিখে, আরা-নিবাসী সাধক স্বর্গগত শ্রীনৃত্যগোপাল মিত্রের ও তদীয় সহধর্ম্মিণী দেবী অন্নদামণির এবং তাঁহার সহোদরা তপস্বিনী দেবী ক্ষীরোদমোহিনী বসুর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ যথাক্রমে ভ্রাতা ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্র সম্পন্ন করিয়াছেন। এবং শেষ দিবসে ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে ১০৲ দান করা হইয়াছে। বিধানজননী তাঁহার পুত্রকন্যাগণকে ব্রহ্মানন্দদলে চিরসুখী করিয়া রাখুন।

গত ২৫শে অক্টোবর, কলিকাতায়, শ্রীযুক্ত নীতিলাল ঘোষের গৃহে, তাঁহার শ্বশুর স্বর্গীয় বিহারীকান্ত চন্দের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

উৎসব—গিরিধি নববিধান ব্রহ্মমন্দিরের সপ্তদশ সাম্বৎসরিক উৎসব, ১০ই অক্টোবর, সোমবার, আরতি হইয়া আরম্ভ হয়। কীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দিরে প্রবেশানন্তর, আরতির সঙ্গীতান্তে ভাই অক্ষয়কুমার লধ আরতির প্রার্থনা পাঠ করেন। ১১ই প্রাতে, মিঃ ডি, এন্, মুখার্জি সুমিষ্ট উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় মেয়েদের উৎসব হয়, আচার্য্যদেবের কন্যা শ্রীমতী মণিকাদেবী উপাসনা করেন, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসু সঙ্গীতে নেতৃত্ব করেন। ১২ই সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন। ভগবানকে ছেড়ে, সভ্যতায় বা জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতিতে সুখ নাই, এই বিষয়ে সুন্দর উপদেশ দেন। অপরাহ্নে মিঃ ডি, এন্, মুখার্জি তৎকর্ত্তৃক অনূদিত "Heart-Beats' এর বঙ্গানুবাদ হইতে কিছু কিছু পাঠ করেন। সন্ধ্যায় কীর্ত্তনান্তে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। "নরনারী প্রত্যেকেই ব্রহ্মপুত্র, ব্রহ্মকন্যা—ব্রহ্মখণ্ড, ব্রহ্মঅংশ—কেহই অস্পৃশ্য নয়" এইভাবে আত্মনিবেদন করেন। ১৩ই প্রাতে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন, সন্ধ্যায় কীর্ত্তনান্তে ভাই অক্ষয় কুমার লধ আচার্য্যদেবের শান্তিবাচনের প্রার্থনা পাঠ করিলে, "নমোদেব, নমোদেব" কীর্ত্তন হইয়া উৎসব শেষ হয়। উৎসবে শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপা সকলে সম্ভোগ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ১১ই প্রাতে শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চাটার্জি, ১২ই প্রাতে শ্রীমতী সান্ত্বনা সেন ও শ্রীমান্ শশিকুমার চাটার্জি এবং অন্যান্য দিন শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর বসু সুমিষ্ট কণ্ঠে সঙ্গীত করিয়া সকলের প্রাণ তৃপ্ত করিয়াছেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ১৭ই কার্ত্তিক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৭ ভাগ।
২০শ সংখ্যা।

১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ সাল, ১৮৫৪ শক, ১০৩ ব্রাহ্মাব্দ।
17th November, 1932.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মা, ধন্য ধন্য তুমি! তোমার অপার করুণা-গুণে আমাদিগকে তোমার নবভক্ত ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের শুভ জন্মোৎসব সাধন ও সম্ভোগ করিতে আবার ডাকিতেছ। তাঁহাকে তুমি ১৯শে নবেম্বর, দেবী মা সারদার গর্ভ হইতে পৃথিবীতে জন্মদান করিয়াছিলে। এখন তাঁহাকে দেহমুক্ত করিয়াছ। তাই এ জন্মোৎসব তাঁর নশ্বর দৈহিক জীবনের জন্মোৎসব নয়। তিনি এই দেহে অবস্থান কালে এক জন্মদিনে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "আমার ত মৃত্যু নাই, তুমিই আমার বয়স, তুমিই আমার বাল্য, তুমিই আমার যৌবন, তুমিই আমার বার্দ্ধক্য। এ জীবনের ক্ষয় নাই।" তাই আমাদিগকে সেই অমর কেশবের জন্মোৎসব করিতেই আজ ডাকিতেছ। তিনি যে স্বীকার করিলেন, "আমরা দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ", তাই কেশবের মা তুমি, আমাদেরও মা তুমি, তোমাকেই আজ পূজা করি; এবং তোমার বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম নববিধানে বিশ্বাস করি। এই বিধান মানিলে, এই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া যেমন একই অখণ্ড দেহ, আমরাও যে তেমনি তোমার কেশবের সহিত একাত্মা হয়ে যাই। তাহা হইলেই কেশবের জন্মোৎসব আমাদের সবারই জন্মোৎসব হয়। আশীর্ব্বাদ কর, মা, আমরা যেন তোমার প্রকৃত নববিধানবিশ্বাসী হইয়া, এবার এই নবজন্মোৎসব সাধন করি এবং তোমার কৃপায় শ্রীকেশবের জন্মোৎসব যেন বিশ্বমানবের জন্মোৎসব হয়। তাঁহার দিব্য আত্মার সহিত একাত্মা হইয়া আমরা নবজন্ম লাভ করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শ্রীকেশবচন্দ্রকে গ্রহণ।

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়াচার্য্য ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব সমাগত। ভক্তজননী আমাদিগকে এই শুভ জন্মোৎসব-সাধনে ও সম্ভোগদানে ধন্য করিবেন। শ্রীকেশবচন্দ্র কে এবং তাঁহার সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ, এ সময়ে চিন্তা ও আলোচনা করা কখন অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

শ্রীকেশবচন্দ্রের জীবনের ইতিহাস এখনকার ছাত্রগণ অনেকেই হয়ত জানেন না। বঙ্গের মনীষীদিগের মধ্যে যাঁহাদের জীবনের ইতিহাস বিদ্যালয়ে পঠিত হয়, তাহার মধ্যে শ্রীকেশবের নাম অতি অল্প পুস্তকেই এখন দেখিতে

পাওয়া যায়। তাই ক্রমে ক্রমে তাঁহার জীবনমাহাত্ম্য বা মহত্ত্ব অনেকেই বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে।

ইহার কারণ, তিনি বাস্তবিকই অপর সাধারণ মানুষের মত ছিলেন না, এবং তাঁর পূর্ণ মহত্ত্ব উপলব্ধি করা সাধারণ বুদ্ধি বা জ্ঞান দ্বারা হইবারও নহে। আমরাও তাঁহাকে তেমন করিয়া লোকসমক্ষে পরিচিত বা প্রচারিত করিতে পারিতেছি না।

শ্রীকেশবচন্দ্র আপনাকে "অসাধারণ মানুষ, আমি অপর সাধারণ মানুষের ন্যায় নই" এই বলিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই অসাধারণ মানবত্ব হেতু তাঁহাকে গ্রহণ করা বা বুঝা সাধারণ লোকের পক্ষে এত কঠিন। সাধারণ যাহা, তাহা সাধারণ জ্ঞানে বুঝা যায়, গ্রহণ করা যায়; যাহা অসাধারণ, তাহা বুঝিতে বা ধারণ করিতে অসাধারণ শক্তির প্রয়োজন। তাই কেশবচন্দ্রকে বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে হইলে, আমাদের সাধারণ মানবীয় বিচারবুদ্ধি বা অহংজ্ঞান দ্বারা হইবে না। ঈশ্বরের প্রেরণা ও ঈশ্বরের অসাধারণ আলোকই তাঁহাকে বুঝিবার ও গ্রহণ করিবার উপায়। সেইজন্য তিনি বারবার বলিলেন, "আমাকে বুদ্ধির খাঁড়া দিয়া কাটিও না, বুদ্ধির শুষ্ক ভূমিতে আমাকে রাখিও না। জল মাছের আধার, জলশূন্য মাছ গ্রহণ কর।"

বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধাতা তাঁহাকে সর্ব্বসমন্বয়াচার্য্য করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। আচার্য্য অর্থ, যিনি আচরণ দ্বারা জীবনের সাধন প্রদর্শন করেন। সর্ব্বসমন্বয়ই কেশবচন্দ্রের জীবন। সমন্বয়বিধান নবযুগের নববিধান। এই নববিধান যাহা, শ্রীকেশবচন্দ্রের জীবনও তাহা।

এই নববিধান যেমন নূতন, কেশবের জীবনও তেমনই এক অসাধারণ নূতন জীবন। সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বসাধন, সর্ব্বভক্ত, সর্ব্বমানবের সমন্বয়ের দ্বারা এই জীবন গঠিত। সাধারণতঃ এক এক ধর্ম্ম, এক এক ভাব, এক এক তত্ত্ব, এক এক সাধন লোকে গ্রহণ করিতে পারে ও বুঝিতে পারে; কিন্তু সর্ব্বভাবের সমন্বয় কেমন করিয়া লোকে সহজে বুঝিবে ও ধরিবে?

ঈশার শিষ্যগণ ঈশাকে বুঝিতে পারেন, গ্রহণ করিতে পারেন, হিন্দুগণ হিন্দু ঋষিদিগকে গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহাদের শাস্ত্র বুঝিতে পারেন; তেমনি মুসলমান ধর্ম্ম মুসলমানগণ বুঝিতে পারেন, মোহম্মদকে গ্রহণ করিতে পারেন; বৌদ্ধগণ বৌদ্ধধর্ম্ম বুঝিতে পারেন ও বুদ্ধদেবকে গ্রহণ করিতে পারেন; ব্রাহ্মসমাজের লোকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বুঝিতে পারেন, গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম সকলকে সমন্বয় করিবার জন্য যিনি প্রেরিত এবং জীবনে যিনি সে সমুদয় ধর্ম্ম সমন্বিত করিয়া আচরণ করিলেন, তাঁহাকে একধর্ম্মাবলম্বী বা একভাবাবলম্বী মানব কেমন করিয়া বুঝিবেন বা গ্রহণ করিবেন? যোগী যোগসাধন করিয়া যোগ কি জানেন, ভক্ত ভক্তি সাধন করিয়া ভক্তিরত্ন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন; কিন্তু যিনি যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান সমন্বিত করিয়া জীবনে তাহা আচরণ করিলেন, তাঁহাকে কে বুঝিবে, এবং তাঁহার অনুসরণ বা অনুবর্ত্তন সহজে কে করিবে?

এই জন্যই সাধারণ লোকে শ্রীকেশবচন্দ্রের মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য ধরিতে পারে না। সাধারণ লোকের কথা দূরে থাক, তাঁহার অনুগামী আমাদের মধ্যেও কয়জনই বা তাঁহাকে ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন? তাই ত তাঁহাকে তেমন গ্রহণ করিতেও পারিতেছি না।

আমরা কি এখন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব না, মৃত পুত্তলিকা ও কল্পনা বা জ্ঞান-বিচার-সিদ্ধ ঈশ্বরের স্থানে, শ্রীকেশবচন্দ্রই বর্ত্তমান যুগে জীবন্ত জাগ্রৎ নিরাকার চিন্ময় ঈশ্বরকে মাতৃরূপে পূজা করিতে, প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে ও তাঁহার বাণী বিবেককর্ণে শ্রবণ করিতে শিখাইয়াছেন এবং জীবন দ্বারা এই দর্শন শ্রবণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং ইহা অতি সহজ-সাধ্য প্রমাণ করিয়াছেন? প্রকৃত বিশ্বাস-সহকারে, সরল শিশুর মত ক্রন্দন বা প্রার্থনাই যে মাতৃপূজার উপকরণ, ইহা কি শ্রীকেশব শেখান নাই?

আমরা কি স্বীকার করিব না যে, ঈশা, মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবুদ্ধ প্রভৃতি মহাজনদিগকে তাঁহাদের শিষ্যগণ ঈশ্বরাবতার বা দেবতা বলিয়া যে পূজা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে শ্রীকেশবই প্রেরিত মহাপুরুষ এবং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক আদর্শ মানুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে শিখাইয়াছেন এবং নিজ চরিত্রে তাঁহাদিগের প্রত্যেককে ও সমন্বিত ভাবে সকলকে আত্মস্থ করিয়া, জীবনে তাঁহাদিগকে প্রদর্শন করিয়া, আমাদিগকেও সেইরূপ করিতে প্রণোদিত করিয়াছেন?

পরলোক সম্বন্ধে আমাদের যে অজ্ঞতা ছিল, তাহা

অপনোদন করিয়া, পরলোক সাক্ষাৎ দর্শন ও পরলোক-গত আত্মাদিগের সঙ্গসাধন যে অতি সহজসাধ্য, তাহা কি আমরা শ্রীকেশবচন্দ্রের নিকট শিখি নাই?

সকল ধর্ম্মবিধানই যে বিধাতার বিধান এবং যাহা ঈশ্বরের বিধান, তাহা যে সত্য, সুতরাং সকল সত্যই ঈশ্বরের সত্য বলিয়া গ্রহণীয়, ইহা বিশ্বাস করিতে এবং সেইভাবে সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বশাস্ত্র, সর্ব্ব ভক্ত, সর্ব্ব জাতি, সর্ব্বমানবকে ভালবাসিতে ও সমন্বয়ভাবে গ্রহণ করিতে, শ্রীকেশবচন্দ্র ভিন্ন কে আমাদিগকে বর্ত্তমান যুগে শিখাইয়াছেন?

সাম্প্রদায়িকতা, স্বতন্ত্রতা, একদেশদর্শিতা, সংকীর্ণতাকে পাপ বলিয়া পরিহার করিতে, কি শ্রীকেশবচন্দ্রই আমাদিগকে শিখান নাই? পাপকে রোগ বলিয়া স্বীকার করিতে এবং পাপের সম্ভাবনাকেও মহাপাপ বলিয়া তজ্জন্য অনুতাপ করিতে, শ্রীকেশবচন্দ্রই কি শিক্ষা দেন নাই এবং আপনাকে সেই জন্য পাপীর সর্দ্দার বলিয়া স্বীকার করেন নাই? আবার পাপীকে রোগীর ন্যায় সেবা করিতে এবং ভালবাসিতে তিনিই ত শিখাইয়াছেন। সকল নরনারীকে ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মকন্যা বলিয়া পবিত্রভাবে দর্শন করিতে এবং কেহই অস্পৃশ্য বা ঘৃণা নয় বলিয়া সকলকে আদর ও শ্রদ্ধা করিতে, শ্রীকেশবচন্দ্রই আমাদিগকে শিখাইয়াছেন। শত্রুকেও ঈশ্বরসন্তান-জ্ঞানে ভাই ভগ্নী বলিয়া ভালবাসিতে, তাঁহার নিকট আমরা শিখিয়াছি।

কেশবচন্দ্র মণ্ডলীর ভাই ভগ্নী, দেশের, জাতির এবং জগতের ভাই ভগ্নী সকলকে কেবল এক ঈশ্বরের পরিবার বলিয়া গ্রহণ করিতে শিখাইয়াছেন, তাহা নহে; সমগ্র মানবপরিবারকে এক অখণ্ড ব্যক্তিরূপে বিশ্বাস করিতে এবং সকলকে এক বিশ্বমানবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জানিয়া পরস্পরকে গ্রহণ করিতে শিখাইয়াছেন এবং স্বয়ং জীবনে বিশ্বমানবত্ব প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়াছেন, ইহা কি আমরা অস্বীকার করিতে পারি?

রাজাকে ঈশ্বর-নিয়োজিত দেশ-প্রতিপালক ও রক্ষক বলিয়া ভক্তি করিতে এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত বিধিকে পালন করিতে যেমন শিক্ষা দান করিয়াছেন, তেমনি মাতৃভূমির প্রতি অবিচলিত ভক্তি করিতে ও মাতৃভূমির কল্যাণ সাধন করিতে শ্রীকেশবচন্দ্রই ত আমাদিগকে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিয়াছেন। এমন অটুট জাতীয়তা রক্ষা করিয়া, সর্ব্বজনীন প্রেম-সহকারে সর্ব্বজাতির সকল বিশুদ্ধভাব গ্রহণ করিয়া, জীবনের কর্ত্তব্যরূপে তাহা সাধন করিতে, তিনিই ত প্রণোদিত করিয়াছেন। স্বেচ্ছাচারবিরহিত পূর্ণ সপ্রেম স্বাধীনতাই যে যথার্থ স্বাধীনতা, ইহা কে প্রতিষ্ঠা করিলেন? রাজনীতি, সমাজসংস্কার, সুনীতিসঞ্চার, জাতীয় একতা সকলই ধর্ম্মের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, অন্যথা হইবে না, ইহা শ্রীকেশবচন্দ্রেরই শিক্ষা। "গৃহধর্ম্ম নিত্য কর্ম্ম পরম সাধন" কে বর্ত্তমান যুগে শিখাইলেন? সংসারে থাকিয়া যোগ ভক্তি বৈরাগ্য সাধন, ইহা শ্রীকেশবচন্দ্রই জীবন দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। সহধর্ম্মিণীর সহিত একাত্মতা-সাধনে, দু'জনে কেমন করিয়া একজন হওয়া যায়, তাহা কি তিনি সাধন দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেন নাই?

তাই তিনি এই সকল জীবনে আচরণ করিয়া যেমন নববিধান-মূর্ত্তিমান হইয়াছেন, তেমনি তাঁহার সহিত একাত্মতা অবলম্বনে, আমরাও পরস্পরকে স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া, নববিধানের প্রেমরাজ্য সংস্থাপন করি, ইহাই তিনি আমাদিগের নিকট চাহিয়াছেন।

অতএব আমরা তাঁহাকে, তাঁহার মাকে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত নববিধানকে এবং তাঁহার প্রত্যাদেশকে পূর্ণ ষোল আনা বিশ্বাস করি ও গ্রহণ করি। তাঁহাকে ঈশ্বর নিয়োজিত অগ্রজ ভাই ও ধর্ম্মবন্ধু জানিয়া, তাঁহার সহিত সমযোগী, সমভক্ত, সমবিশ্বাসী ও সহকর্ম্মী হইয়া, নববিধানের সাক্ষ্য জীবনে দান করি। তিনি যে মাকে মা বলিয়াছেন, সেই এক মাকে যথার্থ মা বলিয়া যদি বিশ্বাস করি, এবং সকলে মিলিয়া যদি তাঁরই পূজা করি, তবে নিশ্চয়ই তিনি আমাদিগকে তাঁর ভক্তের দাবী পূরণে সক্ষম করিবেন এবং তদ্দ্বারা জন্মোৎসবসাধন সার্থক করিবেন।

—০—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

নববিধানের চতুর্নীতি।

দেখা, শুনা, হওয়া, করা ইহাই নববিধানের চতুর্নীতি। প্রাচীন বিধানে ছিল, স্মরণ মনন, চিন্তন নিদিধ্যাসন, নাম গান, নাম জপ, নামের মালা গলায় পরা; কিন্তু এখন কেবল নাম নয়, নামের নামী জীবন্ত ব্যক্তিরূপে প্রকট হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাই এখন ত তিনি দূরে নন যে, তাঁহাকে নাম করিয়া ডাকিতে হইবে,—দূরস্থ ব্যক্তিকেই নাম করিয়া ডাকিতে

হয়, কিম্বা তাহাকে মনে করিয়া স্মরণ করিতে হয়। ঈশ্বর যে এই নিকটস্থ, সুতরাং তাঁহাকে বিশ্বাসচক্ষে দেখিতে হইবে, কর্ণে তাঁর কথা শুনিতে হইবে; তিনি যাহা ইচ্ছা করেন বা যেমন করিয়া গড়িতে ও সাজাইতে চান, তেমন হইতে হইবে এবং তিনি যাহা বলেন বা করান, তাহা করিতে হইবে। ইহাই নববিধানের চতুর্নীতি সাধন। ইহারই নাম—তাঁহাতে পূর্ণ বিশ্বাস, তাঁহার প্রত্যাদেশে পূর্ণ বিশ্বাস, তাঁহার বিধানে পূর্ণ বিশ্বাস, তাঁহার ভক্তেতে পূর্ণ বিশ্বাস। সহজ কথায়, তাঁহাকে দেখা, শুনা, তাঁহার মনের মত হওয়া ও কাজে কর্ম্মে তাহাই করা, ইহাই নববিধান।

নিরাকার সাকার।

ছিল হাওয়া আকার-শূন্য, যখন জলে পরিণত হইল, তখন তাহা চক্ষুর্গোচর হইল; শুধু তাই নয়, তাহা পানে তৃষ্ণা দূর হইল, স্নানে শরীর ধৌত ও শীতল হইল, প্রত্যক্ষ তাহার ফল উপলব্ধ হইল। ছিলেন ব্রহ্ম নিরাকার নাম মাত্র, হইলেন স্নেহময়ী মা, ধরিলেন চিন্ময় আকার; শুধু বিশ্বাসচক্ষুর গোচর হইলেন তাহা নয়, স্বয়ং তাঁহার প্রেমস্তন্যদানে আত্মার ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিলেন, তাঁহার উপাসনারূপ পুণ্য জলে ধৌত করিয়া সকল পাপরোগ হইতে মুক্ত করিলেন, তাঁর আনন্দশান্তিদানে স্নিগ্ধ ও শীতল করিলেন এবং তাঁর স্বরূপগত জীবনদানে ধন্য ও আনন্দময় করিলেন।

ব্রহ্মের নাম।

নাম গুণবাচক। ব্রহ্মের কোন বিশেষ নাম নাই। হিন্দু ঋষিদের নিকট তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া বলেন, "অহমস্মি"—আমি আছি। মুসাও সায়না পর্ব্বতে যখন তাঁহার অগ্নিময় প্রকাশ উপলব্ধি করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, "I Am that I am"—"'আমি আছি' আমার নাম"। তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, ইহা উপলব্ধি করিয়াই ঋষিগণ তাঁহাকে ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক জ্ঞানময় সত্তা বলিয়া নাম দিলেন। কিন্তু তিনি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, দুজ্ঞেয়, অজ্ঞেয় সত্তা মাত্র। এই নির্গুণ ব্রহ্ম অবশ্যই ব্রাহ্মদিগের ব্রহ্ম নন, ব্রহ্মকে ব্যক্তিরূপে উপলব্ধি করিয়াই মহর্ষিদেব ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার উপাসনা আরাধনা প্রবর্ত্তন করেন। ক্রমে তিনি দয়াল বা দয়াময় নামে, হরিনামে আরাধিত হন; পরে নববিধানের অভ্যুদয়ে যেমন তিনি মাতৃরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখন মা নামে আরাধিত ও পূজিত হইলেন। তাঁর নাম যাহা হউক, সাধক ভক্তগণ যখন যে ভাবে তাঁহাকে দর্শন করেন বা উপলব্ধি করেন, কিম্বা তাঁহার সহিত সম্পর্ক অনুভব করেন, সেই সেই নামেই তাঁহাকে তাঁহারা সম্বোধন করিয়া আসিয়াছেন। তাই হিন্দু সাধকগণ তাঁহার শত নাম, সহস্র নাম দিলেন; তেত্রিশ কোটি নামে তাঁহার তেত্রিশ কোটি রূপ কল্পনা করিলেন। এমনই ইহুদী, খ্রীষ্টান, মুসলমান, শাক্ত, বৈষ্ণব নিজ নিজ ভাষায় বা ভাবে, তাঁহার যেমন স্বরূপ বা গুণ উপলব্ধি করেন, তেমনই তাঁর নামকরণ করিয়া আসিয়াছেন। যেমন কোন মানুষের নাম যাহাই হউক না কেন, সে ব্যক্তিকে কেহ পিতা, কেহ ভ্রাতা, কেহ বন্ধু, কেহ সখা, কেহ অন্যান্য বিভিন্ন সম্পর্ক অনুসারে সম্বোধন করেন; তেমনি ঈশ্বরকে সকলে বিভিন্ন নামে ডাকিলেও, তিনি একজন এবং বিশ্বমানবের নিকট তাঁহার সর্ব্বনামই আদরণীয়।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী স্বর্গে।

(জন্ম—১৮৬৩, বিবাহ—১৮৭৮, পরলোকযাত্রা—১০ই নবেম্বর, ১৯৩২, প্রত্যুষ ৩॥০টা)

"জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে! হোক তব ইচ্ছা পূর্ণ, সুখ দুঃখের ভিতরে।" ইহা বই কি বলিয়া এই নিদারুণ শোক-সংবাদে আমরা সান্ত্বনা পাইব? আমরা যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই কি সংঘটিত হইল? সত্যই কি দেবপিতৃমাতৃ-শোক, স্বামিশোক, অসহনীয় পুত্রের পর পুত্রশোক ও কন্যাশোক বহন করিয়া, রোগশোকজরাজীর্ণ ভগ্নতনু বুঝি সেই কোলের পিঠের বোন্‌ "বিনয়" শোক আর অধিক দিন বহন করিতে পারিল না। এই সেদিনও যে প্রার্থনা করিলেন, "আর যেন একটু পথও চলতে পাচ্ছি না"। তাই কি হ'ল?

পিতৃমাতৃভক্তিপরায়ণা, পতিপ্রাণা সতী, ঐকান্তিক সন্তান-বৎসলা, পরমনিষ্ঠাবতী, বিশ্বাসিনী, সংবভগ্নী, নববিধান-সেবিকা ও পরিচারিকাব্রতধারিণী মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী, গত ১০ই নবেম্বর, প্রত্যুষ ৩॥০টার সময় (২৩শে কার্ত্তিক, শেষ রাত্রি ৩॥০টায়) রাঁচিতে নশ্বর দেহ রক্ষা করিয়া, অমরধামে যাত্রা করিয়াছেন। এমন করিয়া হঠাৎ তিনি যে চলিয়া যাইবেন, আমরা কখনই ভাবিতে পারি নাই। এই তিন সপ্তাহ হইল, তিনি শরীর সারিবার জন্য রাঁচি গিয়াছিলেন। তিনি অবশ্যই যাই যাই করিয়া, নিত্য ব্রহ্মানন্দ সনে, স্বামী দেব ও পুত্রকন্যাগণ সঙ্গে অমরধামে গিয়া মিলিবার জন্য কতদিন হইতেই প্রস্তুত হইতেছিলেন। আমরা সেদিনও তাঁহাকে লিখিলাম, তাঁহার এখনও অনেক কাজ যে বাকী রহিয়াছে। কিন্তু হায়! তখন আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, এখনই তাঁহার ইহজগতের কাজ ফুরাইয়া যাইবে।

আমরা কয়দিন হইল স্বপ্নে দেখিলাম, তিনি আমাদের কুটীরে আসিয়া ধূলাতেই বসিয়া পড়িলেন; কন্যাগণ আদর করিয়া আসন দিতে গেলে বলিলেন, "বাবা ত আমাকে মহারাণী করেন নাই, আমাকে ঈশ্বরের দাসী করিয়া গিয়াছেন,

আমি যে মার দাসী"। এ স্বপ্নবার্তা তাঁকে দিয়েছিলাম, কিন্তু বোধ হয় পান নাই। বাস্তবিকই ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে কোচবিহার বিবাহের পূর্ব্বে, দীক্ষাদানকালে উপদেশে বলিয়াছিলেন, "আমি রাণী চাই না, আমি চাই ঈশ্বরের দাসী"। সত্যই তিনি মহারাণী হইয়াও, আজীবন ঈশ্বরের দাসীত্ব করিতেই ভালবাসিতেন এবং তাহাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ ব্রত করিয়াছিলেন।

ভক্ত ব্রহ্মানন্দ প্রত্যক্ষ ভগবানের আদেশেই তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন; তাঁহার সেই বিবাহের আন্দোলনের ফলেই ত নববিধানের অভ্যুদয় এত উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইল। সুতরাং তাঁহাকে নববিধানের প্রেরিত রূপেই আমরা সম্মান করিতাম। প্রত্যাদেশের উচ্চভাব গ্রহণ করিতে না পারিয়া যাঁহারা আন্দোলন করেন, তাঁহারা যাহাই বলুন, "সুনীতির সহিত সুনীতি আলোক এবং পরিত্রাণ কোচবিহারে প্রবেশ করিবে" এই বিশ্বাসেই নববিধানাচার্য্য তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা সুনীতিকে শ্রীমন্মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সহিত বিবাহদানে সম্মত হন। এবং প্রথমে বাগ্‌দান অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া, দুই বৎসর পরে মহারাজা বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রকাশ্যভাবে ব্রহ্মোপাসনা করিয়া বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন।

শ্রীমন্মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ রাজধর্ম্ম নববিধান বলিয়া যে ঘোষণা করেন এবং পরিবারস্থ ছেলে মেয়েদের দীক্ষা ও বিবাহাদি অনুষ্ঠান যে নববিধান অনুসারে সম্পন্ন করেন, তাহা শ্রীমতী সুনীতি দেবীরই জীবন-প্রভাবে হয়। কোচবিহারের ব্রহ্মমন্দির, কেশবাশ্রম, বিধানপল্লী, সুনীতি একাডেমী, রেসিডেণ্ট প্রচারকনিয়োগ এবং উৎসব ও অনুষ্ঠানাদি সকলই শ্রীমতী সুনীতি দেবীর কীর্ত্তি। লক্ষ্ণৌ সংঘ এবং কলিকাতার আর্য্যনারী-সমাজ তাঁহার জীবনের সহিত চিরগ্রথিত। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের লক্ষ্ণৌয়ের নববিধান সঙ্ঘ তাঁহার অমর স্মৃতি সকলের প্রাণে চির জাগরূক রাখিবে। তিনি তাহার সভানেত্রী হইয়া, প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া, সঙ্ঘে উপস্থিত ভাইবোনদের ভিতর নবোৎসাহ ও নবপ্রেমের সঞ্চার করিয়া, নববিধানের প্রেম-পরিবার নববৃন্দাবনের একখানি প্রত্যক্ষ আদর্শ ছবি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে মণ্ডলীর মধ্যে আবার মহামিলনের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, নবপ্রাণ ও নবপ্রেরণার সঞ্চারে সকলে নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ হইল। স্থানে স্থানে মহামহোৎসবের ঝড় উঠিল; নব নব সঙ্গীতরসে, নব নব কার্য্যোদ্যমে, নব নব সেবা ও প্রচারে সকলের প্রাণ মাতিয়া উঠিল। সেই সঙ্ঘের ভাবে মণ্ডলী এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছে। সেই সময় হইতেই তাঁহার সঙ্গীতরচনা-শক্তি, পুস্তকরচনার ক্ষমতা, কথকতা ও বক্তৃতার শক্তি উজ্জ্বলতররূপে পরিস্ফুট হয়। নূতন নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়া, তাহাতে এমন ভাবরস ঢালিয়া দিতেন, এমন শব্দ ও সুর যোজনা করিতেন, গানের সঙ্গে সকলের প্রাণ সঙ্ঘের ভাবে মাতিয়া উঠিত। তাঁহার রচিত "সঙ্ঘ-সঙ্গের" গানগুলি ইহার জ্বলন্ত নিদর্শন। তিনি নববিধানমণ্ডলীকে কত আপনার ভাবে দেখিতেন। অমায়িকভাবে ছোট বড়, ধনী নির্ধন সকলের সঙ্গেই মিশিতেন। মিষ্ট মধুর আলাপে, সপ্রেম ব্যবহারে, আদর যত্ন স্নেহ মমতায় সকলকেই তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন। এমন উদার প্রাণের অভাব সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবেন।

পিতৃদেবের সাধের নবদেবালয়কে রক্ষা ও সমাধিগুলি স্থাপন তাঁহারই পুণ্য কার্য্য। আচার্য্যদেবের পুস্তকগুলির মুদ্রণ করিয়া তাহার বহুল প্রচারের জন্য কতই তাঁহার আগ্রহ। পিতৃদেবের অনেকগুলি প্রার্থনাও তিনি নিজে লিপিবদ্ধ করেন। রচনাশক্তিও তাঁহার যথেষ্টই ছিল, ইংরাজীতে অনেকগুলি বহুমূল্য পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। কি মধুর ভক্তিপূর্ণ ভাবে উপাসনাই করিতেন, তাঁহার প্রাণস্পর্শী প্রার্থনায় যোগ দিলেই পাষণ্ডেরও হৃদয় বিগলিত হইত। কি সুন্দর কথকতাই করিয়া সকলকে তিনি মোহিত করিতেন। মণ্ডলীর সেবার জন্য অকাতরে কতই অর্থদান করিয়া গিয়াছেন। পিতৃভবন কমলকুটীর ও সিমলার "তারা ভিউ" ক্রয় করিয়া, নববিধানের সাধনতীর্থরূপে রক্ষা করিবেন, বড়ই তাঁর মনের সাধ ছিল। কিন্তু অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তাহা পারেন নাই। শেষে কমলকুটীরকে ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষদিগের হস্তে দিয়া, তবু পিতৃদেবের একটী কীর্ত্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার আকস্মিক তিরোধানবার্ত্তা আকস্মিক বজ্রসম অনুভব করিতেছি। তাঁহার অভাব কে পূরণ করিবে? শোকার্ত্ত পুত্রকন্যাগণকে, রাজপরিবারবর্গকে, ভগ্নপ্রাণ ভগ্নীগণ ও ভ্রাতৃগণকে এবং কোচবিহারবাসী নরনারীগণকে, যাঁহারা তাঁহাকে দেবীমাতারূপে দর্শন করিতেন, কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব? মা শান্তিদায়িনী তাঁহার অনন্ত শান্তিক্রোড়ে তাঁর সুকন্যাকে স্থান দান করুন, এবং তিনিই সকলকে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

—•—

"ধর্ম্ম-সাধন"।

(আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের সঙ্গতের আলোচনা)

৩৭শ—৪২ সংখ্যা—২৫শে মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪।

(গিরিধির ডাঃ ভি, রায় হইতে প্রাপ্ত)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী

সঙ্গতসভার সাম্বৎসরিক উৎসব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সঙ্গতের সভ্যগণের উদ্যোগে ১৭৮৮শকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে তাঁহারা একটী উপাসনাগৃহ-নির্ম্মাণোপযোগী ধনসংগ্রহার্থ ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। এই সময় সঙ্গতসভা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং ব্রাহ্মসমাজে গাঢ়তম

অন্ধকারের রাজ্য সমাগত হয়। অবিশ্বাসীদিগের নিকট প্রতীত হইল, ব্রাহ্মসমাজ এতদিন বৃথা কোলাহল করিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইল। শত্রুগণের মহা আনন্দ হইল; কিন্তু যাঁহার বিধানে অন্ধকারের পর আলোক, তাঁহারই বিধানে ব্রাহ্মসমাজের শুভদিনের পুনরভ্যুদয় হইল। প্রচারকগণ, যাঁহাদিগের জীবনে সঙ্গতের জীবন মিশ্রিত হইয়াছিল, এই সময় দৃঢ়তা-সহকারে দয়াময় পিতার চরণতলে অনবরত অশ্রুপাত, ক্রন্দন ও হৃদয়ের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, নিরাহারে দিন রাত্রি তাঁহার করুণার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই কঠোর সাধনের ফলে ১৭৮৯ শকের ৯ই অগ্রহায়ণ স্বর্গীয় ব্রহ্মোৎসবের সৃষ্টি হইল। ১৭৯০ শকের ১ ই মাঘ মন্দিরের ভিত্তি-প্রস্তর নিখাত হইল এবং ১৭৯১ শকের ৭ই ভাদ্র, ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠার মহোৎসবে ব্রাহ্মসমাজ পুনর্জ্জীবন লাভপূর্ব্বক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সঙ্গতের প্রথম কল্পের বিবরণ উল্লিখিত হইল। ১৭৯১শকের ৯ই বৈশাখ সঙ্গতসভা রীতিমত পুনঃসংস্থাপিত হয় এবং ইহার দ্বিতীয় কল্প আরম্ভ হয়। প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার সঙ্গতের কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় চলিতে লাগিল এবং কলেজের ছাত্র ও অন্যান্য কতকগুলি নূতন ধর্ম্মার্থী ইহার সভ্য হইলেন। এই সকল সভ্যের উৎসাহ, যত্ন ও ধর্ম্মজ্ঞান-পিপাসা দেখিয়া সঙ্গতের বাল্যকাল স্মৃতিপথে পুনরুদিত হইল। এ সময়ে ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব সকলের বিষয়ে আলোচনা হইতে লাগিল। ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলে উক্ত সভ্যগণের মধ্যে অনেকে প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকগণকে লইয়া উপাসকমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইল এবং সঙ্গতসভা তাহার সহিত মিলিত হইয়া গেল। উপাসকমণ্ডলী দুইভাগে বিভক্ত হইল। এক বিভাগ ব্রহ্মমন্দিরের আয়ব্যয়ের তত্ত্বাবধান করিবেন, অন্য বিভাগ পূর্ব্বতন সঙ্গতসভার ন্যায় ধর্ম্মসাধনের সহায়তা করিবেন, এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল। উপাসকমণ্ডলী সভার প্রারম্ভে ভক্তিভাজন সভাপতি মহাশয় স্পষ্টরূপে ইহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর উপাসকগণ একটী আদর্শ ধর্ম্মপরিবার সংস্থাপন করিবেন। তাঁহারা একদিকে পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্মপথে চলিবার সহায় হইবেন, অন্যদিকে পরস্পরের পাপের নিবারক হইয়া একটী সামাজিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করিবেন; এই উদ্দেশ্যে ৮টী অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মনিয়ম নির্দ্ধারিত হইল। এই সময় হইতে সঙ্গত বিস্তৃত আকার ধারণ করিল, এবং ইহার সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সঙ্গতসভা প্রতি শুক্রবার যথাপূর্ব্ব হইতে লাগিল। মাসিক এক রবিবার কেবল উপাসকমণ্ডলীর অন্য বিভাগের অধিবেশন হইত। মতভেদ-সত্ত্বে ব্রাহ্মদের যাহাতে মিলন থাকে, সঙ্গতসভায় এই বিষয়ের অনেক উপদেশ দিয়া সভাপতি মহাশয় ইংলণ্ডে গমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে প্রথম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভাকে অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করেন। কিন্তু কিছুদিনের জন্য তিনিও মাঙ্গালোরে গমন করিলে ইহার কিছু বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই বিশৃঙ্খলা নিবারণ এবং সভ্যগণের দৃঢ়তর সম্মিলন সাধন জন্য, ১৭৯২শকের ১০ই বৈশাখ সঙ্গতের সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয় এবং গত বৎসর যত বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম পঠিত হয়।

অতঃপর সঙ্গতসভার তৃতীয় কল্প আরম্ভ হয়। তাহাতে এইরূপ কথিত হয়, সঙ্গতের প্রথম পরিচ্ছেদে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বাহ্য অনুষ্ঠান শিক্ষা হয়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ভক্তি, বিশ্বাস, ঈশ্বরের করুণা আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদের আরম্ভে আমরা দেখিলাম, যাঁহারা মঙ্গলময় পিতার এরূপ প্রতিনিধিস্বরূপ আমাদের ধর্ম্মপথে হস্তধারণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, একে একে পরিত্যাগ করিলেন। অতএব অন্তরের সহিত প্রত্যেকের প্রত্যক্ষভাবে সাধন করিতে হইবে। এই ভাবে সঙ্গতের কার্য্য কিছুকাল চলিতে লাগিল। প্রতাপ বাবু ফিরিয়া আসিয়া সঙ্গতকে নব উৎসাহে উৎসাহিত করিলেন। সেই উৎসাহ-স্রোত চলিতেছিল। পরে ভক্তিভাজন কেশববাবু ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া, ইহাতে আরো নূতন নূতন ভাব সংযোগ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিম পৃথিবীর এই দুই বিভাগের সাম্মলন করিয়া, ব্রাহ্মেরা কিরূপে আপনাদিগের জীবনের সম্যক্ উন্নতি ও ব্রাহ্মপরিবারের সম্পূর্ণতা সাধন করিতে পারেন, এই বিষয় লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল। ইহলোক পরলোক এ উভয়ের যোগ সাধন বিষয়েও সভ্যগণ মনোযোগী হইলেন। ১৭৯৩ শকের মাঘ মাসে সঙ্গতের আলোচিত বিষয় সকল হইতে কতকগুলি সাধনাঙ্গ সঙ্কলন করিয়া, ধর্ম্মসাধন নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে:—

১। আরাধনা। ২। প্রার্থনা সাধন। ৩। বিশ্বাস সাধন। ৪। নিরাশা নিবারণের উপায়। ৫। শুষ্কভাব ছাড়িয়া সরল ভাব সাধন। ৬। জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য। ৭। পাপের গুরুত্ব ও লঘুত্ব। ৮। অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। ৯। সময়ের সদ্ব্যয়। ১০। মৃত্যু ও পরকাল সাধন। ১১। স্ত্রীজাতির প্রতি কর্ত্তব্য। ১২। ভ্রাতৃভাব। ১৩। পরিবার সাধন। ১৪। আদেশ শ্রবণ। ১৫। সাম্বৎসরিক উৎসব। ১৬। ধর্ম্মসাধনের উন্নতিপ্রণালী।

এই পুস্তকখানিতে আধ্যাত্মিক সাধনের অনেক নিগূঢ় সঙ্কেত প্রকাশিত আছে।

গত বৎসরের ১১ই মাঘ হইতে এ পর্য্যন্ত সঙ্গতসভা নিয়মিত রূপে চলিতেছে। এ বৎসর প্রথমাবধি পুনরায় পরিবারসাধনের উপায় দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিবার জন্য চেষ্টা করা হয়। সঙ্গতের সভ্যগণ মধ্যে শিথিল-ভাবাপন্ন হইয়া পড়াতে, গত ১৪ই বৈশাখ সঙ্গতের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। তাহাতে সঙ্গতের সভ্যগণ বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ হন। যিনি সভ্য হইবেন, তিনি

প্রতি সভায় নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইবেন এবং মীমাংসিত কর্ত্তব্য সকল জীবনে পরিণত করিতে যথোপযুক্ত সাধন করিবেন, সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয়। সঙ্গতের আলোচিত বিষয় সকল সংরক্ষিত করিবার জন্য ধর্ম্মসাধন নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইবার ব্যবস্থা হয়। এই নূতন ব্যবস্থার পর ৪৯জন ব্রাহ্ম এ পর্য্যন্ত সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। মধ্যে সঙ্গতের সভ্যগণ দর্শক বা শ্রোতার ন্যায় আসিতেন ও চলিয়া যাইতেন, কাহাকেও ধরিয়া রাখা যাইত না; তাহাতেই সঙ্গতের বার বার উত্থান ও পতন হয়। কিন্তু এক্ষণে অনেকগুলি নিয়মিত সভ্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্মকে জীবনের ধন করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র এবং সাপ্তাহিক মিলন ব্যতীত সপ্তাহের মধ্যে সময় সময় একত্র হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাঁহাদিগের সদ্যোৎসাহ দেখিলে হৃদয়ে অনেক আশার সঞ্চার হয়। ধর্ম্মসাধন পত্র ২১শে বৈশাখ হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত ৩৬ সংখ্যা মুদ্রিত হইয়াছে। সাধারণের উপকারক হইবে বলিয়া মূল্য ৫ মাত্র এবং প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে যতদূর সাধ্য সরল ভাষায় ইহার প্রস্তাব সকল লিখিত হয়। প্রতি সংখ্যা সহস্র খণ্ড করিয়া মুদ্রিত হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা যতদূর প্রচারিত হইবার আশা করা যায়, তদ্দূর হইতেছে না। ব্রাহ্মদিগকে ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া লেখা হয় বলিয়া, সাধারণের নিকট ইহা গৃহীত হইবার তত আশা করা যায় না; কিন্তু ব্রাহ্মগণ ইহার প্রতি যদি স্নেহ প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে ইহা রক্ষা পাওয়া ভার।

ধর্ম্মসাধন পত্রে সঙ্গতসভার যে সকল আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান:—

১। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বন্ধন করিবার জন্য বিশ্বাসপরায়ণ হইয়া অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিতে হইবে।

২। প্রত্যেক মনুষ্যের সাধুভাবে ঈশ্বরের পুণ্যভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

৩। সকল মনুষ্যের উপর ঈশ্বরের সাধারণ করুণা যেমন সত্য, প্রত্যেকের উপর তাঁহার বিশেষ করুণা তেমনি সত্য।

৪। বিবেক ও ঈশ্বরের আদেশের সম্মিলন করা ব্রাহ্মের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক ও তাহাই তাঁহার শাস্ত্র।

৫। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ দ্বারা প্রকৃত বৈরাগ্য শিক্ষা করিতে হইবে।

৬। স্ত্রী-জাতিতে ঈশ্বরের প্রেম-প্রকৃতি দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার কর্ত্তব্য।

৭। ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে ব্রাহ্মপরিবারের আদর্শ চিত্রিত করিয়াছেন, বিশ্বাসপূর্ব্বক জীবনে তাহার সাধন চাই।

৮। ঈশ্বরকে পাইতে যেমন, রাখিতেও তেমনি যত্ন চাই।

৯। আমাদিগের পরিত্রাণের জন্য প্রত্যেক ভ্রাতা ভগিনীর সাহায্য আবশ্যক।

১০। ঈশ্বরে বাস করাই স্বর্গে বাস করা এবং ইহজীবনে তাহার যে প্রমাণ পাই, তাহা হইতে পর জীবনের আভাস পাই।

১১। পরলোকবাসী আত্মাদিগের সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগ আছে ও থাকা চাই, শারীরিক যোগ অসম্ভব।

১২। উন্নতির একটী সীমা নির্দ্ধারণ করা ব্রাহ্মদের পতনের মূল।

১৩। ঈশ্বরের সহিত প্রাণের যোগ সাধন সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন।

১৪। আত্মার উন্নতির জন্য আমাদিগের নিকট প্রলোভন, পরীক্ষা উপস্থিত হয়, তাহাতে ঈশ্বরের কৃপা উপলব্ধি করিতে যেন না ভুলি।

১৫। ব্রাহ্ম কোন নূতন মত প্রচার দেখিয়া ভীত নহেন। তিনি সকল মতকে আপনার আয়ত্ত করিয়া তদ্দ্বারা উপকার লাভ করিতে পারেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম এতদূর উচ্চ ও উদার ভাব শিক্ষা দেন।

১৬। উপাসনাতে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিয়া, তুমি বলিয়া প্রার্থনা না করিলে, উপাসনার ফললাভ হয় না।

১৭। ধর্ম্মসাধনের সংক্ষিপ্ত উপায় নামসাধন প্রভৃতি বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক আয়ত্ত করা আবশ্যক। বিপদ, পাপ, প্রলোভন, মৃত্যু এসকল সঙ্কট সময়ে তাহাই একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র।

এই সকল আলোচনা করিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সঙ্গতসভা যে কি, প্রথম অবস্থায় তাহার যে স্বর্গীয় আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রভাবেই ব্রাহ্মসমাজের এই উন্নত অবস্থা। মধ্য সময়ে বিশৃঙ্খল ও অনিশ্চিত বিষয় নিয়া গিয়াছে। সভ্যগণ প্রথমে স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী হইয়া পরলোকের সহিত যোগ বন্ধনের জন্য তত সচেষ্ট হয়েন নাই। তৃতীয় অবস্থায় আবার আমরা পূর্ব্বের ন্যায় হৃদয়-মিলনের ভাব কতক কতক উপলব্ধি করিতেছি এবং আবার সকলে একহৃদয় একপরিবার হইয়া, আপনাদের ধর্ম্মোন্নতি সাধন করিবার আশা হইতেছে। কিন্তু এখনও সঙ্গতের অনেক অভাব রহিয়াছে। এখন জ্ঞান ও অনুষ্ঠান অনেক পরিমাণে উন্নত হইয়াছে বটে, কিন্তু বাল্যকালের সে হৃদয়ের ভাব কৈ, যাহাতে এ উভয়কে সম্বদ্ধ করিয়া জীবনের যথার্থ হিতসাধন করিবে? সঙ্গতের ভ্রাতৃগণ পূর্ব্বের ন্যায় সরলতা, পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক প্রাণের যোগ বন্ধন করিতে না পারিলে, এ সঙ্গত কখনও চিরস্থায়ী হইবে না। যদি হয়, তদ্দ্বারা আশানুরূপ ফললাভ হইবে না। হৃদয়ের যোগ (Sympathy) এইটি সঙ্গতের পত্তনভূমি। করুণাময় ঈশ্বর করুন, এই হৃদয়ের যোগ যেন চিরকাল আমাদিগের মধ্যে বিরাজ করে এবং আমরা যেন সকলে একপ্রাণ হইয়া, সাধনার পথে পরস্পরের সাহায্য করিয়া, সেই পিতাকে লাভ করিতে সমর্থ হই। (ক্রমশঃ)

—•—

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় কি?

খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সারতত্ত্ব।

একজন ব্যবস্থাবিৎ যীশু খৃষ্টকে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন:—"গুরো, বিধিব্যবস্থা সকলের মধ্যে কোন্ আজ্ঞাটি মহৎ ও আদরণীয়?" যীশু তাহাকে উত্তর করিলেন:—"তুমি তোমার প্রভু পরমেশ্বরকে তোমার সমস্ত হৃদয়ের সহিত, সমস্ত প্রাণের সহিত, সমস্ত মনের সহিত ভালবাসিবে, ইহাই প্রথম এবং মহৎ আদেশ; এবং দ্বিতীয় আদেশও ইহারই তুল্য,—তোমার প্রতিবাসীকে নিজের মতন ভালবাসিবে। এই দুই আদেশের উপরই সমস্ত বিধিব্যবস্থা এবং প্রেরিতত্ব প্রতিষ্ঠিত"। খ্রীষ্টানদিগের দেশে প্রতি গ্রামে গির্জ্জা সকল জালের মত বিস্তৃত; তাহাতে প্রতি সপ্তাহে এই সকল সত্য জনসমাজে ঘোষিত হয়। তাহার ফলে দেখা যায়, আজ বিলাতে কোন বিলাতবাসী অনাহারে অযত্নে মরিতে পারে না। এ দেশে হিন্দু, মুসলেম যেমন নিয়ত অনাহারে মরিতেছে, কেহ তাহার খবরও লয় না, বিলাতে সেরূপ হইতে পারে না। খৃষ্টের এ উপদেশ প্রতি সপ্তাহে দেশময় নিয়ত ঘোষিত হওয়ায়, অন্ততঃ এই টুকু ফল দাঁড়াইয়াছে যে, যাহাদের জীবিকার উপযোগী কোন কার্য্য না থাকে, কি যাহারা বার্দ্ধক্য বশতঃ কার্য্য করিতে অক্ষম, সরকার হইতে তাহাদের জন্য বাঁচিবার উপযুক্ত পরিমাণ "বেকার" (Unemployment), কি বার্দ্ধক্যের ("old age") পেন্‌সন্ দেওয়া হইয়া থাকে। কোরাণে কি বেদে সেইরূপ উপদেশ থাকিলে কি হইবে? মুসলমান কোরাণ বুঝে না, তাহাতে কি আছে, কি না আছে, কিছুই জানেনা। যদিও মুসলমানের ঘরে ঘরে কোরাণখানা আছে, হিন্দুর বেদ কোন হিন্দুর ঘরে নাই; অধিকাংশ হিন্দুর জন্য, বেদ পড়িলে তাহার জিহ্বাচ্ছেদের বিধান! ইহার ফলে, হিন্দু, মুসলমান স্বপ্নেও যে সুফল ভাবিতে পারে না,—বিলাতাদি দেশে খৃষ্টানেরা, যীশু খ্রীষ্টের উপদেশের বলে, সে সুফল নিয়ত সম্ভোগ করিতেছে। বিলাতাদির গির্জ্জার মত এদেশেও জালের মত গ্রামে গ্রামে মুসলমানের মসজিদ সকল বিস্তৃত আছে বটে; কিন্তু সে সকল মসজিদে, কোরাণে কি উপদেশ আছে, তাহা মুসলমানকে বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য কোন চেষ্টা নাই; হিন্দুর ত দূরের কথা! ভূগর্ভে প্রোথিত রত্নভাণ্ডারের ন্যায় উপদেশ বেদ কোরাণেই থাকিতেছে, হিন্দু মুসলমানের কোন উপকারে আসিতেছে না।

ইসলাম ধর্ম্মের সারতত্ত্ব।

কোরাণ বলিতেছে:—

"তোমরা তোমাদের মুখ পূর্ব্বদিকে ফিরাও, কি পশ্চিমদিকে ফিরাও,—তাহাতে কোন ধর্ম্ম নাই; কিন্তু ধর্ম্ম তাহাতে, যে মানুষ পরমেশ্বরে এবং পরলোকে বিশ্বাস করে, এবং দেবলোকবাসীদিগের অস্তিত্বে, ধর্ম্মপুস্তকে এবং প্রেরিত বা অতীন্দ্রিয়দর্শীদিগের উপর বিশ্বাস করে; এবং ধর্ম্ম তাহাতে, যে পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতিবশতঃ লোকে স্বীয় ধন-সম্পত্তি বিতরণ করে,—দরিদ্র আত্মীয়দিগের মধ্যে, দীনহীনদিগের মধ্যে, নিরাশ্রয় পথিকদিগের মধ্যে, সাহায্যপ্রার্থীদিগের মধ্যে, এবং দাসদিগের বন্ধনমুক্তির উদ্দেশ্যে; এবং ধর্ম্ম তাহাতে, যে লোকে ঈশ্বরোপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে, এবং সাধারণ দরিদ্রধনভাণ্ডারে আয়ের অংশ দান করে।"

আবার কোরাণ বলিতেছে:—

"নিশ্চয় আকাশ-পৃথিবীসৃজনে এবং দিবারাত্রির নিয়ত পরিবর্ত্তনে, বুদ্ধিমানদিগের জন্য ঈশ্বরবিষয়ক উপদেশ সকল রহিয়াছে। (বুদ্ধিমান্ কাহারা?) যাহারা বসিয়া, অথবা দাঁড়াইয়া, অথবা শুইয়া পরমেশ্বরকে স্মরণ করে, এবং আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টিবিষয়ে চিন্তা করে, (এবং বলে) হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি নিরর্থক এ সকল সৃজন কর নাই, পবিত্রতা তোমারই।"

এই ত ইসলাম ধর্ম্মের সারতত্ত্ব। পূর্ব্বপ্রদর্শিত ঈশার উপদেশে বর্ণিত সারতত্ত্বের সহিত কোরাণের এই সকল উপদেশের সারতত্ত্বের তুলনা করিয়া, কে না বলিবে যে, খৃষ্টধর্ম্মের যাহা সার, তাহাই ইসলামেরও সার। তাহা কি? ১। ঈশ্বরকে প্রাণ দিয়া ভালবাস; ২। তাহারই সত্যতার প্রমাণস্বরূপ ঈশ্বরপ্রীতির দ্বারা চালিত হইয়া, মানুষকে নিজের মত ভালবাস। তাহা হইলে কি হইবে? খ্রীষ্টীয় দেশবাসীর ন্যায় বেকারবৃত্তি (Unemployment Pension), কি বৃদ্ধের বৃত্তি (old Age Pension) ভারতবাসীও ভোগ করিবে।

হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমুদ্রের মত বিস্তৃত হিন্দুশাস্ত্র সকল মন্থন করিয়া, তাহা হইতে অমৃতের ন্যায় উদ্ধার করিয়া বলিয়াছিলেন:—"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"—"ঈশ্বরে প্রীতি এবং লোকহিতাদি তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনই ঈশ্বরোপাসনা"। ইহাই বস্তুতঃ প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব। অথবা "জীবে দয়া, নামে ভক্তি, কর এই সার,"—এই সঙ্গীতের পদও প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্বও খৃষ্টধর্ম্মের ও ইসলামের সহিত একই হইতেছে। অনেক হিন্দুও তাহাই মনে করেন। যাহা হউক, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র হইতে আমরা দেখাইতেছি যে, ইহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মেরও সারতত্ত্ব।

বেদই হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ। আবার বেদ সকলের মধ্যে ঋগ্বেদই সকল বেদের সার। প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম্মের সারতত্ত্ব যেমন বাইবেল হইতে উদ্ধার করিতে হয়, প্রকৃত ইসলামধর্ম্মের সারতত্ত্ব যেমন কোরাণ হইতে গ্রহণ করিতে হয়, হিন্দুধর্ম্মের

সারতত্ত্বও সেইরূপ ঋগ্বেদ হইতেই গ্রহণ করিতে হয়। তাহা করিতে হইলেই "অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদকে" নিতান্ত পাপ জানিয়া, হিন্দুকে সর্ব্বাগ্রে তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হয়; কারণ তাহা স্পষ্টতই ঋগ্বেদ-বিরুদ্ধ। কোরাণ কি বাইবেল যেমন বলিতেছে—সমস্ত মানবজাতি এক আদম, অথবা নুহের সন্তান, ঋগ্বেদও অন্ততঃ নয়বার বলিতেছে, সমস্ত মানবজাতি এক পিতার—মনু বা নহুষের সন্তান।

১। লোক সকল মনু হইতে উৎপন্ন।

২। সকল লোকের পিতৃস্থানীয় মনু।

৩। জন্মদাতা মনু রোগনাশক এবং ভয়নিবারক, যাহা কিছু দেবগণ হইতে পাইয়া স্বীয় সন্তানদিগকে দিয়া গিয়াছেন।

৪। মহাধনশালী বিশ্বদেব বা সর্ব্বদেবময় পরমেশ্বরের ধনদানের প্রশংসা করি। আমরা নহুষসন্তান মানবমণ্ডলী, আমরা পরের মঙ্গলের জন্য আত্মত্যাগী বীর হইব; আমরা সকলে মিলিত হইয়া, সমানভাবে সর্ব্বদেবরূপী পরমেশ্বরের (বিশ্বদেব) দান সম্ভোগ করিব।

৫। আমাদের পিতা মনু যে সকল ঔষধ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এবং রুদ্র বা শোকনাশকারী পরমেশ্বরের প্রদত্ত রোগবিনাশক এবং ভয়নিবারক দান সকল কামনা করি।

৬। হে বজ্রধারী ইন্দ্র, যে সৌভাগ্যবলে আমরা দাস এবং আর্য্য উভয় শ্রেণীর নহুষসন্তান বা মানুষ, যাহারা আমাদের সহিত শত্রুতা করে, তাহাদিগকে সহজে জয় করিতে পারি, সে সৌভাগ্য আমাদিগকে দাও।

৭। হে সর্ব্বদেবরূপী পরমেশ্বর, সকলের পিতা মনু হইতে আগত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ হইতে আমাদিগকে দূরে যাইতে দিও না।

৮। সেই ইন্দ্র উপাস্যদিগের প্রধান, তিনি যজমানদিগের যজ্ঞকার্য্যে অতি সুখপ্রদ, তিনি আসিতেছেন। যাঁহাকে পাইবার দ্বারস্বরূপ সকলের পিতা মনু (ঈশ্বরমহিমার রূপকরূপে কল্পিত) দেবগণের পূজার ব্যবস্থা সকল লাভ করিয়াছিলেন।

৯। মানুষের মধ্যে যাহারা প্রজানামধারী, তাহারা অগ্নির পূজা করে; মানুষ যাহারা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত, তাহারা সকলে নহুষ হইতে উৎপন্ন।

এই সঙ্গে শুক্লযজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণের কথাও যোগ কর:—"জলপ্লাবন সমস্ত প্রজা ভাসাইয়া লইয়া গেল। পৃথিবীতে একমাত্র মনুই অবশিষ্ট রহিলেন"—ঠিক Bible যেমন নহুর জলপ্লাবন সম্বন্ধে বলিতেছে, "একমাত্র নহুই জীবিত রহিল"। (Noah alone remained alive—Genesis)

ইসলাম কি খৃষ্টধর্ম্মে যেমন অস্পৃশ্যতা বা জন্মগত পুণ্যাপুণ্য জাতিভেদের স্থান নাই, প্রকৃত ঋগ্বৈদিক হিন্দুধর্ম্মমতেও অস্পৃশ্যতা অথবা জন্মগত পুণ্যাপুণ্য জাতিভেদের কোন স্থান নাই। গীতা যেরূপ বলিয়া, "স্ত্রীলোক, বৈশ্য এবং শূদ্রকে জন্মগত অস্পৃশ্য এবং ব্রাহ্মণকে জন্মদ্বারাই পুণ্য"—জাতি সকলের মধ্যে জন্মগত পুণ্যাপুণ্য ভেদ প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মে—ঋগ্বৈদিক হিন্দুধর্ম্মে—তাহার কোন স্থান নাই। হিন্দু সমাজের বিনাশের ('Dying race') মূল কারণই অস্পৃশ্যতা এবং জন্মগত ভেদের লৌহনিগড়, ও তজ্জনিত শ্রেণীগত পরস্পর অনৈক্য ও বিচ্ছেদ। তাহাতেই আমাদিগকে পাখা কাটা পাখীর মত পতনের দিকে লইয়া যাইতেছে। ঋগ্বেদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, আজও কি আমরা খৃষ্টান মুসলমানের সঙ্গে একাত্মা হইয়া, আমাদের উন্নতির পথের কণ্টক—অস্পৃশ্যতা এবং জন্মগত ভেদ—ত্যাগ করিব না? আজিও কি আমরা পৃথিবীর অপরাপর উন্নতিশীল জাতি সকলের মত এক পরিবার হইব না? আজও কি, কেবল হিন্দুকে কেন, মুসলেম, খৃষ্টান, বৌদ্ধাদি সকলকে সকল বিষয়ে সমান অধিকারী ভাই বলিয়া গ্রহণ করিব না? ব্রাহ্মণ কেন, আজিও আচণ্ডাল সকল মানুষকে ভাই ভাই বলিয়া, "Sons of one family," মনুর পরিবার বলিয়া, সকল বিষয়ে সমান অধিকারী বলিয়া, আলিঙ্গন করিব না? বিলাতাদি দেশের মত, "Freedom, fraternity, equality," দাসত্বমুক্তি, ভ্রাতৃত্ব এবং সমান অধিকারের চিৎকার আজও কেন ব্রাহ্মণজাতির হৃদয় ভেদ করিয়া বাহির হইবে না? আজও কেন হিন্দু-মুসলমান একহৃদয় হইয়া ঘোষণা করিবে না—জাতিনির্ব্বিশেষে "নিশ্চয় ঈশ্বরবিশ্বাসীরা পরস্পর ভাই"? এই মহা-সমন্বয়মন্ত্রের সাধনাই সমস্ত মানব-জাতির দুঃখ-মুক্তির একমাত্র অমোঘ ঔষধ, প্রকৃত স্বরাজ (Democracy) লাভের একমাত্র উপায়।

হিন্দুর শাস্ত্র যেমন মানুষ মাত্রকেই মানব বা মনুসন্তান নাম দিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছে, মানুষ মাত্রেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একটি একটি মনুবিশেষ; পারস্য দেশীয় বিখ্যাত কবি 'শেখসাদি'ও তাঁহার গুলেস্তান গ্রন্থে বলিতেছেন:—"আদমের সন্তানেরা যেন একই শরীরের বিভিন্ন অংশ-মাত্র বা একে অন্যের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যেহেতু তাহারা এক মূল (জোওহর) হইতে উৎপন্ন। কালের আঘাতে যখন তাহার একটি অঙ্গ আহত বা দরদপ্রাপ্ত হয়, তখন অন্য সকল অঙ্গ নিরুপদ্রবে বা শান্তিতে থাকিতে পারে না। তুমি (কি আমি) যদি অন্যের দুঃখ সম্বন্ধে উদাসীন বা নিশ্চিন্ত থাক (বা থাকি), তবে তোমাকে (কি আমাকে) মানুষ (আদমী) নাম দেওয়া উচিত হয় না।" হিন্দুকেও বলিতে হয়, যদি তুমি (কি আমি) কোন মনুসন্তান বা মনুষ্যকে অস্পৃশ্য মনে কর (বা করি), তুমি আমিও কি ঋগ্বেদের চক্ষে মানবনামের অযোগ্য হইতেছি না?—প্রকৃত স্বরাজের (Democracy) অনধিকারী হইতেছি না?

কোরাণে কি ইঞ্জিলে যেমন ঈশ্বরপ্রীতি এবং মানবপ্রীতিকেই ইসলামধর্ম্মের কি খৃষ্টধর্ম্মের সারতত্ত্ব বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, ঋগ্বেদও সেইরূপ ঈশ্বরপ্রীতি এবং মানবপ্রীতিকে

হিন্দুধর্ম্মেরও সারতত্ত্ব বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। হায়, এমন সোণার ঋগ্বৈদিক হিন্দুধর্ম্মে, এমন উদার বিশ্বজনীন হিন্দুধর্ম্মে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিষ কিরূপে প্রবেশ করিল? এই সোণার পারিজাত, এই স্বর্গীয় পারিজাত, এই ঋগ্বৈদিক হিন্দুধর্ম্মের ভিতরে ঐ নরকের বিষকীট, অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ, কিরূপে প্রবেশ করিল? বেদের সময়েই বল, ইঞ্জিলের সময়েই বল, কি কোরাণের সময়েই বল, সর্ব্বত্রই জনসাধারণের হৃদয় দেবত্ব বা ঋষিত্ব এবং পশুত্ব উভয়ের লীলাভূমি। দেবত্ব বা ঋষিত্ব যতক্ষণ সমাজে সতেজ থাকে, ততক্ষণ পশুত্ব ম্লান থাকে, মাথা উঠাইতে পারে না, তখন সমাজে দেবত্বের এবং ঋষিত্বের অভিনয়ই দৃষ্ট হয়। আবার কালের প্রবাহে দেবত্বঋষিত্ব যখন সমাজে ম্লান হইয়া যায়, তখন পশুত্ব এবং স্বার্থান্ধতা সর্ব্বত্র প্রবল হইয়া, জনসমাজকে কেবল পশুত্বের এবং স্বার্থান্ধতারই লীলাভূমিতে পরিণত করে।

হিন্দু, খৃষ্টান, কি মুসলমান বুঝুক বা না বুঝুক, ইঞ্জিলে কি কোরাণে, যে ঈশ্বরপ্রীতি ও মানবপ্রীতিকে ধর্ম্মের সারতত্ত্ব বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহাই ঋগ্বেদোক্ত হিন্দুধর্ম্মেরও সারতত্ত্ব। ঋগ্বেদই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ। ঈশ্বরপ্রীতি এবং মানবপ্রীতিই সর্ব্বধর্ম্মের মূল সত্য—এই বিশ্বজনীন সত্য হৃদয়ঙ্গম করারই নাম সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়। তাহারই উপরে সকল ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। তাহা ঋগ্বেদে যেরূপ, কোরাণ এবং ইঞ্জিলেও সেইরূপ। কেন তবে তাহারই উপরে দাঁড়াইয়া, আমরা—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মাবলম্বী আজ এক হইব না?

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবীর

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যে ঋষিতনয় কলিকাতায় ভাগীরথীবক্ষে ভাসিয়া গিয়াছে, আজও তাহা স্মৃতিপথে জাগিতেছে! আজ এই পার্ব্বত্য প্রদেশে, সুবর্ণরেখার অববাহিকায় কোন ভস্ম ভাসিয়া গেল! আজ সেই ঋষি ব্রহ্মানন্দের প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠা কন্যা মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী এই ভূমিতে পৃথিবীর চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। ১০ই নবেম্বর, প্রত্যূষে ৩৮৩০টার সময়, তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস পড়িয়া গেল। সেই নববিধানের মহা তপস্বিনীর মহা সমাধির দ্বার উন্মুক্ত হইল। নীরব সমাধিতে সমাহিতা তপস্বিনী আর চক্ষু উন্মীলিত করিলেন না। তাঁহার সেই স্বর্গের সৌন্দর্য্যপূর্ণ মুখ হইতে পৃথিবীর ভাষা আর বাহির হইল না। সম্মুখে ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্র, দেবী মৃণালিনী, কল্যাণীয় নির্ম্মালা এবং কল্যাণীয়া আরতি, অঞ্জলি নীরবে দণ্ডায়মান; তাঁহার সেবার জন্য যাঁহারা ব্রতী ছিলেন, তাঁহারাও নীরব। সেই মহা নীরবতায় যাঁহারা আসিয়া পড়িলেন, তাঁহারাও নীরবে দণ্ডায়মান। অশ্রুজলের সঙ্গে অশ্রুজল গঙ্গার শত ধারার মত কোন্ অগাধ সলিলে মিশিয়া গেল! যে মহা তপস্বিনীর সঙ্গে কলিকাতা ও কুচবিহার ব্রহ্মমন্দিরে এবং কুচবিহার সমাধিতীর্থে আমরা মিলিত হইয়াছিলাম, আজ তাঁহার সমক্ষে আমি এবং তপস্বিনীর বাল্য জীবনের সমপাঠিনী ও স্নেহের ভগিনী দেবী সুমতিও দণ্ডায়মান। আমাদের দ্বিতীয় পুত্র বিধানপ্রসাদ, পুত্রবধূ আশাবতী, পৌত্র ও পৌত্রীদ্বয় সকলেই সজলচক্ষে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যেমন তপস্বিনীর মুখে কোন কথা নাই। তেমনই দণ্ডায়মান শত শত পুরুষ ও মহিলার মুখেও কোন শব্দ নাই! হায়! এ দৃশ্যের মধ্যে দেবী সাবিত্রীর জ্যেষ্ঠা কন্যা "সুধা" এবং জামাতাও আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্রের ব্যবস্থানুসারে আমাকে পূর্ব্বাহ্নে ও হাজারিবাগ হইতে সমাগত সমবিশ্বাসী ভ্রাতা ব্রজকুমার নিয়োগীকে অপরাহ্নে উপাসনা করিতে হইল। অনেক পুরুষ ও মহিলা সমবেত। স্থানীয় অনেক ইংরাজ পুরুষ ও মহিলা, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী এবং বিহারীও উপস্থিত। স্থানীয় ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের সেবাপরায়ণ উৎসাহী বন্ধুগণও সমাহিতার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শনের জন্য ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। ইঁহারা শ্মশানঘাটে সমাহিতা নীরব তপস্বিনীকে বহনের জন্য সেনানীর মত দণ্ডায়মান হইলেন। তপস্বিনী স্থানীয় সুবর্ণরেখার অনতিদূরস্থ বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের প্রশস্ত হোটেলে বাস করিতেছিলেন। এই স্থান হইতে এই মহাযাত্রীকে শ্মশান ঘাটে লইয়া যাওয়া হইল। হোটেল হইতে সেই শ্মশানঘাট পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক দেশীয় ও বিদেশীয় নরনারী মহাযাত্রীর অনুসরণ করিলেন। অনেক ভিখারী ও ভিখারিণীগণও সেই পথে বিতরিত টাকা পয়সা কুড়াইবার জন্য অনুসরণ করিয়াছিল। তপস্বিনীকে শ্রদ্ধা ভক্তি দিবার জন্য স্থানীয় বালক ও বালিকা বিদ্যালয় বন্ধ হওয়াতে, অনেক ছাত্র ও শিক্ষকগণও অনুসরণ করেন। যাত্রীর পশ্চাতে যেন ব্রহ্মানন্দের "নববৃন্দাবনের" দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়া ছিল! হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টীয়ান সকলেই অনুসরণ করিতেছেন। নদীর উভয় তীরেও বহুসংখ্যক দর্শকবৃন্দ দণ্ডায়মান। উভয় দিক হইতে আগত দুই স্রোতস্বতীর সঙ্গমক্ষেত্রে বিরচিত চিতাশয্যায় শায়িত মহাতপস্বিনী প্রজ্বলিত সুগন্ধি দ্রব্য সমূহের সুগন্ধপূর্ণ অনলশিখার মধ্যে তাঁহার নশ্বরদেহকে অদৃশ্য লোকে লুকাইয়া ফেলিলেন! ভাই নির্ম্মলচন্দ্র এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী তপস্বিনী ভগিনীর পূত ভস্ম লইয়া ফিরিয়া আসিলেন! সমবেত পুরুষ মহিলাগণও সেই নিরাশাপূর্ণ দৃশ্যের স্মৃতি লইয়া স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলেন।

বিধাতার বিধানে, কুচবিহার হইতে সমাগত, রাজগণবংশ-সম্ভূত

জনৈক যুবক বন্ধু চিতাশয্যায় শায়িতা নীরব মূর্ত্তির সমক্ষে "নবসংহিতা" হইতে সময়োচিত প্রার্থনা পাঠ করেন। সমস্তই লীলাময়ের লীলা!

নামকুম, পোঃ রাঁচি; শোকসন্তপ্ত সেবক
১২।১১।৩২। গৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

মিলিত উপাসনা।

(শারদীয় উৎসবে, নবমীর দিনে, সন্ধ্যায়, ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহের নিবেদনের সারাংশ)

মিলিত উপাসনার জন্য আমরা এই ব্রহ্মমন্দির বিধাতার দান রূপে পাইয়াছি। সপ্তাহে সপ্তাহে এখানে মিলিত উপাসনার স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ আমরা সম্ভোগ করিয়া থাকি। বঙ্গের এই দুর্গোৎসবের সময়, আজ সমগ্র বঙ্গ ভারতের সঙ্গে মাতৃ-উৎসবে, প্রাণে প্রাণে এই মন্দিরে মিলিত হইয়া যে আমরা মহোৎসব সম্ভোগ করিতেছি, এ সম্ভোগ আরো কত জমাট, কত গভীর, কত মিষ্ট, কত উচ্চ। এ অতি সুবর্ণ সুযোগ। এ সময় প্রাচীন হিন্দু সমাজ মন্দিরে মন্দিরে মহাত্মা গান্ধীর জীবনের উচ্ছ্বাসের ফলে, কত অস্পৃশ্যকে গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহাদের সকলের হৃদয় কি গ্রহণ করিবার জন্য তেমন প্রস্তুত? আর যাঁহারা গৃহীত হইতেছেন, তাঁহারাও কি সেই ভাবে গৃহীত হইবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত? চিন্ময়ী, অনন্তপ্রেমস্বরূপিণী, স্নেহরূপিণী পরম জননীর দিব্য অবতরণ এবং তাঁহার দিব্য স্পর্শ ও দিব্য বাণীশ্রবণ ব্যতীত প্রস্তুতি হয় না। আমাদের এই গড়া, এই ভাঙ্গা—এই নৈকট্য, এই দূরতা—এই মিলন, এই বিচ্ছেদ। স্বর্গের প্রস্তুতির ভিতর দিয়া যাহা হয়, তাহাই স্থায়ী হয়। আমরা এই উপাসনার ভিতর দিয়া, চিন্ময়ী অনন্তস্বরূপা পরমজননীর দিব্য অবতরণের মধ্যে কি দৃশ্য দেখিতে পাই? দেখি, তিনি তাঁহার স্বর্গস্থ দেবদেবী পুত্রকন্যাদিগকে যেমন আপনার অনন্ত বক্ষে স্থান দান করিয়া, কত আদরে লালনপালন করিতেছেন, রক্ষা করিতেছেন, সঞ্জীবিত করিতেছেন, তেমনই এই নিম্ন পৃথিবীর তাঁহার ছোট বড় সকল পুত্রকন্যাকে, এমন কি যাহাদিগকে সকলে অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে রাখে, তাহাদের সকলকেও, অভিন্নভাবে কেমন স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন, আপনার বক্ষে রক্ষা করিয়া সস্নেহে লালনপালন করিতেছেন। ক্ষুদ্র যাহারা, সামান্য যাহারা, তাহাদের জীবনের জন্যেই যেন তাঁহার অধিক ব্যস্ততা। আমাদের এই নগণ্য সামান্য জীবনে কি তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য লাভ করিতেছি না? এ দৃশ্য যখন প্রত্যক্ষ দর্শন করি, তখন তাঁহার প্রেমস্পর্শে আমাদের কঠিন হৃদয় বিগলিত হয়। তিনি এক পিতামাতা, তাঁহার অনন্ত বক্ষে স্পৃশ্য অস্পৃশ্য সকল সন্তান লইয়া এক অখণ্ড পরিবার; তাঁহাকে ভক্তি, সম্মান ও আদরের পূজা দিতে গিয়া, ছোট বড় সকলকে অভিন্নভাবে আমরা শ্রদ্ধাপ্রীতির সহিত গ্রহণ না করিয়াই পারি না। এই অনন্তরূপা জননীর সসন্তানে অবতরণ আমাদের মধ্যে সম্ভব হইলে, সকল দুঃখ দৈন্য, দুর্গতি ও ভেদবুদ্ধি দূরীভূত হইতে পারে। তাঁহার জীবন্ত অবতরণ আমরা কিরূপে লাভ করিতে পারি? ক্রন্দন কেবল উপায়। সন্তানের ব্যাকুল ক্রন্দন মায়ের প্রাণকে বিচলিত করে, সন্তানের জন্য ব্যস্ত করিয়া তোলে। তাই সন্তানের দুঃখ দুর্গতি দূর করিয়া, সন্তানের জীবনকে স্বর্গের শক্তি সামর্থ্যে, জ্ঞান প্রেম পুণ্য প্রভৃতি নানা ঐশ্বর্য্য দ্বারা পূর্ণ করিবার জন্য, আপনি সসন্তানে সন্তানদিগের জীবনে তিনি অবতীর্ণ হন। নব যুগে নব সাধনে, ঈশ্বরের এই মাতৃরূপের মহা অবতরণে, সকল কল্পিত মূর্ত্তিপূজা ও সকল ভেদাভেদ দেশ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবে, সন্দেহ কি? আমরা এই জীবন্ত মায়ের পূজায়, ব্যাকুল ক্রন্দন, ব্যাকুল প্রার্থনা সাধনের একমাত্র উপায়রূপে আশ্রয় করি; এবং মাতৃপূজায় মহামিলনের ধর্ম্ম নববিধান লাভ করি।

সংবাদ।

পরলোক-গমন—আমরা গভীর দুঃখের সহিত, নিম্নলিখিত পরলোকগমন-সংবাদ প্রকাশ করিতেছি:—

গত ১০ই নবেম্বর, প্রত্যূষে ৩॥০টার সময় (3-30A.M.) শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা, কুচবিহারের স্বর্গীয় শ্রীমহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সহধর্ম্মিণী, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী (C.I.) ৬৮বৎসর বয়সে, রাঁচি সহরে, বি, এন, রেলওয়ে হোটেলে, আকস্মিক ভাবে হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া, অমর ভবনে দেবদেবীদলে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে গত ১৯শে অক্টোবর, শরীর সারিবার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ মতে তিনি রাঁচি গিয়াছিলেন। ১০ই নবেম্বর, পূর্ব্বাহ্ণেই এই ভীষণ শোকবার্ত্তা তাড়িত যোগে কলিকাতা আসে। এই খবর পাইয়াই ভিক্টোরিয়া কলেজ, কেশব একাডেমী, নববিধান প্রেস বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ভিক্টোরিয়া কলেজে ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদিগকে লইয়া বিশেষ উপাসনাও হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন এবং পূজনীয়া মহারাণী দেবীর জীবন বিষয়ে কিছু বলেন; এবং কমলকুটীর ভিক্টোরিয়া কলেজের জন্য দান করিয়া তিনি যে পিতৃদেবের একটী কীর্ত্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এজন্য কৃতজ্ঞতা দান করেন। অপরাহ্নে শ্রীদরবারের বিশেষ অধিবেশনে তাঁহার জন্য এক সপ্তাহকাল শোকব্রতপালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৩ই নবেম্বর, ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনায় তাঁহার জীবনের কথা বলা হয়। ১৪ই নবেম্বর, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, উপাসকমণ্ডলীর সাধারণ সভায়, তাঁহার স্বর্গারোহণে, শোকার্ত্তহৃদয়ে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সম্পর্কে বিশেষ নির্দ্ধারণ গৃহীত হয়। ১৫ই নবেম্বর

প্রাতে ৬॥টার সময়, রাঁচি একস্‌প্রেসে মহারাণী দেবীর পবিত্র চিতাভস্ম হাওড়া ষ্টেসনে পৌঁছে। মণ্ডলীর ও ষ্টেটের অনেকে ষ্টেসনে গিয়া তৎপ্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করেন। সেখান হইতে পবিত্র ভস্মাধার উডল্যাণ্ড রাজপ্রাসাদে আনীত হইলে, রাজকীয় সম্মান সহকারে তাহা গৃহীত ও রক্ষিত হয়। সেখানেও অনেকে উপস্থিত হইয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করেন। সমবেত সকলে শোকবিহ্বলচিত্তে, শান্ত ও সমাহিত ভাবে ভস্মাধার ঘেরিয়া উপবেশন করিলে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ ও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায়ও উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬॥০ উপাসনা হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতায় তাঁহার অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনার্থ ২৭শে নবেম্বর বিশেষ উপাসনা হইবার কথা হইতেছে।

গত ১১ই নবেম্বর, ভবানীপুরে, ২৪নং রমেশচন্দ্র রোডে, কাশীপুরের স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র ২৮ বছরের উপযুক্ত গুণধর পুত্র শ্রীমান্ মনীষীকুমার টাইফয়েডে ভুগিয়া, পিতামাতা, তিনভগ্নী, বহু আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, পরম জননীর ক্রোড়ে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। পিতামাতা আশ্চর্য্য বিশ্বাস সহকারে এই শোকভার বহন করিয়াছেন দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। পিতা শান্তভাবে সন্তানের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে প্রার্থনা করিয়া, মাতৃদেবী শুভ্রফুলে পূতচরিত্র সন্তানের দেহ সজ্জিত করিয়া বিদায় দান করেন। এমন স্বর্গীয় দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায় না। শ্মশানে ভাই অক্ষয়কুমার লধ প্রার্থনা করেন।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাকে তাঁহার অনন্ত প্রেমবক্ষে স্থান দান করুন; এবং শোকার্ত্ত পরিবারে ও আত্মীয় স্বজনগণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ২৭শে অক্টোবর, ১৫।১বি প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে, ডাঃ শৈলেন্দ্রভূষণ দত্তের গৃহে, তাঁহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় ফণীন্দ্রভূষণ দত্তের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শৈলেন্দ্রবাবু প্রার্থনা করেন।

গত ২৯শে অকটোবর, কলুটোলায়, কৃষ্ণভবনে, স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ৩১শে অক্টোবর, ৭৬নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় রামেশ্বর দাসের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার উপাসনা করেন। মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত স্বপ্রকাশচন্দ্র দাস বিশেষ প্রার্থনা করেন। তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র দাস এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৪ঠা নবেম্বর, চট্টগ্রামের স্বর্গীয় রাজেশ্বর গুপ্তের সাম্বৎসরিক দিনে, ২০নং নিউপার্ক ষ্ট্রীটে, কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বিজয়শ্রী গুপ্তের গৃহে, বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন। মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত শান্তিপদ গুপ্ত পরিবারের জন্য, বিশেষভাবে শ্রীমান্ বিজয়শ্রী গুপ্তের শিশুপুত্রের জন্য কল্যাণ ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনা করেন। এই শিশু গত ৩১শে জুলাই কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করে।

গত ৬ই নবেম্বর, ৫৭নং ল্যানসডাউন রোডে, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায়ের গৃহে, তাঁহার শ্বশুর স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেনের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। স্বর্গীয় আত্মার সহধর্ম্মিণী দেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন এবং এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করেন।

পুরীর সংবাদ—গত ১৮ই অক্টোবর, সন্ধ্যায়, পুরী "নবপর্ণকুটীরে" সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় নববিধান প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটীর বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ দে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রার্থনান্তে নির্দ্ধারণ হয়, "যখন ঈশ্বরকৃপায় ও দাতাদের সাহায্যে একটি পর্ণকুটীর নির্ম্মিত হইল, তখন এখন হইতে এখানেই নিয়মিতরূপে সাপ্তাহিক সামাজিক উপাসনা ও সভার অধিবেশন হইবে; এবং আপাততঃ যতদিন পুরীতে অবস্থান করিয়া সম্পাদক প্রচারক ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক এই মণ্ডলীর সেবার কার্য্য করিবেন, তিনি ততদিন সপরিবারে এখানে বাস করিবেন ও স্থান সংকুলান হইলে অন্য প্রচারক ও প্রচারকর্ম্মিগণকেও থাকিতে দিতে পারেন।" এই কুটীরনির্ম্মাণে যাঁহারা সাহায্যদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বিশেষ ভাবে অপূর্ব্ব ট্রষ্টফণ্ডের সম্পাদক ও ট্রষ্টীমহাশয়দিগকে, মিঃ এন, সেনাপতি আই,সি,এস, ডাঃ বি, সি, ঘোষ এবং কাণপুরের ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে ও ওভারসিয়ার মিঃ অতুল রায়কে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। বি, এন, রেলের এজেণ্ট এবং কটকের ডিঃ এঞ্জিনীয়ারকেও ধন্যবাদ দেওয়া হয়। ডাঃ শচীন্দ্রনাথ বসুর স্থানান্তর গমন হেতু দুঃখ প্রকাশ করিয়া, তাঁহার সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় এবং স্থানীয় কমিটীতে প্রবীণ বন্ধু রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসু, ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, মিঃ অতুল রায় ও মিঃ রমানাথ মোদক (এম,এ,বি,এল,) মহাশয়দিগকে সভ্যরূপে গ্রহণ করা হয়।

ভ্রম-সংশোধন—সমস্তদিনব্যাপী ভাদ্রোৎসবে, মধ্যাহ্নে উপাসনা ভাই অখিলচন্দ্র রায় স্থানে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু করেন। মধ্যাহ্নে পাঠ ডাঃ অনুকূলচন্দ্র রায় স্থানে ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্র করেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ২রা অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৭ ভাগ।
২২শ সংখ্যা।

১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ সাল, ১৮৫৪ শক, ১০৩ ব্রাহ্মাব্দ।
2nd December, 1932.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

লীলাময়ি জননি! অদ্ভুত তোমার লীলা। আমরা ক্ষুদ্র মানববুদ্ধির ক্ষীণালোকে তোমার স্বর্গের অদ্ভুত লীলা খেলা কি বুঝিব? তোমার প্রিয় ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব আমাদের নিকট স্বর্গের কি আনন্দেরই উৎসব! সেই বিমল আনন্দোৎসবের সঙ্গে, মা, কেন তুমি সেই ভক্ত ব্রহ্মানন্দের প্রিয় কন্যা, আমাদের মাননীয়া অতিশ্রদ্ধার পাত্রী, কোচবিহারের মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবীকে আমাদের নিকট হইতে তোমার স্নেহবক্ষে উঠাইয়া লইয়া, তাঁহার বিচ্ছেদ-জনিত শোকের উৎসব মিশাইলে? আনন্দের জন্মোৎসব ও শোকের উৎসব এক সঙ্গে মিলাইয়া, কেমন করিয়া নববিধানের এক নূতন স্বর্গের উৎসব সম্ভোগ করিতে হয়, তাহাতো আমরা জানিনা। নববিধানে মৃত্যু নাই, নূতন জীবন। তাই মৃত্যুর উৎসব, শোকের উৎসবও নবজন্মোৎসব। তুমি জন্মোৎসব ও শোকের উৎসবকে নব জন্মোৎসবে পরিণত করিয়া, তোমার দিব্য বক্ষে ভক্ত পিতার ও ভক্ত কন্যার দিব্য জীবনের দিব্য জন্মোৎসবের অপূর্ব্ব শোভা সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া, যাঁহাদের পরলোকদৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়াছে, তোমার সেই সকল পুত্র কন্যাদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছ। আমরা পৃথিবীর লোক; এখনও পৃথিবীর অসার অনিত্য যাহা, পার্থিব ধনৈশ্বর্য্যের শোভা সৌন্দর্য্যে শোভিত যাহা, তাহার দিকে গূঢ়ভাবে আমাদের আকর্ষণ রহিয়াছে। তাই তোমার স্বর্গের নববিধানের আদর্শ জীবনের ও তোমার শ্রীহস্তে নব নব ভাবে গঠিত জীবনের জন্মোৎসবের বিমলানন্দ কিরূপে সম্ভোগ করিব? পরলোকই যদি আমাদের নিত্যকালের বাসস্থান হয় এবং তোমার বক্ষে জীবিত যাঁহারা, তাঁহারাই যদি আমাদের ইহপরলোকের যথার্থ নিত্য সঙ্গী ও সহায় হন, তবে এ সময় আমাদের অন্তরে দিব্য দৃষ্টি খুলিয়া দিয়া, একমাত্র পরলোকের দিকেই আমাদের চিত্তকে আবদ্ধ কর। তোমার বক্ষে আমাদের অতিপ্রিয় এবং পরমভক্তিভাজন আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ যেমন চিরজীবিত থাকিয়া, আমাদের নিত্য আচার্য্যরূপে, আমাদের চিরসঙ্গী ও ধর্ম্মজীবনের চিরসহায় হইয়া বাস করিতেছেন, তেমনি তোমার ভক্তকন্যাও তোমার বক্ষে চিরজীবিত থাকিয়া, নিত্য তোমাতে আরও আধ্যাত্মিক শোভা-সৌন্দর্য্যময় দিব্য জীবন লাভ করিয়া, আমাদের ধর্ম্মজীবনের নিত্য সঙ্গী ও নিত্য সহায়রূপে বাস করিতেছেন। ইহপরলোকে একই প্রেমপরিবারের পুত্র-কন্যারূপে স্বর্গের অচ্ছেদ্য গাঢ় প্রেমমিলনে [illegible]

আমরা স্থিতি করিতেছি, আমরা কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হই নাই, আমরা কোন প্রকারে অসহায় হইয়া পড়ি নাই, বাহ্য বিচ্ছেদ কিছুই নয়, এ সময় তোমার নিজ কৃপাগুণে এ দিব্য জ্ঞান আমাদের মধ্যে সঞ্চার করিয়া, আমাদের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা প্রদান কর, এবং সকল প্রকার বাহ্য ক্ষতিকে তুমি নিত্য কালের আত্মিক লাভে পরিণত করিয়া আমাদের ধন্য কর। তব পদে আমাদের এই কাতর প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

—০—

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মৌলিকতা।

নবেম্বর মাস ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসবের মাস গেল। এ সময় কেশবচন্দ্রের জীবনের কথা নানা ভাবে আলোচনা করিয়া, তাঁহার জীবনের আধ্যাত্মিক ভাব ও সাধনা আমরা আমাদের জীবনে জাগাইয়া তুলিব, এবং সেই জাগরণের ভিতর দিয়া তাঁহাকে আমরা যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব গ্রহণ করিব, আত্মস্থ করিব, এবং তাঁহার জীবনে ও তাঁহার সাধনে আমরা নব নব ভাবে জীবিত হইয়া লাভবান্ হইব, বর্ত্তমান আলোচনার ইহাই লক্ষ্য। এ প্রবন্ধে কেশবজীবনের মৌলিকতা প্রধানতঃ আমাদের আলোচনার বিষয়।

তাঁহার জীবনের ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক। কোন্ ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক নয়? প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায় বলিবেন, আমাদের ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক। স্বয়ং ঈশ্বর সার্ব্বভৌমিক। ঈশ্বর সকলেরই গ্রহণীয় বিষয়। ঈশ্বর সকলের এবং সকলেই ঈশ্বরের, এই অর্থে ঈশ্বর সার্ব্বভৌমিক; এইটাই সার্ব্বভৌমিকত্বের গোড়ার কথা। ঈশ্বর হইতে যে কোন সত্য জগতে সমাগত হয়, তাহাও তবে সার্ব্বভৌমিক; এই অর্থে হিন্দু ধর্ম্মে যাহা কিছু সত্য, মুসলমান ধর্ম্মে যাহা কিছু সত্য, খ্রীষ্ট ধর্ম্মে যাহা কিছু সত্য, সকলই সার্ব্বভৌমিক। তাই হিন্দুগণ বলেন, আমার বেদ বেদান্তের ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক; মুসলমান সম্প্রদায় বলেন, আমার কোরাণের ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক; খৃষ্ট সম্প্রদায় বলেন, আমার বাইবেলের ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক। তাঁহারা একথা বলিতে সক্ষম; কেন না, প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু ধর্ম্ম, তাহা ঈশ্বর হইতে সমাগত; অতএব তাহা জাতিবর্ণ-ধর্ম্মসম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলেরই গ্রহণীয়। কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্ম সত্য, প্রত্যেক ধর্ম্ম স্বয়ং ঈশ্বর হইতে সমাগত ও স্বর্গীয় আলোকে পূর্ণ এবং প্রত্যেক ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক, ইহা ব্রহ্মানন্দের জীবনের আধ্যাত্মিক দর্শন ও উপলব্ধির কথা। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আগমনের পূর্ব্বে একথা এ ভাবে গৃহীত হয় নাই। এখনও প্রাচীন বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় মধ্যে একথা এভাবে গৃহীত হইতেছে না।

প্রাচীন হিন্দুসম্প্রদায় এখনও বলিতেছেন, হিন্দুর বেদবেদান্তের ধর্ম্মই একমাত্র সত্য, ইহা গ্রহণীয়, ইহাতেই পরিত্রাণ, অন্য ধর্ম্মে পরিত্রাণ নাই। মুসলমানগণও বলিতেছেন, একমাত্র কোরাণের ধর্ম্মই সত্য, কোরাণের ধর্ম্মেই জীবের পরিত্রাণ, অন্য ধর্ম্মে পরিত্রাণ নাই। খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ও, বাইবেলের ধর্ম্মেই একমাত্র পরিত্রাণ, অন্য ধর্ম্ম অসত্য, অন্য ধর্ম্মে পরিত্রাণ নাই, এই বলিতেছেন। এই ভাবে প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ই আপনাদের অবলম্বিত ধর্ম্মকেই সত্য ধর্ম্ম, ঈশ্বর হইতে সমাগত ধর্ম্ম বলিতেছেন এবং তাহাই সকলের গ্রহণীয় এবং সার্ব্বভৌমিক বলিতেছেন। কতভাবে তাঁহারা তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, এবং অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মকে অসত্য বলিয়া ও তাহা সকলের গ্রহণীয় নয় ইহা ঘোষণা করিয়া, তাঁহারা আপনাদিগকে কতই কৃতার্থ মনে করিতেছেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ঈশ্বরপ্রেরণাধীন হইয়া, প্রার্থনা-যোগে যখন ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিলেন, দেখিলেন, একমাত্র ঈশ্বরই পূর্ণ এবং তাঁহার মধ্যেই পূর্ণ ধর্ম্ম বর্ত্তমান। পৃথিবীতে স্বদেশে বিদেশে বিভিন্ন মহাপুরুষের যোগে, জগতের প্রয়োজনে ইতিপূর্ব্বে যত ধর্ম্মধারা জীবের পরিত্রাণের জন্য সমাগত হইয়াছে, সকলই সেই পূর্ণ ব্রহ্ম পরাৎপর ঈশ্বর হইতে সমাগত; অতএব সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই ঈশ্বরালোকে পূর্ণ, সকল মহাপুরুষই ঈশ্বরপ্রেরিত এবং সকল মহাপুরুষের জীবনেই ঈশ্বরের স্বর্গীয় লীলা; কিন্তু কোন ধর্ম্মধারাই পূর্ণ নয়। তাই ১৮৬৬খ্রীষ্টাব্দে যখন আদিসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে নব মণ্ডলী সংস্থাপন করিলেন, তখনই তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মদর্শনের গূঢ় অনুপ্রাণনে অনুপ্রাণিত হইয়া, প্রচলিত সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই ঈশ্বরের সত্য বর্ত্তমান এবং সে সকলই গ্রহণীয়, ইহা প্রদর্শন ও প্রচার জন্য 'শ্লোকসংগ্রহ' গ্রন্থ রচনা করিলেন।

ইহা দ্বারা তিনি জগতে ঘোষণা করিলেন, সকল ধর্মশাস্ত্রই ঈশ্বরের সত্যে পূর্ণ, অতএব সকল ধর্মশাস্ত্রের সকল সত্যই সার্ব্বভৌমিক, যাহা কিছু ঈশ্বর হইতে সমাগত, সকলই প্রত্যেক জীবনের পক্ষে জাতিবর্ণ-ধর্মসম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে গ্রহণীয়। তিনি কোন এক ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মকে সত্য ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া, অন্য কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকে অসত্য বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন না; কিন্তু সকল ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মকেই সত্য ধর্ম্ম ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার জীবনের সার্ব্বভৌমিক ভাব ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের সার্ব্বভৌমিক ভাব ও ধর্ম্মের ভিন্নতা কোথায় ও কতদূর, তাহা আমরা সহজেই বুঝিলাম এবং তাঁহার জীবনের সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের মূল কোথায়, মৌলিকতা কোথায়, তাহাও বুঝিতে আমাদের বাকী রহিল না। তাঁহার জীবনের এই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম দর্শন, গ্রহণ ও সাধনা হইতেই পরবর্ত্তী সময়ে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়রূপ নববিধানের বিকাশ, প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা।

১৮৭০সনে তিনি বিলাতে বিভিন্ন ধর্মসভায়, তথাকার ধর্মমণ্ডলীর নিকট আপনার ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস কত ভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। ১৮৭০সনের ২০শে জুলাই, "থিয়িষ্টিক এসোসিয়েসন" নামে একটী প্রতিষ্ঠান গঠন উপলক্ষে তিনি যাহা বলেন, তাহা দ্বারা তাঁহার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মভাবের মৌলিকতা ও তাঁহার জীবনে বিভিন্ন ধর্ম্মসমাজের ও শাস্ত্রের আলোক গ্রহণ ও সাধনের মৌলিকতার বিশিষ্ট ভাব প্রকাশ পায়। (Lectures in England, Vol. II, Page 104.)

"Religion is essentially universal. If God is our Common Father, his truth is our common property. But the religious world may be likened to a vast market where every religious sect sells only a portion of truth. Religion is many-sided, but each individual, each nation often times adopts and represents only one side of religion."

"ধর্ম্ম মূলতঃ সার্ব্বভৌমিক। যদি ঈশ্বর আমাদের সকলের সাধারণ পিতা হন, তবে তাঁহার সত্য আমাদের সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি। কিন্তু পার্থিব ধর্ম্মজগৎকে বড় একটী ক্রয়বিক্রয়ের বাজারের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, যেখানে প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায় সত্যের একটী অংশ মাত্র বিক্রয় করেন। ধর্ম্মের বহুদিক। প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক জাতি অনেক সময়েই ধর্ম্মের একটী মাত্র দিক অবলম্বন করেন, একটী মাত্র দিক প্রকাশ ও প্রচার করেন।" ইহার কিছু পরেই বলিতেছেন :—

"If we can embrace all nations and races, if we can take in all religious scriptures, all so called sacred writings, if we are prepared to do honour to all prophets and great men of all nations and races, then certainly and not till then can we do justice to universal and absolute religion as it exists in God."

"যদি আমরা সকল জাতি ও সকল শ্রেণীর লোককে প্রেমে আলিঙ্গন করিতে পারি, যদি আমরা সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকে, সকল শ্রেণীর লোকের লিখিত পবিত্র গ্রন্থকে গ্রহণ করিতে পারি, যদি আমরা সকল জাতির, সকল শ্রেণীর লোকের ভবিষ্যদ্বক্তা মহাজন ও শ্রেষ্ঠ লোকদিগকে সম্মান করিতে প্রস্তুত হই, তবেই ঈশ্বরে সার্ব্বভৌমিক ও সত্যধর্ম্ম যেরূপে বর্ত্তমান আছে, সেই ধর্ম্মের প্রতি আমাদের ন্যায়ানুমোদিত ব্যবহার হয়, অন্যথা নহে।" তাঁহার এই উক্তিগুলি তাঁহার জীবনের সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের মৌলিকতা বিশিষ্টরূপে প্রমাণ করে এবং তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়রূপ নবধর্ম্ম নববিধানের মূল কোথায়, তাহা কাহারও বুঝিবার বাকি থাকে না।

১৮৭৫সনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সর্ব্ব প্রথমে শ্রীমৎ পরমহংস রামকৃষ্ণের দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হয়। যাঁহারা বলেন, সমন্বয়ধর্ম্মের ভাব কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, ১৮৭০সনের কেশবচন্দ্রের উল্লিখিত পরিষ্কার উক্তিগুলি সে কথার ভিত্তিহীনতার বিশিষ্ট প্রমাণ।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

পরলোক।

শ্রীব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "পরলোক ত মার এ কোল থেকে ও কোল।" এই বিশ্বাস উজ্জ্বল যাঁহাদের, তাঁহাদের পক্ষে মৃত্যু

একটা ফাঁকি বই আর কিছুই নয়। বরং মার কোলে উঠিবার সোপান বোধে, ভয় না হইয়া আনন্দই হইবার কথা।

—•—

নববিধানে ব্রাহ্মসমাজ।

গঙ্গার জল কাদা মিশ্রিত। সমুদ্রের জল স্বচ্ছ নির্ম্মল কাঁচের মত তর তর করিতেছে। কিন্তু গঙ্গাসাগরের মোহনায় অনেক দূর পর্য্যন্ত গঙ্গার কর্দ্দম-মিশ্রিত জল সমুদ্রের স্বচ্ছজলকেও ঘোলা করিয়া রাখিয়াছে। তেমনি ব্রাহ্মসমাজের গঙ্গানদী নববিধানসাগরে পরিণত হইলেও, ব্রাহ্মসমাজের জ্ঞানবিচার-সমন্বিত ভাব এখনও ইহাতে জড়িত রহিয়াছে। কিন্তু ক্রমে গভীরতর নববিধানসাগরে প্রবেশ করিলে, আর তাহাতে পার্থিব মানবীয় ভাবের লেশ থাকিবে না; সেখানে নির্ম্মল স্বচ্ছ স্বর্গীয় জলধি কেবল "ডুবিছে উঠিছে করিছে রঙ্গ নবীন নবীন রূপ ধরি।"

—

মৃত্যু শত্রু নয়, মৃত্যু ঈশ্বর-প্রেরিত সহায়।

পরব্রহ্ম পরমাত্মা বিশ্বদেহধারিরূপে বিশ্বময় বিরাজিত। তিনি জড় বিশ্বে ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া, বিশ্ব সংসারে কতই লীলা করিতেছেন। সবার সঙ্গে মেশামেশি করিতেছেন। এমন কি, নরক পরিদর্শন করিতেও তিনি বিমুখ নন; কিন্তু এত-তেও নরক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, নরকের ক্লেদ তাঁর গায় লাগে না। তাঁর আত্মজ মানুষকেও তাই জড়দেহে জন্ম দিয়াছেন, এই জন্য যে, তাঁহার আত্মজাত সন্তান তাঁহারই ন্যায় নির্লিপ্ত অপাপবিদ্ধ হইয়া তাঁহার আদর্শে সংসারের সমুদয় কর্ত্তব্য পালন করিবে ও দেখাইবে, সে কার সন্তান। কিন্তু হায়! শৈশবে শিশু আত্মা যেমন নির্লিপ্ত বিশুদ্ধস্বভাব থাকিয়া পিতৃআত্মার আদর্শ প্রদর্শন করে, পৃথিবীতে অধিকদিন থাকিলে তাহা আর পারে না; তাই আমাদের স্বর্গস্থ পিতা মৃত্যুকে পাঠাইয়া আমাদের জড়ীয় দেহ ভস্ম করিয়া, আমাদিগকে আবার তাঁর কোলে তুলিয়া লন এবং আবার যাহাতে মুক্তভাবে অমরলোকে আমরা অনন্ত জীবন তাঁহার নিজ নিকেতনে ব্রহ্মানন্দে বাস করিতে পারি, তাহার ব্যবস্থা করেন। সুতরাং মৃত্যু আমাদের শত্রু নয়, পরম সহায়।

—

মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী।

লাবণ্যের বিদ্যুল্লহরী, সৌন্দর্য্যের চির উৎস, বিজয়া দশমীর স্বর্ণ প্রতিমা কে আজ কর্ম্মনাশার জলে ভাসাইয়া দিল! মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের তপস্যালব্ধ পত্নী, ব্রহ্মানন্দ কেশব-চন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা, মণ্ডলীর মহিলাদিগের আদরের রাণী দিদি, ব্রাহ্মসমাজের বন্ধু মহারাণী সুনীতি দেবী আজ ইহলোকের অতীত! রাঁচি! তুমি কত ভাঙ্গা শরীর যোড়া দিয়াছ, কত রুগ্ন দেহকে রোগমুক্ত করিয়াছ, কত দুর্ব্বলকে বল দিয়াছ। ভগ্ন শরীরে স্বাস্থ্য লাভ করিবার জন্য মহারাণী তোমার ক্রোড়ে আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। এ কি তোমার নিষ্ঠুর পরিহাস! তাঁহার রূপ, লাবণ্য, স্বাস্থ্য, সুখ, শরীর, মন সব হরণ করিয়া, কলি-কাতায় পাঠাইলে কেবল এক মুষ্টি ধূলা, এক মুষ্টি ছাই!

কুচবিহার! আজ তুমি যা হারাইলে, তাহা ভাষার অতীত! তোমার ইতিহাসে এমন সুশিক্ষিতা, এমন প্রজাবৎসলা, এমন স্নেহশীলা মাতৃরূপের আবির্ভাব কি আর কখন হইয়াছে? কুচ-বিহার, আজ তুমি মাতৃহীন হইলে! মা বঙ্গভাষা, তোমার এক-নিষ্ঠ উপাসিকা, যিনি তোমার বক্ষকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার আলোড়িত করিয়া যেখানে যাহা রত্ন পাইলেন, তাহারই মালা গাঁথিয়া তোমাকে পরাইলেন, কত নব নব পুঁথির হার নির্ম্মাণ করিয়া তোমার শোভা সম্পাদন করিলেন, তাঁহার তিরোধানে আজ মা তুমিও শোকাতুরা! মা বঙ্গদেশ, আজ তুমি তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠা রাজ্ঞী মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবীকে হারাইয়া যথার্থই নিঃস্ব হইলে!

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ কুচবিহারে যখন রাজ্যের উন্নতিকল্পে নানা প্রকার সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিলেন—শাসনসংস্কার, সমাজ-সংস্কার, ধর্ম্মসংস্কার, স্কুল ও কলেজ স্থাপন, নারীশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অট্টালিকা-নির্ম্মাণ এবং রাজপথনির্ম্মাণ ইত্যাদি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন, তখন তাঁহার সুযোগ্যা পত্নী মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হইয়া ও তাঁহার সহকারিণী হইয়া, তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

সে সময় সকল দেশীয় রাজ্যের মধ্যে কুচবিহার একটী উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। শাসনসংস্কার সম্বন্ধে যে সকল নূতন বিধি প্রণয়ন করেন, তাহা ইংরাজশাসিত ভারত অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। মহারাণী সুনীতি দেবীর সুচিন্তা ও ঐকান্তিক চেষ্টা রাজ্যের অন্তরালে থাকিয়া কার্য্য করিয়াছে। তিনি সুন্দর সুললিত ভাষায় ইংরাজী বলিতে পারিতেন ও লিখিতে পারিতেন; ইংরাজী ভাষায় তিনি যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহা ভাষার লালিত্য ও ভাবের মাধুর্য্যের দিক দিয়া কোন ইংরাজ লেখক হইতে হীন নহে।

তিনি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ছিলেন। নরনারী-নির্ব্বিশেষে তাঁহার মধুর উপাসনায় সকলেই আকৃষ্ট হইতেন। নারীদিগের জন্য কয়েকটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। নারীজাতির উন্নতির জন্য তিনি অনেক সময়ই চিন্তা করিতেন। তিনি তাঁহার পিতৃদেবের মত, ধর্ম্মের ভিত্তির উপর শিক্ষার সফলতা নির্ভর করে, বিশ্বাস করিতেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের, বিশেষতঃ নববিধানসমাজের উন্নতির জন্য অনেক অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়াছেন। দরিদ্র প্রচারকদিগেরও অনেক সাহায্য করিতেন।

তিনি আর্য্যনারীসমাজের প্রাণ ছিলেন। নববিধানসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাকে উন্নত করিবার জন্য, মধ্যে মধ্যে নূতন নূতন অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিতেন; তন্মধ্যে লক্ষৌনগরে নববিধানসঙ্ঘের অনুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই সঙ্ঘে নববিধানমণ্ডলীর ভিতর একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং নূতন ভাবে কর্ম্ম করিবার জন্য অনেকেরই উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। তিনি এক জন সুবক্তা ছিলেন; বঙ্গভাষায় ও ইংরাজীতে যখন বক্তৃতা করিতেন, তখন বক্তব্য বিষয়টী এমন সুন্দর করিয়া লোকের সম্মুখে ধরিতেন যে, অনায়াসে সকলের বোধগম্য হইত। এ বিষয়েও তিনি তাঁহার পিতৃদেবের সদ্‌গুণ উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশে প্রাচীন যুগ হইতে কথকতা প্রচলিত ছিল। ধর্ম্ম-প্রচারকগণ লোকশিক্ষার জন্য, কোন ধর্ম্মপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া, সরল ও সহজ ভাষায় সাধারণ নরনারীকে বুঝাইয়া দিতেন। মহারাণী সুনীতি দেবী সেই প্রাচীন কথকতায় নূতন রস সংযোগ করিয়া, এমন সুললিত ভাষায় কঠিন ধর্ম্মতত্ত্ব সকল ব্যাখ্যা করিতেন যে, লোকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বসিয়া একাগ্রমনে শ্রবণ করিত। তাঁহার কথকতা-শ্রবণ একটী সম্ভোগের বস্তু ছিল।

ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউসন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়কে স্থায়ী আকার দিবার জন্য, কমল-কুটীর ও তাহার সংলগ্ন প্রশস্তভূমি বিদ্যালয়ের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টীকে তিনি কিরূপ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, এই কার্য্যের দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হয়। তাঁহার পিতৃভক্তি অতুলনীয়!

তিনি অতিশয় মিষ্টভাষী ছিলেন। নিজের পদমর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া, ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলের সঙ্গেই অতি সরল ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেন। তাঁহার মিষ্ট ব্যবহার তাঁহাকে সকলের প্রিয় করিয়াছিল।

মহারাণী সুনীতি দেবী যখন বিলাতে যান, তখন সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া জীবিত ছিলেন। তিনি মহারাণী সুনীতি দেবীকে নিজের কন্যার মত আদর করিতেন। যেরূপ সম্মানের সহিত সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে আপনার পরিবারে স্থান দিয়াছিলেন, সেরূপ সম্মান ও আদর অভ্যর্থনা ভারতের অন্য কোন দেশীয় রাজ-রাণী পেয়েছেন, শোনা যায় না। ইংলণ্ডের বহু সম্ভ্রান্ত লর্ড পরিবারের সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। ইঁহার অমায়িক ব্যবহারে তাঁহারা অতিশয় প্রীত হইতেন। মহারাণী ইংলণ্ডে অবস্থান কালে সমবিশ্বাসী বন্ধুদের লইয়া সাপ্তাহিক উপাসনা করিতেন। সে দেশে অনেকের মধ্যে ইনি নববিধানের উচ্চ আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। এখন আমাদিগের এই প্রার্থনা যে, পর-লোকে তাঁহার আত্মা নিত্য শান্তি লাভ করুন।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বর্গবাসিনী রাণীদিদি।

এ জগতে পিতৃপ্রদত্ত স্বকার্য্য সাধন করে, আজ রাণীদিদি দিব্যধামে মহারাজা পতি নৃপেন্দ্র সনে নিত্য সুখে বাস করতে চলে গেলেন।

কত দিন পূর্ব্বে, মাতৃদেবী জগন্মোহিনী দেবীর তিরোধানের পর বৎসর, মাঘোৎসবের সময় আর্য্যনারীদিগের সাম্বৎসরিক উৎসবদিনে, স্নেহে প্রেমে পূর্ণ এই রাণীদিদির ব্রহ্মারাধনাতে প্রথম যে দিন প্রাণ-যোগে আরাধনা করলাম, আশ্চর্য্য পুলকে পরম ঈশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিত হলাম, প্রাণ মন মোহিত হইল। মনে আছে, যেমন ভাষার জ্ঞানভরা লালিত্য, তেমনি ভাবের মধুরতা ও ব্রহ্মানুরাগ। স্বর্গের পাখী এসেছিলেন নববিধানে লীলাময়ের নবলীলার গান গাইতে। ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবের বড় আদরের প্রথমা কন্যা, কোচবিহাররাজ্যেশ্বরী সুনীতি দেবী অনেক বিষয়ে পিতৃগুণে বিভূষিতা ছিলেন। পিতার ভাব যে মুখে বিকসিত, দেখা যাইত।

রাণীদিদি নিজে বলিয়াছিলেন, শৈশব কালে সহোদরা সহ বেথুন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। তৎপর ভারতাশ্রম স্থাপন হইলে, সেখানেও পড়ে থাকবেন। বিবাহের পরও আর কিছুদিন একটী মেম এবং স্বর্গীয়া মোহিনী দেবীর নিকট পড়িয়াছিলেন; কিন্তু বিদ্যালয়ে বা কাহারও নিকট বেশী দিন পাঠাদি তিনি করেন নি। শিক্ষা যাকে বলে, তা আপনার ভিতর হইতেই রাণীদিদি পাইয়াছিলেন, নিজ জীবনী তিনি স্বহস্তে লিখে গিয়েছেন। তাঁর গানগুলি সুমিষ্ট এবং ধর্ম্মভাবপূর্ণ।

শ্রীআচার্য্যদেবের সঙ্গে ভারতাশ্রমেই বেশী থাকতে ভালবাস-তেন, ধর্ম্মপরিবারে মিলে বৈরাগ্যের অন্ন খেতেন, সকলের সঙ্গে মিশতেন ও সকলকে ভালবাসতেন। সকলের সঙ্গে মিশিবার রাণী দিদির আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। ভাই বোন, পুত্র কন্যা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশী সকলকে কতই স্নেহের চক্ষে দেখতেন। দাস দাসী, পরিচারক পরিচারিকা কত তাঁর ছিল, বলা যায় না। কাহারও অন্যায় দেখিয়া মুখের ওপর বলিতে জানেনি; বরং দুঃখিতচিত্তে অন্যের নিকট কখনও কখনও বলিয়াছেন। কোন দরিদ্র আত্মীয় বা ধর্ম্মবন্ধু কাহাকেও যদি কাছে রাখিতেন, বা কাজে নিযুক্ত করতেন, কোন প্রকারে দরিদ্র বলে তাঁদের মনে কষ্ট দিতেন না। সমভাবে সকলকে দেখতেন এবং যথাযোগ্য আদর সম্মান প্রদান করতেন। একটী হীনতম গরিব সেবককেও চিরদিন স্মরণে রাখতেন। দান তাঁর জীবনের একটী প্রধান ব্রত ছিল। কাহাকেও ভুলে যেতেন না। বহুবার তাঁর সঙ্গে বাস করে উপাসনা করে, প্রচারে গিয়া উষা-কীর্ত্তনে বেড়িয়ে, কাছে থেকে, তীর্থে গমন করে, রাণীদিদির ব্যবহার দেখে অত্যাশ্চর্য্য হতাম; আর সর্ব্বদাই ভাবতাম, এত বড় রাজ্যের রাজমহিষী হবার উপযুক্ত না হলে কি সেই পদ লাভ

কেহ করতে পারে? তিনি পরম মনীষাসম্পন্না ও জ্ঞানময়ী দেবী ছিলেন। প্রতি বাক্যের ভেতরে জ্ঞান প্রকাশ পাইত।

রাণীদিদির রূপ ও সৌন্দর্য্যের কথা বলে শেষ করা যায় না। অমন শোভা কেহ আর কোথাও দেখেছে, মনে হয় না। তাঁর কমলাননে স্বর্গের অপূর্ব্ব জ্যোতি ব্যতীত আর কিছু দেখি নি। অমন মিষ্ট ভাষায় কথা কইতে কাহাকেও শুনেনি। যৌবনের প্রাক্কালে, যেদিন তাঁর বড় ভ্রাতৃবধূর বৌভাতের সমারোহ আয়োজন Miss Pigot তাঁর বৌবাজারের মেয়েদের বিদ্যালয়গৃহে করেছিলেন, সেই সন্ধ্যায় প্রিয় রাণীদিদি একখানি সবুজ রংয়ের সোণার আঁচল বেনারসী শাড়ী পরে, হাস্যমুখে সকলের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। কি মহিমাময় সৌন্দর্য্যই প্রকাশ পাচ্ছিল! সেই বালিকা বয়সের কথা আজিও উজ্জ্বল অক্ষরে হৃদয়ে মুদ্রিত রহিয়াছে। চির দিন লক্ষ্য করে দেখেছি, এঁদের পরিবারে কস্মিন্‌কালে সাজ সজ্জার আড়ম্বর বা আধিক্য ছিল না, একেবারেই না। বৈরাগ্য-প্রাধান্য এ পরিবারকে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পূর্ণ করেছিল। তারই জন্যেই সেই কমনীয় শোভা দেখে মুগ্ধ হতে হত। সিমলা শৈলে Kenedy House এ যখন রাণীদিদি ছিলেন, মহারাজা তখন বিলেতে। একদিন বাংলা সাজে, বাংলা খাওয়ার জন্য বড়লাটপত্নী Lady Kurzenকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। দামী বেনারসী শাড়ী ও সহস্র মুদ্রার একখানি গহনা পরিয়ে, নিজের পাশে ভূম্যাসনে বসিয়ে খাইয়েছিলেন। যদিও সেই সময়ে Lady Kurzen সুন্দরী রমণী মধ্যে গণ্য হতেন, কিন্তু সেদিন দুগাছি হীরার মোটা বালা মাত্র হাতে পরে, আমাদের রাণীদিদিকে যে কত ভাল দেখাচ্ছিল, আজও গাঢ়ভাবে তা মনে অঙ্কিত রয়েছে। শ্রীমৎ আচার্য্যদেব যে আনন্দবাজারের ছবি প্রকাশ করে বলে গিয়েছিলেন, সেই মহামিলনের ন্যায়নিষ্ঠ খাঁটি সত্য আনন্দবাজারে যখন ক্রয়বিক্রয় আরম্ভ হয়েছিল, রাণীদিদির সুন্দর মহার্ঘ ও পবিত্র পূজা হত্যাদির সামগ্রী দিয়ে সাজান stall থাকত। কত দেশ বিদেশের খাঁটি মাল সেখানে আসত। সেই দোকানের দিকে গাড়ী গাড়ী সব মেয়েরা এসে ঝুঁকে পড়ত এবং কেবল বলত, মহারাণী কোনটী গা? সেই আনন্দময়ী দেবী মূর্ত্তিখানি সবাই খুঁজে বেড়াত। তাঁর এখনও সেই আনন্দবাজারের হাসি মুখখানি সুস্পষ্ট চক্ষের সম্মুখে ভাসছে। অনেকে বলেছে, কুচ-বিহারের মহারাণীকেই দেখতে এখানে এসেছি, কত দূর দূরান্তর থেকে এই আনন্দবাজারে। রাণীদর্শন কি সহজ কথা? কত ভাগ্যে রাজা রাণী দেখা ঘটে। নৃপেন্দ্রনারায়ণ রাণীদিদির ছবি দেখেই তো বলেছিলেন, এঁকে ছাড়া আর কাহাকেও বিয়ে করব না। শুনেছি, রাজমাতা প্রভৃতি পুরজনেরা একটু অমত করাতে, মহারাজা আগুন দিয়ে রাজপ্রাসাদ পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। মহারাজার অতি অল্পই তখন বয়স ছিল। নববিধাননিশান-বরণে প্রিয় রাণীদিদির মুখের স্বর্গীয় লাবণ্য, যতদিন চন্দ্র সূর্য্য গগনে উদিত হবে, কেহ ততদিন বিস্মৃত হবে না। এ জগতের ইতিহাসে মহারাণী সুনীতি দেবীর সৌন্দর্য্য লেখা থাকবে।

রাণীদিদি আদর্শ নারী ছিলেন। রাজা-সম্বন্ধেও মহারাজা মহিষীর পরামর্শ নিতেন। ধর্ম্মবিষয়ে এমন মহীয়সী মহারাণী সহ একমত হয়ে, নববিধান ব্রহ্মমন্দির স্থাপন করা শুধু নয়, স্বয়ং উপস্থিত থেকে উপাসনায় যোগ দিতেন এবং রাজকুমারদের দীক্ষাও নবসংহিতামতে দিয়েছিলেন। প্রথমা কন্যার বিবাহ নব-সংহিতা অনুসারে দিয়েছিলেন। মহারাজার ইচ্ছা মত ভাই প্রতাপচন্দ্র আচার্য্যের ও ভাই বঙ্গচন্দ্র পুরোহিতের কাজ করেছিলেন। ভাই ত্রৈলোক্যনাথের নূতন সঙ্গীত শ্রীমনোমতধন গাহিলে, মহারাজা কন্যা সম্প্রদান করলেন। এমন সভা জগতে হতে পারে, পূর্ব্বে আর জানতাম না। মহাভারতে যুধিষ্ঠির মহারাজার সভা এবং ইন্দ্রসভা ইত্যাদি কয়েকটি নাম শুনেছি; মনে হল, পৃথিবীতে আজ তাহাই বুঝি উদয় হল। নব-বিধানপ্রচারের জন্য রাজ্যে বহুল অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। মহারাজা একবার কুচবিহারে নববৃন্দাবনের অভিনয় করাইয়া, সকলকে বড়ই পরিতৃপ্তি দান করেন। আহারাদির ব্যবস্থা পর্য্যন্ত নিজে লইয়া ছিলেন। নৃপেন্দ্রনারায়ণের ন্যায় মহদ্‌গুণাবলিসম্পন্ন মহারাজা কচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়।

রাণীদিদিকে এই পৃথিবীতে অনেক পরীক্ষা এবং শোক পাইতে হয়েছিল। কুচবিহার এই মহারাণীকে লাভ করে, ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করেছিল। কারণ ইতিপূর্ব্বে ৮০জন রাণীর ভিতর মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ একমাত্র পুত্র জন্মেছিলেন। রাণীদিদি চার পুত্র ও তিন কন্যার মাতা ছিলেন। ক্রমে হৃদয়ের প্রিয়তম স্বামী, উপযুক্ত তিনটী পুত্র ও একটী কন্যাকে হারাইয়াও, যে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখিয়ে, হাস্যমুখে শেষ জীবন কাটিয়ে চলে গেলেন, তা সংসারে বিরল।

রাণীদিদির সদ্‌গুণাবলী অফুরন্ত বলে মনে হয়। লক্ষ্ণৌতে যে সঙ্ঘ হয়, তাতে তাহ বোন নিয়ে সকলকে উৎসবে মাতিয়ে ছিলেন, ভারতে তাহা একটা স্বর্গীয় ব্যাপার হয়েছিল। সঙ্ঘের অনেক নূতন গান রাণীদিদি করেছিলেন। পিতার উপযুক্ত কন্যা হয়ে, সকল কাজ সুসম্পন্ন করে, সেই সুরপুরে আজ মিলেছেন। চিরদিন নববিধানকে পূর্ণ মাত্রায় সমাজে, মণ্ডলীতে, রাজ্যে ও পরিবারে এবং নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে আপনাকে উৎসর্গ করেছিলেন। মাঘোৎসব, ভাদ্রোৎসব, ভক্ত ব্রহ্মানন্দ ও মাতৃদেবী জগন্মোহিনী, দেবী মোহিনী প্রভৃতি সকলের জন্মোৎসব, শ্রীদরবারের প্রেরিতমণ্ডলী, আর্য্যনারীসভা, সঙ্গতসভা কিছুই বিস্মৃত হন নি। পিতার প্রিয় ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং তৎসংক্রান্ত বিদ্যালয় কখনও ভোলেন নি। শ্রীআচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের পর আরও কিছুকাল এই বালিকাবিদ্যালয় প্রভৃতি অর্থাভাবে বন্ধ

ছিল। কিয়ৎ দিবসানন্তর রাণীদিদি সে সকলের পুনঃ সংস্থাপন করেন এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। শুধু তাহাই নহে, মাঝে মাঝে কোন কোন দিন বা শিশু কুমার রাজরাজেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতেন, নিজেও কিছু শেখাতেন। রাণী দিদির ইচ্ছায় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ একদিন পরীক্ষা লইয়া, তৎক্ষণাৎ প্রথমশ্রেণীর মেয়েদের একটী একটী দ্রব্য পারিতোষিকও দিলেন, যাহা আমার নিকট আজিও মহারাজা নৃপেন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই সময়ে রাণীদিদির নামে গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং এবং তাঁহার উচ্চ কর্ম্মচারিগণ বিদ্যালয় পরিদর্শন বা পারিতোষিক বিতরণ করিতে আসিতেন এবং রাজা মহারাজার তো গণনাই হয় না। কমলকুটীর এই বিদ্যালয়ে দান করিয়া রাণীদিদি চিরদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

নববিধান Mission Fund এ বরাবর নিয়ম করে বহুল অর্থ সাহায্য করেছেন। মাঝে মাঝে হাসপাতালে রোগীদের জন্য কত ডালা মিষ্টি ও উপাদেয় খাবার সামগ্রী পাঠিয়ে দিতেন। ফলগুলি কেটে ধুয়ে সাজিয়ে খাবার উপযোগী করে পাঠান হত। অনেকে নিয়ে গিয়ে তাদের খাইয়ে আসতেন। কত ভাবে কত লোককে যে সাহায্য করতেন, তার গণনাই ছিল না। দরিদ্র, ভৃত্য, অনাথ, বিধবা, গরীব, ফকীর, কাঁণা, অন্ধ কেহ নিরাশ হয়ে ফিরত না। এইটী অত্যাশ্চর্য্য যে, এতবড় মহারাণী হইয়াও কখনও কাহাকেও ভুলিতেন না। তাঁর প্রাণের প্রিয় নববিধানের ঘোষণার দিন কত ঘটা করে মহাসভা করেছিলেন। সেখানে সহস্র লোক মিলে নববিধানের জয় গান করতেন। খুব ভাল সামগ্রী পরিবেশন করেছিলেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে আরও কত যে করতেন। তাই ভাবছি, তাঁর স্থান কে আর পূর্ণ করবে? তেমন করে কে আর নববিধানকল্পতরু সাজাবেন? রাণী হওয়ার পরে প্রথম প্রথম মণ্ডলীস্থ সকলকে এবং ব্রাহ্ম-হিন্দু-নির্ব্বিশেষে সব সমাজকে কোন কোন অনুষ্ঠানে, Woodlands রাজপ্রাসাদে অথবা কমলকুটীরে ভূরি ভোজনে তৃপ্তি দান করতেন। আদরের ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ের মেয়েদের কত জায়গায় বেড়াতে, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি দেখাতে নিয়ে যেতেন। একবার নিজ রাজপ্রাসাদে খুব খাইয়েছিলেন। রাণীদিদি মণ্ডলী ও সমাজের অভাব বুঝে একটি সমাধি উদ্যান স্থাপন জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। সে উন্নত উদার মহজ্জীবনের কিছুই বলিবার ক্ষমতা আমার মতন অধম জনের নাই। যে টুকু পারলাম বল্লাম। আশা করি, পাঠকগণ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

শেষ দেখা ব্রহ্মমন্দিরে হল। তাঁর মুখবাণী-নিঃসৃত কি সুধার ধারা সম্ভোগ করলাম শেষের দিনটীতে। আর যে দেখা হবে না ভবধামে, তা কি জানি। এই উপাসনায়, গানে, সংকীর্ত্তনে, শান্তিবাচনে যে শঙ্খ রাণীদিদি প্রথম বাজিয়ে ছিলেন, শেষ দিন মন্দিরে বসে তাঁর সেই মধুর শঙ্খনিনাদে সকলকে শান্তি দিয়ে গেলেন। পূজনীয়া প্রিয়তমা রাণীদিদি অনন্ত রাজাধিরাজের চরণে নিবিড় সুখে নৃপেন্দ্রনারায়ণ সনে বসতি করুন।

শোকাকুলা সেবিকা

হেমলতা।

শ্রদ্ধাঞ্জলি।

(২৭শে নবেম্বর, মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবীর শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

দেবি! তুমি না কি নাই? তুমি না কি না বলে, কাউকে না জানতে দিযে, চুপি চুপি চলে গেছ? তুমি না কি আর আসবে না? আর সুমিষ্ট হাসি হাসবে না? সাদরে, সহানুভূতি ভরা প্রশ্নে দুঃখীর দুঃখ, ব্যথিতের ব্যথা হরণ করবে না? অগ্নিগর্ভ গিরির মত নিদারুণ শোকবিপ্লব বুকে ঢেকে রেখে, হৃদয়স্পর্শী অগ্নিময়ী উপাসনা করে পাষাণ বিগলিত করবে না? হায়! সব—সবই কি দূরে—সুদূরে সুবর্ণরেখা-তীরে—সর্ব্বভুক্ অগ্নি গ্রাস করেছে?

না—না; এ:ত হতেই পারে না। মন ত একথা মানতেই পারে না। তুমি আছ বই কি! ধর্ম্মমন্দিরে, ইতিহাসে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, উপাসনায়, কথকতায়, মনোরম গল্পে, সমাজ-সংস্কারে, নানারূপ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে তোমার ও উদার গম্ভীর স্বর ধ্বনিত হয়ে যে শতরূপে তোমার অস্তিত্ব প্রমাণ করছে! "সুনীতির ধ্রুবের হার-অন্বেষণ" যে শত শত আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে শোকের তরঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে "হরি অন্বেষণ" করে দিয়েছে! ভীষণ নরকাবর্ত্তের নারকীরা, হরিনামের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যে, পূতগন্ধময় নরক থেকে বৈকুণ্ঠে গিয়েছে; তা যে জানিয়ে দিয়েছে! বড় স্নেহের ছোট বোন "বিন"র অভাবময়ী স্মৃতিমাখা পবিত্র শোকাশ্রু যে কত ভাই ভগ্নীর প্রাণে শোকের ঝরণা বইয়ে দিয়েছে!

রাজ-ঐশ্বর্য্যের মাঝখানে এক সর্ব্বংসহা বসুন্ধরার মত সন্ন্যাসিনী বাস করতো, তার কত প্রমাণই তোমার জীবনে দেখিয়েছ! সুখ, ঐশ্বর্য্য, আড়ম্বর অনেক উপকরণই ত ছিল; তবু?—তবু অন্তরের অন্তরে এ কোন সন্ন্যাসিনী লুকিয়ে লুকিয়ে বাস করতো গো? তাই কি সেই মহাব্রত উদ্যাপনের সময়, নীরবে, আড়ম্বরশূন্য ভাবে, তোমার বৈরাগ্যব্রতের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেলে?

আজ এই পবিত্র সুগম্ভীর শোকবাসরে আমাদের চিরপূজ্যা, ভক্তিভাজনীয়া ব্রহ্মানন্দনন্দিনি! সন্ন্যাসিনি! রাজনৃপেন্দ্রাণি! তুমি দাঁড়াও। তোমার ঐ রাজরাণীর অন্তরালে, এক মহাতপস্বিনী জগতের হিতার্থে সর্ব্বদাই উৎসুক থেকে বিশাল কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, দেখে আমরা ধন্য হই! শোক, জরা,ব্যাধি সব পশ্চাতে ফেলে রেখে, শুধু বিধাতার নিশানবহনে চির অগ্রণী দেবি! চিরদিন তোমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত "দাস দাসী, ঈশ্বরের দাসীর" ব্রত পালন করে যে মহান্ আদর্শ ও পথ আমাদের জন্য রেখে

গেছ, তুমি সতীলোক হ'তে আশীর্ব্বাদ কর, যেন সে আদর্শ ও পথ হতে আমরা কখনও বিচ্যুত না হই।

বিশ্বরাজ, তোমার ধন তুমি নিয়েছ। ক্ষুদ্র কীটাণুকীট আমরা, তোমার বিধানের উপর কি বলবো? শুধু কাতর অন্তরে প্রার্থনা করি, যেন তোমার এই সুসন্তানের ধর্ম্মকর্ম্মময় সন্ন্যাসজীবনের অধিকারী হই; এবং তাঁরি মত সকল অবস্থায় "হরের্নামৈব কেবলম্" এই মহামন্ত্র সম্বল করে, ভবসাগর উত্তীর্ণ হই!

Mrs. Kali Nath Ghosh.

পূর্ব্ববাঙ্গলা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের দ্বাপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২৮শে ভাদ্র, মঙ্গলবার, সমাজ-সংস্থাপনের এবং মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিনে, পূর্ব্বাহ্নে ৯টাতে মন্দিরে উপাসনা হয়। ভাই মহিমচন্দ্র সেন উপাসনা করেন এবং বেদী হইতে যে উপদেশ হয়, তাহাতে মন্দিরনির্ম্মাণে যাঁহারা বিশেষ ভাবে আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য প্রকার সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম ধরিয়া স্মরণপূর্ব্বক, কৃতজ্ঞতা প্রদান করা হয়। সায়ংকালে নববিধানের প্রেরিতদিগকে স্মরণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। এ বেলার কার্য্যভার বিশেষ ভাবে শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার দাস এম,এ, মহোদয়ের উপরে ন্যস্ত থাকে। তিনি বলেন, "উৎসবারম্ভে 'নবলীলা' বিষয়ে যে বক্তৃতা হইয়াছে, তাহাতে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধে যথেষ্ট বলা হইয়াছে; সুতরাং আমি অদ্য অন্যান্য প্রেরিত-দের সম্বন্ধেই বিশেষভাবে কিছু কিছু বলিব।" এই বলিয়া তিনি প্রেরিতপ্রবর প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলেন এবং তৎপর সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, অমৃতলাল বসু, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, উমানাথ গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ বসু, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, কান্তিচন্দ্র মিত্র, গিরিশচন্দ্র সেন, দীননাথ মজুমদার, বঙ্গচন্দ্র রায়, কালীশঙ্কর দাস কবিরাজের সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইল, আরও কোন কোন বন্ধু কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। বৃক্ষের যেরূপ কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা পত্র পুষ্প প্রভৃতি বিনা বৃক্ষত্ব হয় না এবং তাহার শোভাও দেখা যায় না, তদ্রূপ নববিধান আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্য প্রেরিতগণ, প্রচারকগণ, গৃহস্থ প্রচারকগণ এবং সাধকগণের জীবনের সমষ্টি মাত্র। একজনকেও বাদ দিলে নববিধানের পূর্ণতা থাকে না।

২৯শে ভাদ্র, বুধবার, সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে বক্তৃতা হয় বক্তৃতার বিষয় ছিল "ঈশ্বরের অবতরণ"। প্রথমতঃ ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বক্তৃতার বিষয় অবতারণা করিয়া নাতিদীর্ঘ একটী বক্তৃতা করেন। তৎপর ভাই মহিমচন্দ্র বলেন:—এদেশে (ভারতবর্ষে) অনেকে প্রাথমিক উপাসনা জন্য জগৎ ঈশ্বরের মূর্ত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে জগৎ ঈশ্বরের মূর্ত্তি নহে, ইহা তাঁহার অবতরণ বা প্রকাশস্থান। জগৎ না থাকিলে, মনুষ্যসন্তানও থাকিত না, সুতরাং ঈশ্বরের স্থিতি ও কার্য্য সম্বন্ধেও কোন জ্ঞান, কাহারও পাইবার সম্ভাবনা হইত না।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানি চ"

এই বৈদিক বাক্যের প্রথমাংশ গ্রহণ করিয়া অনেকে মনে করেন, সমুদয়ই ব্রহ্ম; কিন্তু ইহার শেষাংশের অর্থ পরিগ্রহ করিলে, আর ভ্রম থাকে না। শেষাংশ "তজ্জলানি চ" অর্থাৎ সমুদয় যে ব্রহ্ম, তাহার এই অর্থ—সমুদায় তজ্জ, তল্ল, তদন্। তজ্জ অর্থ সমুদায় ব্রহ্ম হইতে জাত অর্থাৎ উৎপন্ন; তল্ল অর্থাৎ সমুদায় ব্রহ্মে লীন; তদন্ অর্থাৎ সমুদায় ব্রহ্মের ক্রিয়া। এই ক্রিয়া অর্থাৎ লীলা দর্শনে চিরকাল ভক্তগণ ব্রহ্মের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। ইহাই ব্রহ্মাবতরণ।

জগতে ব্রহ্মের অবতরণস্বীকার আমরা ব্রহ্মোপাসনার আরম্ভ হইতেই দেখিতে পাই। আমাদের ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন বলিলেন, উপাসনাকালে, উপাসক ব্রহ্মকে সম্মুখে জানিবেন এবং 'আছেন বিভু তোমা হইতে তোমার নিকটে,' এইরূপে তাঁহাকে দেখিবেন। তিনি ব্রহ্মের অবতরণ দর্শন করিয়া বলিলেন—"ভাব সেই একে, জলে স্থলে যে সমান ভাবে থাকে।" আদিসমাজের উপাসনার উদ্বোধনেই ব্রহ্মাবতরণ স্বীকার করা হইয়াছে। যথা:—"যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, আমরা সেই দেবতাকে নমস্কার করি।" মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়ের একটী সঙ্গীতেও ব্রহ্মের অবতরণ সম্বন্ধে এই সকল কথা পাওয়া যায়, যথা:—"উচ্চে নীচে, দেশ দেশান্তে, জলগর্ভে কি আকাশে; অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।" ইত্যাদি। বস্তুতঃ ব্রহ্মদর্শন ভিন্ন ব্রহ্মোপাসনা হয় না, হইতে পারে না। এজন্য চীনদেশীয় শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "বিশ্বস্ততা ও সারল্য, এই দুইটীকে সর্ব্বপ্রথম তত্ত্বরূপে গ্রহণ করিবে।" হিন্দু শাস্ত্রেও আছে, "আদৌ শ্রদ্ধা"। খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে মহর্ষি ঈশার বাক্যে আছে—"Faith is one thing needful" অর্থাৎ বিশ্বাসই একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ এই পূর্ব্ববঙ্গের বক্ষে বসিয়া,—(নৌকাতে ফরিদপুরের নিকট) True Faith নামক পুস্তক লিখিলেন, তাহাতে তিনি বলিলেন, —"বিশ্বাস ঈশ্বর এবং আত্মার (জীবাত্মার) অমরত্ব দর্শন করে।" এই যে ঈশ্বরদর্শনের কথা তিনি বলিলেন, এ ঈশ্বরের অবতরণ দর্শন। সর্ব্বাতীত ব্রহ্মকে কেহ জানে না, সর্ব্বগত পরমাত্মাকেও কেহ ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে না; কিন্তু সর্ব্বান্তর্ভাবক ভগবান্ স্বপ্রকাশরূপে বিশ্বাসীর দর্শনীয় বস্তু। স্রষ্টা ব্রহ্ম যে সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে অনুপ্রকাশিত করিয়া রহিয়াছেন, বিশ্বাসী তাহা দেখিয়া মোহিত হন। ব্রহ্মের

অবতরণ ত্রিবিধ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। (১) বাহ্যজগতে সৃষ্টির মধ্যে। (২)* লোকোত্তর পুরুষে অর্থাৎ সাধুমহাজনদিগের জীবন ও চরিত্রে। (৩) প্রতি মানবের স্বীয় হৃদয়ে। এই যে স্বীয় হৃদয়ে ব্রহ্মদর্শন, ইহাই অপরোক্ষ ব্রহ্মাবতরণদর্শন। ইহাই মুখ্য দর্শন। এই পূর্ব্ববাঙ্গলা নববিধান সমাজে বঙ্গচন্দ্র-প্রমুখ দাসগণ, উপরোক্ত ত্রিবিধ স্থলে ব্রহ্মের অবতরণ দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। সংক্ষেপে দুই এক কথায় তাহা প্রকাশ করিতে যত্ন করিয়া, আমি বক্তব্য শেষ করিতেছি। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের মুখে এই ত্রিবিধস্থলে ব্রহ্মদর্শনের তত্ত্ব আমরা তৎপ্রদত্ত "Great Men" (লোকোত্তর পুরুষ) নামক বক্তৃতাতে শুনিয়াছি। তৎপর সাধন-ক্ষেত্রেও তদীয় সহচরগণ মধ্যে এতত্ত্ব আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রহ্মাবতরণদর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া যে প্রার্থনা হইল, তাহা সঙ্গীতাকারে প্রেমদাস এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা:—

"দাও মা আনন্দময়ী দরশন। তব প্রেমানন, ভকতরঞ্জন, যার প্রভাবে সঞ্চারে জীবন।

নব নব রূপধরি, প্রাণ মন লও হরি, কখন একাকী কভু সাধুগণে সঙ্গে করি; বিচিত্ররূপ হেরি, জুড়াইব তৃষিত নয়ন।

অনন্তগুণধারিণী, মা অনন্তরূপিণী; নিরখি তোমারে, বিশ্ব চরাচরে, সাধুর অন্তরে, হৃদয় ভিতরে, আনন্দে হইব মগন।"

এই দর্শন যখন ঘনীভূত আকার ধারণ করিল, তখন সঙ্গীত হইল:—

"নমোদেব, নমোদেব, নমো নিরঞ্জন হরি, স্রষ্টা পাতা, মঙ্গলদাতা, তব পদ শিরে ধরি, সবে প্রণিপাত করি।

(তব) অমর সুপুত্রগণ, যোগী ঋষি তপোধন, ঈশা, মুসা, জন, গৌর আদি মহাজন; (শাক্য) (জনক) (মহম্মদ); তাঁদের জীবনে, চরিত্রদর্পণে, তোমারে করি দরশন; বন্দি নাথ ও চরণ।

বিশ্বব্যাপী ভগবান্, সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান, জড় জীব তরু লতা সবাকার প্রাণ; তাদের ভিতরে, নিরখি তোমারে, করি বিনতি প্রণাম; কর বরাভয় দান।

এই বিশাল সংসার, তব প্রিয় পরিবার, নরনারী যত প্রকাশে মহিমা তোমার; স্ত্রীলোক বালক, শত্রু মিত্র সবে, বার বার নমস্কার; তুমি সর্ব্বমূলাধার।

যত যত যুগধর্ম্ম, যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম, বাইবেল বেদাদি প্রকাশে যাহার মর্ম্ম; প্রাচীন বিধান, নূতন বিধান, আমাদের প্রণম্য; জয় এক পরব্রহ্ম।"

এই সঙ্গীতে আর একটী অন্তরা, কলিকাতাস্থ প্রেরিতগণ, আচার্য্য কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর সংযুক্ত করিয়াছেন। তাহা এই "যত সাধু মহাজন, কেশবে সবার মিলন; তাঁহার জীবনে, সবার মিলনে, তোমারে করি দরশন; ভক্তাধীন ভগবান্।"

যখন মনুষ্যসন্তান ব্রহ্মদর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়, সে তখন অজ্ঞাতসারে বা জ্ঞাতসারে তাঁহার সুন্দর স্বরূপে আকৃষ্ট হইয়াই ব্যাকুল হইয়া থাকে। এজন্য প্রেমদাস গাইলেন:—"ধ্যানে জ্ঞানে যাঁরে, ধরিতে না পারে, সেই ব্রহ্ম সনাতন; হৃদয়ে হৃদয়ে, গোপনে পশিয়ে, করেন হরণ মন।" ইহার প্রমাণস্বরূপ এই পূর্ব্ববাঙ্গালার দাসদিগের মুখে একটী সঙ্গীত প্রথম অবস্থাতেই শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। তাহা এই:—

"আহা রে, অপরূপরূপধারী! পবিত্রাত্মা রূপে, দেখ এসেছেন হরি।

সত্যেতে গঠিত কায়, জ্ঞান-জ্যোতি শোভে তায়, অখণ্ড মণ্ডলাকার সীমা নাহি হেরি।

সুকোমল বক্ষঃস্থলে, প্রেমের লহরী খেলে, ভক্তবৃন্দ লয়ে কোলে, আছেন বিশ্বেশ্বরী।

পুণ্য-জ্যোতি নিরুপম, শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্, যাঁর দরশনে, পাপীজনে তরে ভববারি।

যে দেখে রূপ হয় মোহিত, গায় হরিগুণগীত, রাজদণ্ডধারী হয় ত্রিদণ্ডধারী (হয় পথের ভিখারী)।"

অতএব আমরা বলিতে পারি যে, ব্রহ্মসনাতনের যে সৌন্দর্য্য এই পূর্ব্ববঙ্গে অল্পসংখ্যক দাসদিগকে প্রথম যৌবনেই মোহিত করিয়া, নানাস্থান এবং নানা অবস্থা হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক টানিয়া আনিয়া, আচার্য্য বঙ্গচন্দ্রের সহিত মিলিত করিয়াছিল, যথাসময়ে সেই সৌন্দর্য্যই ঘনীভূত হইয়া ব্রহ্মাবতরণে পরিণত হইয়াছিল। এখানকার দাসদল, কলিকাতাস্থ ব্রহ্মানন্দী দলের অনুসরণে গঠিত। সুতরাং এ দল সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মাবতরণ ব্রহ্মানন্দী দলেই বিশেষভাবে দর্শন করেন এবং আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ বিশদ রূপে পবিত্রাত্মার অবতরণ দর্শন ও স্বীকার করিয়া ধন্য হইয়াছেন। নিম্নে প্রদত্ত সঙ্গীতটী, কেশবচন্দ্র দেহে বর্ত্তমান থাকিতেই, বঙ্গচন্দ্রের প্রার্থনার ভাবানুসারে ভাই দুর্গানাথ উপাসনাকালে রচনা ও গান করেন। যথা:—

রাগিনী—তাল একতালা।

"ঐ দেখ আনন্দময়ী এলেন ধরাতলে রে।

মায়ের প্রেমক্রোড়ে প্রিয় শিশু, কেমন হাসে খেলে রে।

দেখিলে এরূপ মায়ের, জুড়ায় নয়ন মন রে; প্রেমরসে

হৃদয় ভাসে, মানুষ হয় দেবতা রে।" ইত্যাদি।

হৃদয়ে ব্রহ্মাবতরণদর্শন সম্বন্ধে "ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ" নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থে সংক্ষেপে বিশদ আলোচনা হইয়াছে। সুতরাং আমার বক্তব্য এখানেই উপসংহার করিতেছি।

অতঃপর পণ্ডিত শারদাপ্রসন্ন সেন ও ভাই দুর্গানাথ রায় ওজস্বিনী ভাষায় কিছু বলিলে, ভাই মহিমচন্দ্র সঙ্গীত ও প্রার্থনা করিয়া সে দিনের কার্য্য শেষ করেন।

৩০শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, অপরাহ্নে, নারায়ণগঞ্জে প্রচারযাত্রা হয়। সেখানে সঙ্গীত ও প্রান্তরগত বক্তৃতান্তে, উকিল বাবু

যতীন্দ্রনাথ দাসের গৃহে উপাসনা হয়। এবং উপাসনান্তে যতীন্দ্র বাবু প্রচারযাত্রিদল এবং স্থানীয় অন্যান্য বন্ধুদিগকে নানা উপচারে ভোজন করান। উপাসনা-কার্য্য শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস করেন। এবং প্রান্তরগত বক্তৃতা তিনি অগ্রে করিলে, ভাই অখিলচন্দ্র রায় ও ভ্রাতা শারদাপ্রসন্ন সেন বক্তৃতা করিয়া সেখানকার কার্য্য শেষ করেন।

৩১শে ভাদ্র, শুক্রবার, সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসকমণ্ডলীর বার্ষিক সভা হয়। সভার কার্য্য শেষ হওয়ার পূর্ব্বে অপর একদিন সভা করিবার প্রস্তাব স্থির হয়। সেদিন সম্পাদক ভাই মহিমচন্দ্র সেন অসুস্থ হইয়া সভাতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সহকারী সম্পাদক বাবু নির্ম্মলচন্দ্র নন্দী সভাতে বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ করেন।

১লা আশ্বিন, শনিবার, সায়ংকালে, মন্দিরে বিবিধ ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণের সম্মিলন হয়। রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, সভাপতির কার্য্য করেন এবং অভিভাষণে সম্মিলনের উপযোগিতা প্রদর্শনপূর্ব্বক, সকল ধর্ম্মের প্রতি নববিধানবিশ্বাসীদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সুললিত ভাষাতে ব্যাখ্যা করেন। তৎপর প্রথমতঃ ভট্টপল্লী-নিবাসী ঢাকা কলেজের অধ্যাপক হেমচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, মহোদয় হিন্দুধর্ম্মের বিষয় বলেন। তিনি সাকার এবং নিরাকার উপাসনার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া, নিরাকারই যে সত্য, তাহা প্রতিপাদনপূর্ব্বক শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করেন। তৎপর ডাক্তার মহম্মদ সহীদুল্লাহ এম, এ, ডিলিট, ইসলামধর্ম্মসম্বন্ধে সুন্দর বক্তৃতা করেন তাঁহার বক্তৃতাতে সেদিন আমরা ইসলাম ধর্ম্মের অনেক নূতন তত্ত্ব শুনিয়া সুখী হইয়াছি। একটী বৌদ্ধ ছাত্র বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধে সুন্দর একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ-শ্রবণে লেখকের ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং ধর্ম্মজীবনলাভের অনুসন্ধিৎসা, সুস্পষ্ট শ্রোতাদের মনে সমুদিত হইয়াছিল। অন্যান্য ধর্ম্মের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকাতে, ভাই মহিমচন্দ্র সেন একটী মাত্র কথায় খ্রীষ্টধর্ম্মের অবতারবাদ এবং মধ্যবর্ত্তিবাদের মূলতত্ত্ব শ্রীমদীশার বাক্য উদ্ধৃত করিয়া সভাতে প্রকাশ করেন। সভাপতি অসুস্থতা বশতঃ বাবু রাজকুমার দাস এম, এ, মহোদয়ের উপর স্বীয় কার্য্যভার রাখিয়া চলিয়া যান। সুতরাং রাজকুমার বাবু অল্প কথায় সভার কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সে দিনের কার্য্য শেষ করেন।

২রা আশ্বিন, রবিবার, পূর্ব্বাহ্নে মন্দিরে মহিলাদের ব্রহ্মোৎসব হয়। মহিলারাই উৎসবের তাবৎকার্য্য সম্পন্ন করেন। শ্রীমতী ইন্দুমতী দাস উপাসনার কার্য্য করেন। অন্যান্য মহিলাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্যক্তিগত প্রার্থনা এবং সঙ্গীত করেন। অপরাহ্নে বালকবালিকাদের সম্মিলন হয়। তাহাদের আবৃত্তি, অভিনয় এবং নৃত্য সকলের প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। বালিকাদের মধ্যে একটী মুসলমান বন্ধুর দুইটী শিশু কন্যা সুন্দর নৃত্য করিয়াছিল। সায়ংকালে কীর্ত্তনান্তে শান্তিবাচনের উপাসনা হয়। ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনান্তে তিনি সম্পাদক ভাই মহিমচন্দ্রকে প্রার্থনা করিয়া উৎসবের শান্তিবাচন করিতে অনুরোধ করাতে, তিনি প্রার্থনা করিয়া শান্তিবাচন করেন এবং তৎপরে সঙ্গীত হইয়া উৎসবের কার্য্য শেষ হয়। এ বৎসর উৎসবের কার্য্যপ্রণালী মধ্যে একটী বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল, প্রতিদিন দেবালয়ে ব্রহ্মের অষ্টোত্তরশতনাম কীর্ত্তন এবং মাতৃস্তোত্র পাঠ সহ ঊষা কীর্ত্তন ও প্রার্থনা। তদবধি অনুষ্ঠানটী স্থায়ী আকার ধারণ করিয়াছে। সম্পাদক।

—•—

কুচবিহারের মাননীয়া মহারাণী স্বর্গীয়া সুনীতি দেবীর
পারলৌকিক অনুষ্ঠান।

গত ১০ই নবেম্বর, রাঁচিনগরীতে মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবী স্বর্গারোহণ করেন। আচার্য্যদেবের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র সেন তখন রাঁচিতে সপরিবারে ছিলেন। তিনিই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন এবং এই নিদারুণ শোক-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া, এতৎসম্বন্ধে যথাবিহিত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন। কুচবিহার ষ্টেটের অভিপ্রায় ও ব্যবস্থামত, ১৫ই নবেম্বর তিনি সপরিবারে পবিত্র ভস্ম সহ কলিকাতা আসিলে, তাহা উডল্যাণ্ড রাজপ্রাসাদে যথাযোগ্য সম্মানের সহিত রক্ষিত হয়। ২৪শে নবেম্বর, সন্ধ্যায়, উডল্যাণ্ড রাজপ্রাসাদ হইতে পবিত্র ভস্ম ৭৮নং অপার সার্কুলার রোডে, নববিধানের পবিত্রতীর্থ কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে আনার ব্যবস্থা হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ প্রার্থনা করিলে পর, পবিত্র ভস্ম সহ শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেন সপরিবারে বিশিষ্ট বন্ধুগণসঙ্গে নবদেবালয়ে আগমন করেন। পূর্ব্ব হইতেই মণ্ডলীর অনেকে নবদেবালয়ে সমবেত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। পবিত্রভস্ম গম্ভীরভাবে নবদেবালয়ে বেদীর পশ্চিমপার্শ্বে রক্ষিত হইলে উপাসনা হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। তৎপর শুক্রবার ও শনিবার প্রাতে ও সন্ধ্যায় নবদেবালয়ে উপাসনা হয়। উডল্যাণ্ড রাজপ্রাসাদে ও নব দেবালয়ে এই কয়দিন, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক, ভাই অক্ষয়কুমার লধ, ভাই অখিলচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেন, ডাঃ সত্যানন্দ রায়, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ প্রেমেন্দ্র রায় উপাসনা করেন।

২৭শে নবেম্বর, রবিবার, পূর্ব্বাহ্নে, শ্রীদরবার, উপাসকমণ্ডলী ও আচার্য্যদেবের পরিবার মিলিত ভাবে, পবিত্র ভস্মস্থাপন ও পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন জন্য কমলকুটীরে বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা করেন। পূর্ব্বাহ্নে ৮॥টায় "জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে" কীর্ত্তন করিতে করিতে, রূপার পাত মোড়া পবিত্র ভস্মাধার নবদেবালয় হইতে সমাধিপ্রাঙ্গণে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গম্ভীর ভাবে নীত

হয়; তৎপর ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক প্রার্থনা করিলে, যথাস্থানে তাহা সমাহিত হয়। পরলোকগত আত্মার ইচ্ছানুসারে, এই পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্রে, পিতামাতার সমাধির সন্নিকটে, তাঁহারও সমাধিরক্ষার ব্যবস্থা হয়। ৯টার সময় ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হয়। ভাই প্রিয়নাথ উদ্বোধন ও শেষ প্রার্থনা করেন, ভাই অক্ষয়কুমার লধ আরাধনা করেন, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ পাঠাদি করেন। অনুষ্ঠানটী যথাযোগ্য ভাবে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে গাম্ভীর্য্যের সহিত সম্পন্নহয়। শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মধুর সঙ্গীত করেন। মিসেস পি, কে, সেন প্রভৃতি মহিলাগণ সুললিত কণ্ঠে একটী সঙ্গীত করেন। ভাই কালীনাথ ঘোষের সহধর্ম্মিণী ও শ্রীমতী সুমতি মজুমদার প্রেরিত শ্রদ্ধাঞ্জলি শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন পাঠ করেন। কুচবিহার ও ময়ূরভঞ্জের রাজপ্রতিনিধিগণ এবং কলিকাতাস্থ গণ্যমান্য দেশীয় ও ইউরোপিয়ান অনেকেই উপস্থিত হইয়া, পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন করেন।

এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে, গত ১১ই অগ্রহায়ণের "আনন্দবাজার" পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

কুচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবী, সি, আই, গত ১০ই নবেম্বর, রাঁচিতে পরলোক গমন করেন। গত রবিবার, কলিকাতা 'লিলিকটেজে' তাঁহার চিতাভস্ম সমাহিত করা উপলক্ষে, পরলোকগতা মহারাণীর আত্মার কল্যাণ কামনা করিয়া একটি উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় কুচবিহারের মহারাজা, মাননীয়া ইন্দিরা দেবী, লেঃ কর্ণেল হেভান্স গর্ডন, ময়ূরভঞ্জের মহারাণী মাননীয়া সুচারু দেবী, ময়ূরভঞ্জের কুমার ধ্রুবেন্দ্রচন্দ্র ভঞ্জদেও, দিঘাপাতিয়ার রাণী, মিঃ কালেণ্ডার ও মিসেস কালেণ্ডার, মিঃ এস, সি, মুখুজ্যে ও মিসেস এস, সি, মুখুজ্যে, কুচবিহারের মহারাজ-কুমার ইন্দ্রজিৎনারায়ণ, কুচবিহারের মহারাজ-কুমারী ইলা দেবী, গায়ত্রী দেবী ও মেনকা দেবী এবং মিঃ ও মিসেস ডাভিসন স্বর্গীয়া মহারাণীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার জন্য পুষ্পমালা প্রেরণ করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মহারাণী সুনীতি দেবীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া, মিঃ এন, সি, সেনের নিকট বহু তার ও পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। সম্রাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী স্যার ক্লাইভ উইগ্রাম, বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী, বাঙ্গালার লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী, বিহার ও উড়িষ্যার লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী, বিকানীর মহারাজা, বরোদার গাইকোয়ার, কপুরথলার মহারাজা, নাটোরের মহারাজা, ময়মনসিংহের মহারাজা, বর্দ্ধমানের মহারাজকুমার, কাকিনার রাজা, গৌরীপুরের রাজা, শক্তির রাজা বাহাদুর, লর্ড সিংহ, মিঃ ই, সি, বেন্থল, কর্ণেল ই, ভিয়ারহজ, স্যার ডেভিড ও লেডি হুরজা, কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, মিঃ আবদুল আলী এবং মিঃ প্রফুল্ল ঠাকুর।

সংবাদ।

ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসব—শ্রীমদ্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে, কলিকাতায়, ১৯শে নবেম্বর, প্রাতে কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে এবং সন্ধ্যা ৬টার সময় ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। প্রাতে শ্রদ্ধেয় কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যায় ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে কেশব একাডেমী স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকগণের উদ্যোগে, দ্বিপ্রহরের সময়, ১৪৮নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটস্থ উক্ত স্কুল গৃহে কাঙ্গালীভোজন ও অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়, কলিকাতা হিন্দু অনাথ আশ্রমের বালকবালিকাগণকে জলযোগ করান হয়। ২১শে নভেম্বর, অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায়, ঐ স্কুলগৃহে ব্রহ্মানন্দের চিত্র উন্মোচন করা হয়; ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

গত ১৯শে ও ২০শে নবেম্বর, পুরী নবশ্রীক্ষেত্রস্থ "নবপর্ণ-কুটীরে" শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের জন্মোৎসব উপাসনা-যোগে সম্পন্ন হয়। ১৯শে সন্ধ্যা ৬টায় স্থানীয় "ক্লার্ক" হলে সাধারণ সভা হয়। কালেক্টর মিঃ, এন, পি, থাডানি আই,সি,এস, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে একটি যুবা "মা কেশব-জননী" সঙ্গীত করিলে, ভাই প্রিয়নাথ বাঙ্গালাভাষায় প্রার্থনা করেন ও ইংরাজীতে "বিশ্বমানবত্বে শ্রীকেশবের দান" বিষয়ে আত্ম-নিবেদন করেন। পরে মৌলবী মুস্তাফা খাঁ সাহেব, রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ সরকার শ্রীকেশবচন্দ্রের গুণাবলী বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা দান করিলে, সভাপতি মহাশয় শ্রীকেশবচন্দ্র যে যথার্থ ভবিষ্যদ্বক্তা মহাপুরুষ ছিলেন, সুন্দর ওজস্বিনী ভাষায় তাহা বর্ণনা করেন। নবরচিত "বন্দে মাতরং, বন্দে ভ্রাতরং, বন্দে নবযুগধর্ম্ম নববিধানং" কয়েকটী যুবা সমভাবে গান করিলে, সভাপতি ও বক্তা এবং উপস্থিত ব্যক্তিগণকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়। সভায় এস, ডি,ও, মিঃ এস, এন, বসু, সিনিয়ার ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি, পূজারী, রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ দে, মৌলবী মহম্মদ হালিম এবং অন্যান্য অনেকগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করেন।

বাগনান শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমেও, গত ৫ই অগ্রহায়ণ, ২১শে নবেম্বর, শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে ভাই প্রিয়নাথের দৌহিত্রী কুমারী দুর্গা সিংহ নবসংহিতামতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কন্যার মাতা দীক্ষার্থিনীকে উপস্থিত করেন ও ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ বসু মণ্ডলীর প্রতিনিধিরূপে আসন, গৈরিক, পুস্তকাদি উপহার দেন। প্রাতঃকালীন উপাসনা ভাই প্রিয়নাথই করেন, সন্ধ্যায় ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ বসু করেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় কীর্ত্তনের দল জমাট কীর্ত্তন করেন।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—গত ৩০শে অক্টোবর, কয়েকটী ভাই ভগিনীর আগ্রহে, পাটনায় কুমারী বনলতা দের গৃহে, ভাই-

ফোঁটার উৎসব অতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। ইহাতে হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, মুসলমান বিহারী ও বাঙ্গালী শতাধিক ভাই ভগিনী উপস্থিত ছিলেন। "ভাই বোনে মিলে, তব পদতলে, এসেছি গো পিতা চাহ দয়া করে" এই সঙ্গীতটী গীত হইবার পর, সেবিকা হেমলতা চন্দ এই অনুষ্ঠানের বিষয়ে কিছু নিবেদন করিয়া, প্রাণের আবেগের সহিত ভাইদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ভাইফোঁটা বিষয়ক প্রার্থনা পাঠ করেন। কুমারী বনলতা দে হিন্দিতে সকলকে ধন্যবাদ দান করেন এবং বর্ত্তমান সময়ে নারীজাতির উন্নতির দিনে, এই বিশুদ্ধ ভ্রাতৃপ্রেম-সাধনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কিছু বলিয়া, প্রতি বৎসর যাহাতে এইরূপ ভাই ভগিনীদের সম্মিলন হয়, এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্র রায়ের বিশেষ বন্ধু, পাটনার পুরাতন উকীল শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সিংহ বাঁকিপুরের এই প্রিয় ভাইফোঁটার উৎসবের পূর্ব্বস্মৃতি উল্লেখ করিয়া, ইহার পুনঃপ্রবর্ত্তনে আনন্দ প্রকাশ করেন। সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীআচার্য্যদেবের এই ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানের উচ্চভাব অনুসরণ করিয়া, জাতি ধর্ম্ম রাজা প্রজা নির্ব্বিশেষে, সকলকে প্রেমসাধনে ব্রতী হইতে বলেন। কয়েকটী বালিকা সঙ্গীত, আবৃত্তি ও ঐক্যতান বাদন করিয়া সকলের চিত্তবিনোদন করিয়াছিল। সভার শেষে ছোট ছোট ২।৩টী বালিকা সকলকে চন্দনের ফোঁটা পরাইয়া দেয় এবং তৎপরে কিছু জলযোগ করান হয়। এই অনুষ্ঠান পূর্ব্বে বাঁকিপুরে অঘোরপরিবারের কন্যাগণ প্রতি বৎসর করিতেন। এবং ইহার সহিত শ্রীমতী ব্রহ্মকুমারী রায়ের নাম বিশেষভাবে জড়িত। এ বৎসরও তিনি ইহার জন্য কিছু সাহায্য পাঠাইয়াছেন।

রাঁচি—নামকুমে শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের গৃহেও ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উৎসব হয়। গৌরীবাবু উপাসনা করেন। প্রেমের বিনিময় স্বরূপ সকলকে চন্দনের ফোঁটা দেওয়া হয়।

পুরস্কার-বিতরণ—গত ২৯শে অক্টোবর, অপরাহ্নে, অমরাগড়ী নববিধানসমাজান্তর্গত উচ্চ প্রাথমিক বালিকাবিদ্যালয়ের পুরস্কারবিতরণ অনুষ্ঠান স্বর্গীয় সূর্য্যকুমার রায়ের সদর বাড়ীতে সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত বসন্তকুমার কাব্যতীর্থ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং কলিকাতার সাধু প্রমথলাল শিক্ষাতীর্থের সম্পাদিকা শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ পুরস্কার দান করেন। মেয়েদের সঙ্গীত ও আবৃত্তি আদি মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল। প্রায় ৩০০ নরনারী সমবেত হইয়া সভার আনন্দ বৃদ্ধি করেন। সভার আরম্ভে ভাই অখিলচন্দ্র রায় প্রার্থনা করেন।

সমাধিমন্দির প্রতিষ্ঠা—গত ৩০শে অক্টোবর, পূর্ব্বাহ্নে, অমরাগড়ীতে বিধানকুটীরপ্রাঙ্গণে, ভক্ত ভাই ফকির দাসের সমাধির উপর মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে, ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। ভক্তের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী শশিমুখী দেবী রোগজীর্ণ অবস্থায় অতীব ক্ষীণকণ্ঠে প্রার্থনা করেন। পুত্রদ্বয়ের অর্থে ও সামর্থ্যে এই পবিত্র কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়াতে, ভক্তসঙ্গিনীর একটী মনের সাধ পূর্ণ হইল। ভগবান্ ভক্তের পরিবারকে আশীর্ব্বাদ করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ৫ই নবেম্বর, ৭৮এ হ্যারিশন রোডে, শ্রীযুক্ত নীতিলাল ঘোষের পিতৃদেব স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের সাম্বৎসরিক। ৮ই নবেম্বর, সিঁথিতে, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ দাসের পিতামাতার সাম্বৎসরিক। দান প্রচারভাণ্ডারে ১৲ টাকা। ১৬ই নবেম্বর, ২এ মন্মথ ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীটে, চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া সরোজিনীর সাম্বৎসরিক; কন্যা কুমারী সাধনা চৌধুরী মাতৃতর্পণ পাঠ করেন এবং পিসীমা শ্রীযুক্তা বিন্দুবাসিনী সেন প্রার্থনা করেন। প্রচারভাণ্ডারে দান ১৲টাকা। ১৭ই নবেম্বর, ৬৫।১ হ্যারিশন রোডে, শ্রীমান্ সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের শ্বশ্রূমাতার সাম্বৎসরিক। জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী কুমুদিনী দাস বিশেষ প্রার্থনা করেন। প্রচার ভাণ্ডারে দান ১৲ টাকা। ১৮ই নবেম্বর, ১৫।১বি প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে, ডাঃ শৈলেন্দ্রভূষণ দত্তের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক। শৈলেন্দ্রবাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন। প্রচারভাণ্ডারে দান ৫৲ টাকা। ১৯শে নবেম্বর, ১১নং পদ্মনাথ লেনে শ্রীযুক্ত হরিসুখ গুপ্তের পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক। ২০শে নবেম্বর, ৯৪।১সি খড়পার রোডে, ডাঃ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক। হেমন্তবাবু মাতৃদেবীর সুন্দর পবিত্র জীবন বর্ণনা করিয়া প্রার্থনা করেন ও প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করেন। ভাই অক্ষয় কুমার লধ এই সকল স্থলে উপাসনা করেন।

ব্রহ্মসঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন।

"ব্রহ্মসঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন" পুস্তকখানির দ্বাদশসংস্করণ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে, নবপ্রণালীতে সজ্জীভূত হইয়া, নববিধানমণ্ডলী কর্ত্তৃক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সঙ্গীতাচার্য্য ভাই ত্রৈলোক্যনাথের গীতরত্নাবলী ও পথের সম্বলের প্রায় সমস্ত গান, ভাই কাশীনাথ ঘোষ, ভাই দুর্গানাথ রায়, ভক্ত হরিসুন্দর বসু, কুঞ্জবিহারী দেব, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন ও অন্যান্য অনেকের সুন্দর সুন্দর গান এবং ডাঃ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ১৫০টী বিশিষ্ট গান ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। উপাসনার অঙ্গ, সময়, ভাব, অবস্থা ও অনুষ্ঠানাদিভেদে সঙ্গীতগুলিকে এমন ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে, যাহাতে উপাসনা প্রার্থনাদির ভাবোপযোগী গান গায়ক সহজেই বাছিয়া লইতে পারিবেন। সঙ্গীত পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে, গায়ক, সাধক, ভক্ত উপাসক প্রভৃতি সকলের সাধনপথের বিশেষ সহায় হইবে, আশা করা যায়।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এল, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ২০শে অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৭ ভাগ। ২৩শ সংখ্যা।

১লা পৌষ, শুক্রবার, ১৩৩৯ সাল, ১৮৫৪ শক, ১০৩ ব্রাহ্মাব্দ।
16th December, 1932.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩্

প্রার্থনা।

হে মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুর পর মৃত্যু আসিয়া আমাদিগকে যেন বজ্র-নির্ঘোষে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতেছে। আমরা যে সম্পূর্ণ ধূলীসদৃশ, কিছুই নই, তাহাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এই ছিল মানুষ, আর পরক্ষণে কোথায় গেল! এই কতই সম্পদ্, কতই ঐশ্বর্য্য, কতই ধন, মান, সম্মান, রাজসিংহাসন, স্বামী, সন্তান, আত্মজন, দাসদাসীগণে পরিবেষ্টিত; হায়, একে একে সকলই গেল! যৌবন সৌন্দর্য্য, বেশভূষা অলঙ্কার, সকলই পরিত্যাগ করিয়া, জরাজীর্ণ, বার্দ্ধক্যে অবসন্ন তনুখানি মাত্র ছিল; তাহাও কোন্ নিঃসঙ্গ নির্জ্জন-ভূমিতে একাকী নিঃসম্বল অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে হইল! এ সংসার এতই অনিত্য, এতই অসার, ছাই ভস্ম? তাই কি প্রমাণ করিতে, এ দেহটাকেও ভস্মে পরিণত করিয়া মানুষ চলিয়া যায়? ধন্য মৃত্যুঞ্জয়, তোমার প্রেরিত মৃত্যুই জয় এই সংসারে একমাত্র হয়। এই মৃত্যুকে ফাঁকি বলিয়া উড়াইয়া দিলেন তোমার মৃত্যুঞ্জয় ভক্ত। তোমার রাজ্যে যাঁরা বাস করেন, তাঁদের উপর ত মৃত্যুর অধিকার নাই। আমরা বাহিরের অনিত্য অসার ধন, মান, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য লইয়া থাকি, তাহাই বড় মনে করি; তাহা হইতে বঞ্চিত হইলেই কাঁদি। তাই তুমি মৃত্যুকে দিয়া আমাদের মায়ার বস্তু কাড়িয়া লও এবং দেখাইয়া দাও, তাহা কিছুই নয়, কিছুই নয়, তাহা চিরদিনের নয়। যদি আমাদের চৈতন্য দিবার জন্য এই মৃত্যুর পর মৃত্যুর শেল হানিলে, তবে আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা এখন হইতে আর অনিত্য অসার বস্তুতে মায়াবদ্ধ না হই; কিন্তু তোমাকে মৃত্যুঞ্জয় জানিয়া, তোমারই চরণে আত্মসমর্পণ করি এবং মৃত্যুর ভয় অতিক্রম করিয়া তোমার ভক্তদের সঙ্গে তোমার নিত্য রাজ্যে এই শরীর থাকিতেই বাস করিতে সক্ষম হই, তুমি দয়া করিয়া এমন বিধান কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

কি শিখিলাম?

"সুখে দুঃখে সমভাবে, বিধাতার হস্ত দেখিবে, দয়াময় মহামন্ত্র করিবে সাধন।" এই সঙ্গীতবাণীর প্রতিধ্বনি যে মূর্ত্তিমতী হইয়াছিল মহারাণী দেবী সুনীতির জীবনে, ইহা কি আমরা অস্বীকার করিতে পারি?

যতদিন তিনি দেহে অবস্থিত ছিলেন, কত ভাবে, কত অবস্থায়, কত কার্য্যোদ্যমে, কত বিচিত্র বিভবে

তাঁহাকে আমরা দেখিয়াছি। তাঁহার সহিত আমাদের অবস্থার বৈষম্য খুব হইলেও, তাঁহার নৈকট্যসম্ভোগের কতই সুযোগ ও সৌভাগ্য আমরা লাভ করিয়াছি। পদ-মর্য্যাদায় আমাদের হইতে অতি উচ্চ হইলেও, বৈষয়িক তারতম্য ভুলিয়া, আধ্যাত্মিক সম্পর্কে তিনি আমাদিগকে কতই আদর, কতই স্নেহ, কতই অনুগ্রহ করিতেন। কতই সম্মান আমরা তাঁহার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা যে এক পিতামাতার সন্তান, এই বিশ্বাসে সহোদরের ন্যায় আদর ও ভাইফোঁটা দিয়া, তিনি যে আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

তিনি যতদিন এই দেহে অবস্থান করিতেছিলেন, ততদিন কি আমরা ঠিকভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছি? তাঁহার বিষয় সম্যক্ বুঝিবার সম্বন্ধে কতই আমাদের ভুলভ্রান্তি হইয়াছে, তাঁহার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাদানে কতই আমাদের ত্রুটী হইয়াছে। এখন তিনি সেই দেহাতীত রাজ্যে অদৃশ্য হইয়াছেন; আমরা আমাদের ভুল ভ্রান্তি ও ত্রুটীর জন্য তাঁহার আত্মার নিকট অনুতপ্ত-চিত্তে ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং বিশ্বাস করি, তিনি স্নেহার্দ্র-হৃদয়ে আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন, যেমন তিনি সর্ব্বদা আপন অপরাধ ত্রুটী স্মরণ করিয়া সবার নিকটই ক্ষমা চাহিতেন।

নববিধানে প্রেরিত ও চিহ্নিতদিগের জীবন যথার্থই আশ্চর্য্য জীবন। মহারাণী সুনীতি দেবীর জীবনও প্রত্যক্ষ বিধাতার স্বহস্তরচিত। এ জীবন যদি আমরা মানবীয় বিচারবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া বিধাতার আলোকে অধ্যয়ন করি, দেখিতে পাই, নববিধানে তাঁহার জীবন-ভাগবত অলৌকিক রহস্যপূর্ণ ও গভীর শিক্ষাপ্রদ। আমরা বিশ্বাস করি, নববিধানলীলাক্ষেত্রে সুনীতি দেবী বিশেষ প্রেরিত ও চিহ্নিত। নববিধানের অভ্যুত্থানের সহিত যে তাঁহার জীবন গ্রথিত, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। তাঁহার বিবাহলীলা হইতেই ব্রাহ্মসমাজ-গর্ভ হইতে নববিধানরূপ নবশিশুর জন্ম হইল। অণ্ড হইতে যেমন পক্ষিশাবক বাহির হইলে অণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়, তেমনি ব্রাহ্মসমাজ ভাঙ্গিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ জীবনীশক্তি নববিধানাকারে পরিণত হইল। ইহা সামান্য ব্যাপার নহে। সুতরাং যাঁহার জীবন যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া বিধাতার এই অলৌকিকলীলা সম্পাদিত হইল, তাঁহার জীবন কেমন করিয়া সামান্য বলিব?

তাহার পর সে জীবনের ঘটনাবলী অবলম্বনে বিধাতা যাহা জগৎকে শিক্ষাদান করিলেন, তাহাও সামান্য নহে। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "তুমি কাণে কাণে বলিলে, আর আমি দুঃখিনী কন্যা দিলাম, যে আমার ঘরে দুঃখে ছিল। তুমি চাহিলে, আর আমরা এগিয়ে দিলাম অন্ধকারের মুখে। আমি একদিনের জন্যে মনে করি নাই, সম্পদ মান ঐশ্বর্য্যের জন্য দিয়াছি। তোমার অনুজ্ঞা পালন করিলাম।"

যখন ব্রহ্মানন্দ ধর্ম্মবিশ্বাস হেতু নিজ পৈতৃক গৃহ, পৈত্রিক সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত হইয়া জাতিচ্যুতভাবে পার্থিব অতি দুঃখের অবস্থায় অবস্থাপিত হন, তখনই সুনীতির জন্ম হয় এবং সত্যই অনেক প্রকার দুঃখের অবস্থা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। এমন কি, তিনি বলিয়া-ছেন, একটী মাত্র ভিজা সেমিজ পরিয়া বিদ্যালয়ে গিয়া তাঁহাকে জ্বরে পড়িতে হইয়াছিল। সেই দুঃখিনী কন্যা বিধাতার আশ্চর্য্য কৌশলে স্বাধীন রাজ্যের রাজমহিষী রূপে বৃত হইলেন। মানুষের চেষ্টায় তিনি মহারাণী হন নাই, বরং স্বয়ং পিতৃদেব প্রথম প্রস্তাব আসিলে মতই দেন নি। স্বাধীন রাজ্যের মহারাণী হবার তিনি যে উপ-যুক্ত, তাহা শ্রীকেশবচন্দ্র প্রথম বিশ্বাসই করেন নাই। বিধা-তাই তাঁহাকে মহারাণী করিলেন এবং বিধাতার প্রসাদে জীবনে কত সম্মান পাইলেন। স্বয়ং মহাসম্রাজ্ঞী ভিক্টো-রিয়া শ্রীকেশবচন্দ্রের কন্যা বলিয়া, আপন কন্যা ও জামাতার ন্যায়, রাজপ্রাসাদস্থ নিজ শয়নকক্ষের পার্শ্বে, তাঁহাকে ও মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণকে আতিথ্যদান করিলেন, এবং জুবিলী উপলক্ষে, ইউরোপীয় সমস্ত সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী অপেক্ষাও, সর্ব্বসমক্ষে মা ভিক্টোরিয়া মহারাণী সুনীতি দেবীকেই চুম্বন দানে সম্মানিত করেন। মহারাণী আলেকজান্দ্রা ও সম্রাট্ এডওয়ার্ড এবং বর্ত্তমান সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীও আপন প্রিয়তম বন্ধু বলিয়া তাঁহাকে আদর সম্মান করিতেন। এত উচ্চ সৌভাগ্য কি কোন বঙ্গীয় নারীর হইয়াছে?

আবার একে একে স্বামী, পুত্র, কন্যা, রাজ্যৈশ্বর্য্য হরণ করিয়া লইয়া, পার্থিব যাহা কিছু মান, সম্মান, সম্পদ, ঐশ্বর্য্যের ভিতরে, নববিধানের সেবিকাব্রতই সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয় বলিয়া বিশ্বাসদানে, বিধাতা যে একেবারে তাঁহাকে সন্ন্যাসিনী বৈরাগিণী করিলেন এবং দাস্যব্রত-সাধনায় নিরত করিলেন, ইহা কি

সামান্য কথা? সেই অবস্থাতেই আবার কোন নিভৃত সুবর্ণরেখা নদীর তীরে দেহ রক্ষা করাইলেন, ইহা কি জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত ভাগবত নয়?

শ্রীব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "আমি রাণী চাই না, চাই ঈশ্বরের দাসী"। ভক্ত পিতার এই অনুজ্ঞা যে অক্ষরে অক্ষরে তিনি পূর্ণ করিলেন। আবার পিতা যেমন বলিলেন, "আমার কন্যা নয়, মণ্ডলীর কন্যা", সেই প্রবক্তার বাণী পূর্ণ করিতেই যেন, পরিবার ও দলের মিলনে, ভক্ত পিতার পার্শ্বে, "নববিধানের মহাতীর্থ" বলিয়া যে স্থানকে তিনি আদর করিতেন, সেই তীর্থে তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁর পবিত্র ভস্ম যে রক্ষিত হইল, ইহাও কি বিধাতার আশ্চর্য্যলীলা নয়! পার্থিব ধন, মান, সবই অসার, এক ধর্ম্মই মৃত্যুর পর অনুগমন করেন, ইহাই ত শিখিলাম।

—০—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

মৃত্যু না হইবার বা মৃত ব্যক্তির বাঁচিবার উপায় কি?

বাইবেলে উক্ত হইয়াছে, "আমি পুনরুত্থান ও জীবন, যে কেহ আমাকে বিশ্বাস করিবে, সে মৃত হইলেও চির জীবিত হইবে। আবার জীবিত থাকিয়া যে আমাকে বিশ্বাস করিবে, সে কখনই মরিবে না।" শ্রীঈশা এই উক্তির মর্ম্ম বিশদরূপে শিষ্যদিগকে বুঝাইয়া বলেন নাই; কিন্তু তিনি অবশ্যই জানিতেন, বেদান্তকার ঈশ্বরকে "প্রাণস্য প্রাণং" বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সুতরাং সেই প্রাণের প্রাণকে বিশ্বাস করিলে আর কি কেহ মরিতে পারে? যিনি নিত্য প্রাণ হইয়া এই প্রাণ বাঁচাইতেছেন, তাঁহাকে বিশ্বাস করিলেই মৃত্যু আর থাকে না। মরিলেও বাঁচিয়া যাই, আর তাঁহাতে বাঁচিয়া আছি, ইহা বিশ্বাস করিলে মরিবার সম্ভাবনা কই?

নব অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে খুব ক্ষুদ্র বস্তুকে বড় দেখায়, দূরবীক্ষণ যন্ত্রে খুব দূরের বস্তু নিকট দেখা যায়। ঈশ্বরের আলোকেও যদি কিছু দেখি, তাহার জড়ীয় পার্থিব নীচ হীন ভাব দেখা যায় না, আবার কাহাকেও দূর পর মনে হয় না। এক ঈশ্বরালোকের ভিতর অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ একত্রে মিলিত। তাই ঈশ্বরালোকে চক্ষুকে রঞ্জিত করিতে পারিলে, সব দূরকে নিকট মনে হইবে, সব বস্তু ও ব্যক্তিকে সুন্দর সুশ্রী ঐশ্বরিক বলিয়া উপলব্ধ হইবে।

নব পুষ্পরথ।

কোথাও যাতায়াত করিতে হইলে, যে কোন প্রকারের যান বা রথের প্রয়োজন। পূর্ব্বে হয়ত পদব্রজেই সকলে গমনাগমন করিত। তাহার পর জলপথে যাইতে নৌকা বা জাহাজ, স্থলপথে যাইতে গরুর গাড়ী, রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী দ্বারা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাবার উপায় আবিষ্কার হইয়াছে। এখন আবার আকাশ-পথে বিচরণ করিবার জন্য আকাশযান চলিতেছে। এ সকলই পার্থিব, কিন্তু পৃথিবী হইতে পরলোকে যাইতে হইলে পূর্ব্বে কেবল মৃত্যুই সোপান বলিয়া জানা ছিল; এখন নববিধানে নব পুষ্পরথ আবিষ্কার হইয়াছে, ইহার নাম উপাসনা, এই উপাসনা-রথে চড়িলে আমরা সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করিতে পারি। ইহাতে আরোহণ করিলে আমরা একাইক স্বর্গের ঈশ্বরের সন্নিধানে উপনীত হই, আর তিনিই নিজে আমাদের সারথি হইয়া, পথপ্রদর্শক হইয়া, স্বর্গের সব জায়গা দেখাইয়া দেন, স্বর্গবাসী অমরাত্মাদের সঙ্গে ও আমাদের আত্মজন প্রিয়জন সঙ্গে দেখা শুনা আলাপ পরিচয় করাইয়া দেন। এ পুষ্পরথে চড়িতে কিছু কষ্ট কল্পনা করিতে হয় না। মনে করিলেই এ রথ আসিয়া উপস্থিত হয়। বিশ্বাস করিলেই এ রথে উঠা যায়।

শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দদেবের কন্যা মহারাণী সুনীতি দেবী।

বিশ্ববিধাতা কাহাকে কোন উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, কাহাকে দিয়া কি কাজ করান, কে জানে? ধন্য সেই জীবন, যে জীবন তাঁরই হস্তে গঠিত হইয়া, তাঁহারই যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া, তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া, জীবনের বিচিত্র বিভিন্ন অবস্থার, সুখ সম্পদ ঐশ্বর্য্য সম্ভোগের ভিতর যেমন, আবার রোগ, শোক, জরা, বৈধব্য প্রভৃতি নানাপ্রকার পরীক্ষার ভিতরও তেমনি জীবন্ত বিশ্বাস, আত্মত্যাগ, শান্তি ও সমচিত্ততা রক্ষা করিয়া, ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া, অমরধামে গিয়া প্রিয়জনগণের সহিত মিলনের আশায় নিত্য প্রস্তুত হইয়া চলিয়া যাইতে পারেন।

তাই ত শ্রীব্রহ্মানন্দ দেবের কন্যা, রাজমহিষী রাজসন্তান-প্রসবিনী, নববিধানে প্রেরিতা সংবভগ্নী, আর্য্যনারীসমাজের অধিনেত্রী, পরিচারিকাব্রতধারিণী, দয়াদাক্ষিণ্যাদি অশেষগুণসম্পন্না মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী লিখিলেন, "I feel the unknown world is very near to me and I must try and finish what I think I have to do quickly."—"আমি দেখছি, সে অজানিত দেশ আমার খুব নিকটে, যাহা আমার করিবার আছে, আমি যত শীঘ্র পারি, শেষ করিতে

চেষ্টা করি।" আর অনায়াসেই যেন সেই অজানিত দেশে চলিয়া গেলেন।

আবার এই সেদিনও আমাদের লিখিলেন, "অনেক কাজ বাকি রহিল, যাইবার দিনও কাছে আসিল, 'কি করিব,' 'কি করিব' এই কেবল মনে হইতেছে। তুমি ত সমুদ্রের তীরে বসিয়া অনন্তের কোলে ঝাঁপ দিবার জন্ম প্রস্তুত হইতেছ, সন্দেহ নাই; কাজও করিতেছ, কিন্তু এখানে যে অনেক কাজ।" তাই আমাদেরও মনে হইয়াছিল, সত্যই তাঁহার এখানে এখনও অনেক কাজ আছে, এখনও তাঁহার যাইবার সময় হয় নাই। কিন্তু আমরা মনে করিতে পারি নাই যে, তিনিই সে অনন্তে ঝাঁপ দিবার জন্ম এত শীঘ্রই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এবং আমাদের ফাঁকি দিয়া যেন সে অনন্তের ওপারে পাড়ী দিয়া চলিয়া গেলেন।

নববিধানভারতে শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবীর জীবন বিচিত্র লীলায় পূর্ণ। নববিধান অভিনয় করিতে যাঁহারা প্রেরিত, তাঁহাদিগের মধ্যে তিনিও একজন, ইতিহাস তাহা অকুণ্ঠিতচিত্তে সাক্ষ্য দান করিবে। তাই তাঁহার জীবনকাহিনী আমরা যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিতেছি, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি। বঙ্গমহিলাকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, তিনিই প্রথম এক স্বাধীন রাজ্যের মহারাজমহিষী ও মহারাজমাতা হন। এবং রাজৈশ্বর্য্যে মণ্ডিত হইয়াও, বৈরাগিণী তপস্বিনী হইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

নববিধানাচার্য্য শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন কলুটোলার বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ১৮৬৪খ্রীষ্টাব্দে সেই বাড়ীতে সুনীতি দেবী জন্মগ্রহণ করেন। তখন কেশবচন্দ্র ধর্ম্মের জন্য জাতিচ্যুত, "এক ঘরে"। বাড়ীর অপর সকলের হইতে তাঁহাকে পৃথকান্ন হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। তাঁদের জাতি নাই বলিয়া, পাচক ব্রাহ্মণ বা চাকরবাকর বড় একটা জুটিত না। অতি কষ্টে তাঁদের দিন কাটাইতে হইত। এই অবস্থায় সুনীতির জন্ম। আবার যে সময়ে সুনীতির জন্ম হয়, তখন তাঁর ষষ্ঠীপূজার দিনে "বিশে আশ্বিন, বুধবার" ভয়ঙ্কর ঝড় হয়। আতুর ঘরে এই দিনই নাকি বিধাতা পুরুষ ছেলের কপালে তার ভবিষ্যৎ লিখিয়া যান। তাই সুনীতিকে যে জীবনে অনেক ঝড় বহন করিতে হইবে, তাহারই নিদর্শন যেন এই ঝড়।

যাহা হউক, কেশব পরিবার ও জাতিচ্যুত বলিয়া বাড়ীর অপর সাধারণে তাঁহাদের ভিন্ন মনে করিলেও, মা সারদা দেবীর স্নেহ তাঁহাদিগকে ভিন্ন মনে করিত না, আর ছোট ছোট শিশুরাও শিশুদিগকে ভিন্ন মনে করিত না। সুনীতি সবার সঙ্গে মেশামিশি করিতেন এবং সকলকারই অতি প্রিয় ছিলেন।

অল্প বয়স হইতেই পড়াশুনায় তাঁহার বড় ঝোঁক হয়। এমন কি, একবার একটীর বেশী সেমিজ ছিল না, সেটিও কাচা হইয়াছিল, তখন তাঁর সর্দ্দিও হয়, মা তাঁহাকে স্কুলে যাইতে মানা করিয়া উপাসনায় বসেন। সুনীতি মার কথা না শুনিয়া, সেই ভিজা সেমিজ গায়ে দিয়াই, স্কুলের গাড়ী আসিতেই স্কুলে চলিয়া যান। স্কুলে গিয়াই কম্প দিয়া খুব জ্বর হইল। শিক্ষয়িত্রী তাঁর শুশ্রূষা করিয়া তাঁকে বাড়ী পাঠাইয়া দেন।

বাড়ীর ছোট ছোট বোদের তিনি পত্রবাহিক ছিলেন। তাঁরা তাঁহাকে বড় ভালবাসতেন। মা ব্রহ্মনন্দিনীর কাছেই সুনীতির বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। শৈশবকালে তিনিই তাঁকে পাঠ বলিয়া দিতেন ও চিত্রব্রতাদি শিখাইয়া ধর্ম্মভাব সঞ্চার করিয়া দেন। কলুটোলার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, আচার্য্যদেব যখন সপরিবারে প্রচারক ও সাধকদিগের পরিবারবর্গের সঙ্গে "ভারতাশ্রম" করিয়া, সবার সহিত এক পারিবারিক বন্ধন সাধন করেন, তখন আশ্রমের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশিয়া সুনীতি দেবী কতই আমোদ আহ্লাদে বাল্য জীবনযাপন করেন। তাহার পর বেলঘরিয়ার সাধনকাননে, যথার্থ ই ঋষিকন্যা, ঋষিপুত্রের ন্যায় তাঁহার ভাই বোনগুলি একত্রে ধর্ম্মশিক্ষালাভে ধন্য হন। উদ্যানে কত ফুল ফুটিত, কিন্তু আচার্য্যদেব স্বহস্তে প্রত্যেক গাছটীতে লিখিয়া দিয়াছিলেন, কেহ ফুল তুলিবেনা; তাঁহার আদেশ দেবাদেশ মনে করিয়া কখন তাঁহারা তাহা লঙ্ঘন করিতেন না।

সুনীতি পিতা ব্রহ্মানন্দকে যথার্থ ই যেন অলৌকিকশক্তি-সম্পন্ন দৈব ব্যক্তি মনে করিতেন। বেলঘরিয়ার বাগানে অনেক সাপ থাকিত; একবার একটা সাপ একটা বেঙকে তাড়া করাতে, বেঙটা লাফাইতে লাফাইতে আচার্য্যদেবের পায়ের কাছে লুকাইয়া পড়ে। তখন আচার্য্যদেব গভীর উপাসনায় মগ্ন ছিলেন, তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। সাপটা বেঙের তাড়া করিতে করিতে আচার্য্যদেবের নিকট গিয়া কিছুক্ষণ ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিছুক্ষণ সেই অবস্থায় থাকিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল। সাপটা চলিয়া গেলে, বেঙটাও বাহির হইয়া পলাইল। সুনীতি এই ঘটনা স্বচক্ষে স্থির হইয়া দেখিয়া মনে করিলেন, পিতা যথার্থ ই দেবতা।

ভারতাশ্রমের বিদ্যালয়ে, বেথুন বিদ্যালয়ে ও মিস্ পিগটের নিকট সুনীতির যথাসম্ভব বিদ্যাশিক্ষা হয়। রোমান ক্যাথলিক নান্‌দিগকে দেখিয়া বাল্য জীবনে সুনীতির মনে মনে সংকল্প হয়, তিনি অবিবাহিত থাকিয়া নান্‌দিগের ন্যায় সেবাসাধনে জীবন কাটাইবেন। কিন্তু বিধাতার অনির্ব্বচনীয় বিধানে, পরিণত বয়স না হইতে হইতেই, কোচবিহারের স্বাধীন রাজার সহিত বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হইল। গভর্ণমেণ্টই এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তাঁহারা যুবা মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণকে সুশিক্ষিত করিয়া শিক্ষার পূর্ণতা জন্য বিলাতে পাঠাইতে মনস্থ করেন। রাজমাতার অনুরোধে কর্ত্তৃপক্ষগণ মহারাজার বিবাহ দিয়া, তাহার পর বিলাত যাইবার ব্যবস্থা করিতে চান। কোচবিহারের প্রচলিত প্রথা অনুসারে বিবাহ করিতে মহারাজাও সম্মত

নন, কর্ত্তৃপক্ষদিগেরও ইচ্ছা নয়; তাই ডেপুটী কমিশনর ডাল্‌টন সাহেব তখনকার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে পাত্রী খুঁজিবার ভার দেন।

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের নিকট প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, তিনি অস্বীকার করিয়া বলেন, "আমার মেয়ে মহারাণী হইবার উপযুক্ত নয়, দেখিতেও সুন্দরী নয়, লেখা পড়াতেও তেমন শিক্ষিতা নয়।" কিন্তু স্বয়ং ছোটলাট সাহেব যখন বলিলেন, "রাজাকে আমরা যথাসম্ভব শিক্ষিত করিয়া তৈয়ার করিয়াছি, আপনার কন্যাকে দিলে রাজ্যের সমাজসংস্কার ও শিক্ষার উন্নতিসাধনে যথেষ্ট সহায়তা করা হইবে। আর অনুষ্ঠান আপাততঃ বাগ্‌দান মাত্র হইবে এবং অপৌত্তলিক ভাবে আপনি যেমন বলিবেন, তেমনি হইবে। তাহা ছাড়া তিন আইন এ স্বাধীন রাজ্যে প্রযুজ্য নয়, সুতরাং বয়সের আপত্তি কোন কার্য্যকারী নয়।" তিনি রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণকে দিয়াও লিখাইলেন, "আমি চিরদিন বহু বিবাহের বিরোধী, আর অন্তরে আমি একমাত্র ঈশ্বরবিশ্বাসী।"

ইহাতেই ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আদেশ অনুভব করিয়া, শ্রীকেশবচন্দ্র বিবাহে সম্মতি দান করেন। বাগ্‌দান অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে অপৌত্তলিক ভাবে সম্পন্ন হইবে, ইহাও রাজার পুরোহিত ও রাজকর্ম্মচারিগণ থাকিয়া নির্দ্ধারিত হয়। রাজা স্বয়ং আসিয়া পাত্রী দেখিয়া পছন্দ করেন ও উপঢৌকন দান করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে কতিপয় ব্রাহ্ম বিবাহে আপত্তি তুলিয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত করেন। এমন কি, ছাত্রগণকেও উত্তেজিত করিয়া বিরোধী দলভুক্ত করেন।

এই সময়ে আমরাও ঈশ্বর-প্রেরণায় এক দল যুবা মিলিয়া, বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিয়া, শ্রীকেশবচন্দ্রকে অভিনন্দন প্রদান করি। ধন্য ঈশ্বর, সেই উপলক্ষেই আমরা তাঁহার স্নেহকটাক্ষে নববিধানের আশ্রয়ে স্থান লাভ করি।

কর্ত্তৃপক্ষগণ দেওয়ানের উপর বিশেষ ভার দেন নাই, তাই দেওয়ান রাজমাতাদিগকে উত্তেজিত করিয়া বাগ্‌দান সম্পাদনে নানা প্রকার গোলমাল বাধাইবার চেষ্টা করেন। এমন কি, মেয়েকে রাজবাড়ীতে লইয়া গিয়া, জোর জবরদস্তি করিয়া পৌত্তলিক মতে অনুষ্ঠান করিবার ষড়যন্ত্র করেন। এ দিকে দৃঢ়সংকল্প শ্রীকেশবচন্দ্র তাহাতে কিছুতেই সম্মত নন। বিবাহ-প্রস্তাব ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল। রাত্রি ১২টা বাজিয়া গেল, এমন সময় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ নিজে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি এখন নিদ্রা যাইব, যদি এই পাত্রীর সঙ্গে বিবাহ হয়, আমার ঘুম ভাঙ্গাইও; নতুবা আমার ঘোড়া সাজাইয়া প্রত্যূষে রাখিও, আমি একেবারে কোচবিহার থেকে চির বিদায় লইব। আমি এই মেয়ে ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিব না।" অপর দিকে সুনীতি দেবীও ভগ্নীদের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলেন, "এই রাজা বিনা আর কাহাকে বিবাহই করিব না।"

সেই গভীর রাত্রে ড্যাল্‌টন সাহেব কেশবচন্দ্রের নিকট গিয়া বলিলেন, লাট সাহেব তার করিয়াছেন, কলিকাতায় যে পদ্ধতি স্থির হইয়াছে, সেই পদ্ধতি অনুসারেই বাগ্‌দান হইবে, অন্যরূপ হইবে না। ইহাতেই রাজপুরোহিতগণের উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ অপৌত্তলিক ভাবে বাগ্‌দান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রদ্ধাস্পদ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় উপাসনা করেন এবং শ্রীকেশবানুজ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন কন্যাকে সম্প্রদান করেন। এই বাগ্‌দানের পূর্ব্বে এই সময়ে কন্যাকে দীক্ষাদানকালে আচার্য্যদেব বলেন, "আমি রাণী চাই না, আমি চাই ঈশ্বরের দাসী, তাঁকে ভিন্ন আর কাহাকেও পূজা করিবে না।" এই অনুষ্ঠানের পর শ্রীমতী সুনীতি দেবী পিতৃভবনে দুই বৎসর কাল কুমারী ভাবেই থাকিয়া সুনীতি ও সুশিক্ষা লাভ করেন। রাজা বিলাতে গিয়া শিক্ষার পূর্ণতা সম্পাদন করেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা করিয়া, শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ ও সুনীতি দেবীর উদ্বাহানুষ্ঠান নববিধানানুসারে দৃঢ়ীভূত করা হয়। এখন হইতেই তাঁহারা উদ্বাহিত জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম বিবাহবাসরকাল তাঁহারা বর্দ্ধমানে গিয়া যাপন করিয়া আসেন।

বিবাহের পর কতই সুখে স্বচ্ছন্দে সৌভাগ্যে উভয়ে রাজৈশ্বর্য্য সম্ভোগ করেন। প্রথম রাজকুমার রাজরাজেন্দ্রনারায়ণের জন্ম আচার্য্যদেবের দেহে অবস্থান কালেই হয়। শিশু জন্ম গ্রহণ করিলে তিনি আনন্দে শঙ্খবাদন করেন। এই উপলক্ষে কতই উপঢৌকন বিতরণ হয়। শ্রীমন্মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যাভিষেক উৎসবও কুচবিহারে মহাসমারোহে সম্পাদিত হয়। তখন আচার্য্যদেব অসুস্থ ছিলেন, তাই যাইতে পারেন নাই। শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণবিহারী সেন ও প্রচারক মহাশয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ গিয়া অভিনন্দন দান করেন।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবও নবদেবালয়ে প্রার্থনা করিলেন :—দীন দয়াল, ক্ষুদ্র বীজ হইতে কত বড় গাছ হইল। কাহার সঙ্গে কাহার মিলন হইল। প্রাণের ভিতর বিশ্বাস করিতেছি, তোমার বিধি পূর্ণ হইল। আমার কন্যা নয়, তোমার সমাজের কন্যা, প্রেরিত দলের কন্যা; তুমি যখন বলিলে চাই, তখন আর কিছু শুনিলাম না, বিপদের মধ্যে অন্ধকারে সেই কন্যাকে ফেলিয়া দিলাম। তুমি যখন চাহিলে, বলিলে, আমি বিহারে অমৃত ঢালিব, আমি বঙ্গ দেশের দুই শাখায় বিবাহ দিব, কন্যা দাও, আমি নবরক্ত দিয়া নব হস্তে এই বিহারকে নির্ম্মাণ করিব। আমি একদিনের জন্য মনে করি নাই, সম্পদ মান ঐশ্বর্য্যের জন্য দিয়াছি। আমি তোমার অনুজ্ঞা পালন করিলাম। সুনীতির সহিত সুনীতি আলোক এবং পরিত্রাণ কোচবিহারে প্রবেশ করিবে। কুচবিহারের উপর স্বর্গের পুষ্পবর্ষণ হউক।"

(ক্রমশঃ)

দীন সেবক—প্রিয়নাথ মল্লিক।

স্মৃতি-তীর্থে ভগিনীর ভক্তি-অশ্রু।

দিদি, তুমি চলিয়া গিয়াছ! এ কথা যে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। সংবাদ আসিল, কম্পিত ও মর্ম্মাহত হইলাম! ছুটিয়া গেলাম, আর কি দেখিলাম, তুমি তখন নির্ব্বিকার অনাসক্ত হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছ। তোমার পবিত্র সুন্দর উজ্জ্বল মূর্ত্তি স্থির প্রশান্ত। সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলাম, দিদি, আমি আসিয়াছি, একবার চক্ষু উন্মীলিত কর, কথা বল। হায়! তুমি যে তখন এই নশ্বর জগৎ হইতে সেই অবিনশ্বর জগতে প্রস্থান করিয়াছ। পুণ্যধামের পবিত্র উজ্জ্বল আলোক তখন তোমার সম্মুখে; অশ্রুভারাক্রান্ত কাতরপ্রাণে তোমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তুমি যে তখন আমায় বলিলে, "এ পৃথিবীর দেখা শোনা, কথা বলা আমার শেষ হইয়াছে; এখন স্বর্গের দিকে তাকাও, অমরধামে অমরাত্মাগণের ভিতর পরম জননীর কোলে আমায় দেখ, স্বর্গের পুণ্যময় কাহিনী ও মধুর বার্ত্তা সকল শ্রবণ কর।" বাস্তবিক প্রাণ আশ্বস্ত হোল। প্রাণের ভিতর দিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম। যতক্ষণ অবসর পাইলাম, কাছে থাকিলাম, অনিমেষনেত্রে তোমার সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। স্বর্গের শোভা অপরূপ দৃশ্য দেখিলাম, কৃতার্থ হ'লাম।

হায়! দিদি, তুমি চলিয়া গিয়াছ? এ পৃথিবীতে আর কোথাও তোমায় খুঁজিয়া পাইব না? সেই মিষ্ট মধুর আহ্বান ও কথা শুনিব না? এ কথা যে ভাবিতে পারিতেছি না, প্রাণ ফাটিয়া চোখের জলে ভাসিতেছি।

পুণ্যবতী সতী পতিব্রতা, ভক্তকন্যা তুমি; সেই আচার্য্য শ্রীব্রহ্মানন্দদেবের শিক্ষা দীক্ষা তোমার জীবনের ব্রত ও সাধনা ছিল। বিধাতার বিধানে সেই মহা আদেশ তুমি কুচবিহারাধিপতি মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সহিত পরিণীতা হইয়া রাজরাণী মহারাণী হইয়াছিলে। দিদি, তুমি জীবনের সে অধ্যায় কিরূপ মহানুভাবে সম্পন্ন করিয়াছ, তাহা যাহারা দেখিয়াছে, সম্ভোগ করিয়াছে, তাহারাই বুঝিয়াছে, জানিয়াছে। সেই ভাব হৃদয়ে লইয়া ধনী নির্ধন, দীন দুঃখী, সকলকে কিরূপে প্রতিপালন করিয়াছ, স্নেহ ভালবাসা দিয়া কৃতার্থ করিয়াছ, তাহা আর কি বলিব। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই মহান্ আদেশ পালন, কর্ত্তব্য সাধন করিয়া চলিয়া গিয়াছ। তোমার জীবনের পুণ্য কীর্ত্তি ও সাধনায় তুমি এ জগতে অমর হইয়া থাকিবে।

দিদি! তুমি রাজরাণী মহারাণী হইয়া শেষে তপস্বিনীর জীবনও দেখাইলে, আদর্শ হইয়া থাকিলে। ক্ষুদ্রপ্রাণ আমরা যেন সংসারের সুখ দুঃখ পরীক্ষার মধ্যে তোমার জীবন আদর্শ করিয়া, তোমার পদানুসরণ করিয়া চলিয়া যাইতে পারি। তুমি সেই তপস্বিনী মীরাবাইর জীবনের বিষয় কথকতা করিতে বড় ভাল বাসিতে। তোমার মুখে কতবার সেই তপস্বিনীর জীবনের কথা শুনিয়াছি, কত ভাল লাগিত, কত তৃপ্ত হইয়াছি। তোমার জীবনখানিও সেই মীরাবাইর জীবনে পরিণত হইয়াছিল।

দিদি! আজ এই বিগলিত অশ্রুজলের ভিতর সেই বাল্য জীবনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে। সেই কলুটোলার বাড়ীতে আমাদের মিলন, সেই পঠদ্দশায় স্কুলে একাসনে সমপাঠিনীরূপে মিলন; তাহার পর তুমি আমাদিগকে কুচবিহারে লইয়া গিয়া, তোমার সাধের সুনীতি কলেজে এবং উপাসনা-মন্দিরে মিলিত হইলে। তাহার পর সেই কুচবিহারে মহা-তপস্বিনী সন্ন্যাসিনীর ন্যায় রাজর্ষির পবিত্র সমাধিতে বসিলে, তাহাও দেখিতে দিলে। বোধ হয়, তাহাতেও তোমার সাধ পূর্ণ হয় নাই; শেষে তুমি আমাদের দেখিবার জন্য এই সুদূর প্রান্তর-স্থিত পার্ব্বত্য রাঁচি নগরে আসিয়া, নীরব গৃহে তোমার নীরব মূর্ত্তি দেখাইলে! তোমার নববিধানের নবোন্মেষ ও নব সাধনা আমাদিগকে ও রাঁচিবাসী নরনারীকে দেখাইয়া দিলে! তোমার সাধ তুমি পূর্ণ করিলে। কিন্তু আমাদের অশ্রুজল চিরদিনের জন্য রহিয়া গেল। পবিত্র স্রোতঃশীলা সুবর্ণরেখার অববাহিকায় তোমার জীবনের স্বর্ণরেণু চিরদিনের জন্য তোমার অমর জীবনকে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবে। এ রেণু আমাদের হৃদয়ে, কলিকাতায় আচার্য্যদেবের পবিত্র সমাধিতীর্থে অমর স্থান পাইল; এবং ভবিষ্যতে কুচবিহারে রাজর্ষি নৃপেন্দ্রনারায়ণের পূত ভস্মে মিলিত হইয়া নবীন ত্রিবেণীতে পরিণত হইবে!

দিদি! তোমার প্রিয় আর্য্যনারীসমাজ, দেখ আজ তার কি অবস্থা। মর্ম্মাহত হইয়া অশ্রুজলে প্লাবিত। প্রাণের প্রিয় ব্রহ্মমন্দির, অমন উপাসিকা সাধিকা আর কোথায়? হায়! আজ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ ও মণ্ডলী শোকাচ্ছন্ন। এ অভাব পূর্ণ হইবে না। তুমি তোমার জীবনের ব্রত সাধন ও ভগবানের ইচ্ছা পালন করিয়া অমরলোকবাসী হইয়াছ।

যাও, দেবী! যাও, সেই অমরধামে, নিত্যনববৃন্দাবনে, নিত্য লীলাদরশনে। সেথানে শ্রীব্রহ্মানন্দ সনে শ্রীহরির গুণ-কীর্ত্তনে তৃপ্ত হও, চির শান্তি সম্ভোগ কর।

আমরা আজ স্বর্গধামে তোমার পুণ্যমূর্ত্তি দর্শন করি, স্নেহময় পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে লইয়া প্রাণের শ্রদ্ধাভক্তির পুষ্পাঞ্জলি চরণে অর্পণ করি, প্রণাম করি।

প্রার্থনা।

ঠাকুর! তোমার এ কোন্ লীলা! এথানে ভগিনীর নীরব মূর্ত্তি দেখিলাম! ভগিনীর সম্মুখে দাঁড়াইলাম, ভগিনী আর কথা বলিলেন না। কাঁদিলাম, চক্ষের জল ফেলিলাম, কিন্তু সে নীরব মূর্ত্তির নিদ্রা ভাঙ্গিল না! পুষ্প পত্রে সজ্জিতা হইয়া কোথায় চলিলেন, তাহাও বলিলেন না। মনে হইল, দিদি কি নূতন কুচবিহারে নূতন হইয়া যাইতেছেন! এই নীরব যোগিনীর বেশ ধারণ করিয়া কি কুচবিহারবিবাহের পূর্ণতা সাধন করিলেন! সেই ত কুচবিহারে দেখিতাম যে, নীরব তপস্বিনীর

ন্যায় গৈরিক বসনে পরিহিতা হইয়া রাজর্ষির সমাধিপার্শ্বে স্তিমিত-নেত্রে বসিয়া থাকিতেন। তাহাতেই ভাবিতাম যে, প্রত্যাদিষ্ট ভক্তের প্রত্যাদিষ্টা কন্যা তোমার আদেশ পূর্ণ করিতেছেন। তাতে বুঝি হয় নাই। এইবার সেই আদেশপালনের পূর্ণতা দেখাইলেন। লীলাময় শ্রীহরি! সমস্তই তোমার লীলা। তোমার নবীন ভক্ত যে তোমাকে লীলাময় শ্রীহরি বলিয়া ডাকিতেন, তাই তুমি তোমার নব লীলা দেখাইয়া দিলে। তুমি আমাদের মত অল্প বিশ্বাসীর কাছে তোমার লীলাতত্ত্ব এইরূপে বুঝাইয়া দিতেছ। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

"জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে!
হোক তব ইচ্ছা পূর্ণ, শোক দুঃখের ভিতরে"।

সুমতি মজুমদার।

"ধর্ম্ম-সাধন"।

(আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের মতের আলোচনা)

৪৩ সংখ্যা—১লা চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪।

(গিরিদির ডাঃ ভি, রায় হইতে প্রাপ্ত)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রশ্ন—উপাসনার সময় মন স্থির হয় না কেন?

উত্তর—নানা লোকের পক্ষে নানা কারণ—কাহার ভাব নাই, কাহারও ততটা আন্তরিক ইচ্ছা নাই; কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে সংসারের কল্পনা ও ভাবনা প্রতিবন্ধক। উপাসনার সময় আমাদের মনের যে অবস্থা, তাহা তৎপূর্ব্ব অবস্থা সকলের ফল মাত্র বলা যায়। যে ব্যক্তি রাগী বা সর্ব্বদা সংসারচিন্তায় আকুল, উপাসনার সময়েও তাহার মনে রাগ ও সংসারের ভাব থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক। যদি কোন দিন না থাকে, তাহাতে কেবল ঈশ্বরের আশ্চর্য্য এই কৃপাই প্রকাশ পায় যে, তিনি অধম সন্তানকে ধরিয়া রাখিবার জন্য এক এক সময় প্রলোভন দেখান। অতএব সে প্রকার এক এক দিনের কথা ধরিয়া আমাদের জীবনের সাধারণ অবস্থার বিচার করা যায় না; তাহা কখন হইবে, কেন হইবে, কেহ জানে না। আমাদের সাধন যতদূর যায়, তাহাতে দেখা যায়, সমস্তদিন আমরা যে ভাবে জীবন কাটাই, উপাসনার সময় সেই ভাব হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া, ঈশ্বরদর্শনের বাধা জন্মাইতে থাকে। অতএব উপাসনার সময় মন স্থির করিতে হইলে, ভাল ভাবে জীবন কাটান আবশ্যক।

প্র—কি ভাবে প্রার্থনা করিলে যথার্থ প্রার্থনা হয়?

উ—প্রার্থনা যথার্থ ভাবে করিতে হইলে এই চারিটী কার্য্য আবশ্যক:—

১। অভাব জানা।
২। অভাবের জন্য ব্যাকুল হওয়া।
৩। ব্যাকুলহৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট চাওয়া।
৪। যাহা প্রার্থনা করা যায়, জীবনে তাহা অনুষ্ঠান করা এবং তাহার বিরোধী কার্য্য না করা।

প্র—অভাব জানা কিরূপ?

উ—যে অবস্থায় মনুষ্য কি চাহিবে জানে না, অথচ প্রার্থনা করে, সে অবস্থায় প্রার্থনা উপাসনার প্রতিবন্ধকতা করে। আমাদের জীবনে অভাব অনন্ত, অভাব নাই একথা বলা কেবল অজ্ঞানতা মাত্র। কিন্তু অনন্ত অভাব বলিয়া সাধারণ ভাবে 'আমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত কর, আমাকে পূর্ণ পবিত্র কর' এরূপ প্রার্থনা করিলে বিশেষ ফল দর্শে না। আমার জীবনের বিশেষ পাপ কি? বিশেষ অভাব কি? প্রত্যেকের অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাহা পরীক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। পরীক্ষা দ্বারা যাহা অবধারণ হইবে, তাহারই জন্য প্রার্থনা করিবে। এরূপ প্রার্থনার ফল প্রত্যক্ষ।

প্র—যথার্থ প্রার্থনার পরীক্ষা কি?

উ—যে পাপের জন্য প্রার্থনা করা যায়, তাহা নিশ্চয়ই কমিয়া যাইবে। ঈশ্বর এরূপ চিকিৎসক নন যে, রোগ চাপিয়া রাখিয়া ঔষধ দিবেন। সরল ভাবে যথার্থ রোগ জানাইলে, তিনি নিশ্চয়ই তাহার প্রতিকারের উপায় করিয়া দেন।

প্র—অভাবের জন্য ব্যাকুলতা সকল সময় হয় না কেন?

উ—অভাব যতদূর হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত, তাহা হয় না। আমার রাগ আছে, কিন্তু তাহা যে বিশেষ হানিকর, এরূপ বিবেচনা হয় না। সেই রাগ আবার অনেক সময় কর্ত্তব্যের পাগড়ী পরিয়া আইসে এবং শ্লাঘার হেতু বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু রাগ ইহার উগ্রতম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কত স্থানে কত ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটন করিয়াছে, তাহা মনে করিলে, আর ইহাকে কিছুতেই সামান্য বলিয়া তুচ্ছ করা যায় না। যাঁহার যে পাপ অধিক প্রবল, তিনি তাহার প্রবলতা এবং তজ্জনিত অনিষ্ট নিজের জীবনেই বিলক্ষণ জানেন। সুযোগ পাইলে তাহা তদপেক্ষা আরও কত প্রবল হইয়া, কত জঘন্য কার্য্য সংঘটন করিতে পারে, ইহা মনে করিলে নিজের পাপের জন্য ব্যাকুলতা না আসিয়া যায় না। স্থির ভাবে এইরূপ চিন্তা করিলে, জীবনের প্রকৃত অভাবের জন্য হৃদয় স্বতই ব্যাকুলিত হয়।

প্র—যাঁহারা নিজের বিশেষ অভাব বোধ করিতে পারেন না, তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য কি?

উ—যাঁহারা ধর্ম্মের উপদেষ্টা এবং মানবপ্রকৃতি উত্তমরূপে বুঝেন, তাঁহাদের নিকট গমন করা উচিত। সমহৃদয় ব্যক্তিগণের সহিত ধর্ম্মজীবন আলোচনা করিলেও, আপনার যথার্থ অবস্থা প্রকাশিত হয়।

প্র—আমাদের যে সকল দোষ কর্ত্তব্যের বেশ ধরিয়া আসিয়া শেষে সর্ব্বনাশ করে, তাহাদের প্রতিবিধানের উপায় কি?

উ—রাগ যদি আমার একটী দুর্দ্দান্ত রিপু হয়, একমাস কি

সাত দিনের জন্য এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, কোন কারণেই রাগকে মনে আসিতে দিব না। তজ্জন্য লোকের কাছে তাড়না, যন্ত্রণা ও অপমানও সহ্য করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। এরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক একদিন চলিতে পারিলেও উপকার দেখা যায়।

প্র—ঈশ্বরের নিকট অনুতাপ ও প্রার্থনা করিয়া হৃদয়ের পাপ গিয়াছে, এক সময় বোধ হয়; কিন্তু আবার সে পাপ জাজ্বল্যমান হইয়া প্রকাশ পায় কেন?

উ—আমাদিগের যত বয়োবৃদ্ধি হয়, আত্মার গঠন ততই দৃঢ়তর হইতে থাকে। পৃথিবী যেমন স্তরে স্তরে নির্ম্মিত হইয়াছে, আমরাও তেমনি কুঅভ্যাসের মধ্য দিয়া আসাতে পাপের এক এক স্তরে হৃদয় গঠিত হইয়াছে। আমরা এখন যে পাপের অবস্থায় আছি, যত্নপূর্ব্বক ঈশ্বরের নাম করিয়া তাহার স্তর কাটিলাম, মনে সুখোদয় হইল। কিন্তু পরক্ষণেই খনিত স্তরের নিম্নে আর এক স্তর দেখি এবং সাধন দ্বারা তাহাও দূরীকৃত করিলে, তন্নিম্নে অন্ততর স্তর দেখিয়া চমকিয়া উঠি। তাহা কাটিয়া নিম্নে আর এক স্তর, এইরূপ ক্রমাগত দেখিতে পাই। যতক্ষণ সকল স্তর কাটিয়া মন সম্পূর্ণ পরিষ্কৃত না হয়, ততক্ষণ হৃদয়ে পাপের রাজত্ব রহিয়াছে, নিশ্চয় জানিতে হইবে। খৃষ্টানেরা যে মনুষ্যের (absolute sin) পূর্ণ পাপ বলেন, তাহার মূল এখানে। এক দিনের জীবন ধর্ম্মস্রোতে ভাসিলে পাপের দাগ উঠে না। মুখের দুটা কথায় কি চির জীবনের পাপ যায়? এত পাপের স্তরে হৃদয় পাষাণের ন্যায় কঠিন হইয়াছে; ইহাতেও যে ঈশ্বর শান্তি আনন্দ দেন, সে তাঁহার কৃপাগুণে, আমাদিগের গুণে নয়।

প্র—আমরা যা প্রার্থনা করি, তা কি প্রকৃত ভাবে ঈশ্বরের নিকটে চাই?

উ—আমরা যে কথায় প্রার্থনা করি, ঈশ্বর সে কথা যেন ঠিক অর্থে না লন, মনে মনে ইচ্ছা করি। অনেক সময় পাছে তিনি প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া ফেলেন, এই ভাবিয়া ভয় হয় এবং প্রার্থনার ফল প্রদান বিষয়ে তাঁহাকে একটু বিলম্ব করিতে বলি। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি প্রার্থনা করিল বটে যে, 'হে ঈশ্বর! আমার বিষয়-বাসনা ধ্বংস কর, কিন্তু মনে মনে বলিল, আমি এখন তাহা ছাড়িতে পারিব না, অন্ততঃ কিছুদিন তাহার সুখ ভোগ করিতে দাও'। এইরূপ অসরল ভাবে আমরা প্রার্থনা করি বলিয়া, তাহার ফল দেখিতে পাই না। ইহা দ্বারা কেবল আপনাদের অপরাধের সংখ্যাই বাড়াইতে থাকি।

প্র—প্রার্থনার যথার্থ ভাব কি?

উ—শুনা যায়, মহম্মদের নিকট এক ব্যক্তি প্রার্থনা কি জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাকে জলে ডুবাইয়া ধরিলেন; সে প্রাণের দায়ে ধড় ফড় করিয়া উঠিলে বলিলেন, প্রার্থনার ভাব এই প্রকার। যথার্থ প্রার্থনা প্রাণের দায়, মুখের কথা নহে।

প্র—জীবনে প্রার্থনার প্রতিবন্ধকতা না করা কি প্রকার?

উ—প্রার্থনা করিলাম, আমি যেন মিথ্যা কথা না কই; কিন্তু বরাবর যেমন, এখনও তেমনি মিথ্যা বলিতে জিহ্বাতে বাধে না, ইহা হইলে প্রার্থনা কপটতা মাত্র। আমাদের সাধ্য যাহা, তৎসাধনে ত্রুটি করিলে ঈশ্বরের সাহায্য লাভ করা যায় না। অতএব প্রার্থনা অনুসারে প্রতিদিনের জীবনকে মিলাইয়া চলিতে হইবে।

প্র—ঈশ্বরকে কিরূপ ভাবিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে?

উ—ঈশ্বর আছেন—যথার্থ জীবন্ত এক ব্যক্তি সম্মুখে বর্ত্তমান, ইহা বিশ্বাস করিয়া দুটী কথা বলিতে পারিলেও প্রার্থনার কার্য্য হয়।

প্র—জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করা উচিত কি না?

উ—যদি কোন দেশে ধর্ম্ম বদ্ধমূল করিতে হয়, তাহা হইলে সে দেশের জাতীয় ভাব রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে দেশে প্রচার করিতে হইবে, সে দেশের লোকদের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, ক্ষমতা, অবস্থা, ব্যবহার, পূর্ব্বাপর ইতিবৃত্ত এ সকল অগ্রে বিচার করিয়া, প্রকৃত জাতীয় ভাব কি, এ সকল বুঝিতে হইবে এবং তাহা ধর্ম্মের সহিত সম্মিলিত করিতে হইবে।

প্র—প্রকৃত জাতীয় ভাব কি?

উ—কোন জাতীয় সামাজিক ব্যবহারাদি সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাহার কতকগুলি প্রকৃতিমূলক এবং কতকগুলি অভ্যাস বা সাময়িক মতমূলক। যাহা প্রকৃতিমূলক তাহা চিরস্থায়ী, তাহার সহিত সত্যের বিরোধ হয় না, তাহার অন্যথা করা উচিত নহে। যাহা অভ্যাস বা মতমূলক, তাহা সময়ের গতিতে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে; অনেক সময়ে সত্যের সহিত তাহার বিরোধ হয় এবং তাহার দোষগুণ বিচার করিয়া তাহার সংশোধন সংহরণ করা আবশ্যক। প্রকৃতিমূলক ভাব প্রকৃত জাতীয় ভাব।

প্র—সমাজে থাকিয়া এবং সমাজ ছাড়িয়া ধর্ম্মপ্রচার কাহাকে বলে? এবং তাহার ফলাফল কি?

উ—পৃথিবীতে কতকগুলি সমাজ আছে, যেমন হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি। হিন্দু সমাজের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। ইহাতে এত প্রকার বিবাহপ্রণালী আছে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার, কার্য্য ও ব্যবস্থা অনুসারে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এত মতামত আছে যে, তাহার মধ্যে কোনটী হিন্দু, কোনটী অহিন্দু, কেহ বলিতে পারেন না। এ সকলি জাতীয় বলিয়া গ্রহণ করা যায়। যখন এক সমাজের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া অন্য সমাজের ব্যবহার অবলম্বন করা যায়, তখনি জাতীয় ও বিজাতীয় বলিয়া প্রভেদ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি এরূপ করেন, প্রবল ধর্ম্মোৎসাহী হইলে তিনি অন্যের মন কথঞ্চিৎ আকর্ষণ করিতে পারেন; কিন্তু জনসমাজে সাধারণরূপে ধর্ম্মপ্রচারে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। আমরাও দেখিতে পাই, যাঁহারা জাতীয় ভাব

ছাড়িয়া ধর্ম্মের নামে বিজাতীয় আহার ব্যবহারাদি প্রথা অবলম্বন করেন, তাঁহাদের দ্বারা অন্যের উপকার হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাদের নিজের ধর্ম্মভাবও বিলুপ্ত হয়।

(ক্রমশঃ)

মাতৃ-তর্পণ।

(গত ১৬ই নবেম্বর, স্বর্গীয়া সরোজিনী চৌধুরীর সাম্বৎসরিক দিনে কন্যাকর্ত্তৃক পঠিত)

দু'বছর পরে আজ আবার সেই ৩০শে কার্ত্তিক আমাদের মনোমন্দিরে তার আসন পেতেছে। ১৩৩৭সনে ঠিক এমনই দিনে, আমাদের চট্টগ্রামস্থ গৃহপ্রাঙ্গণে প্রলয়ের বিষাণ বেজে উঠেছিল, আর সেই মহাপ্রলয়ের ভাঙ্গনের স্রোতে আমাদের মার অনন্ত যাত্রা সুরু হয়েছে। সেদিনও ইংরেজী ১৬ই নবেম্বর ছিল, রাত্রি ১০টার সময় তিনি আমাদের সকলকে শোকসাগরে ডুবিয়ে রেখে, অচিন পথের যাত্রীদের ভিড়ে মিশে গেলেন; ১৭ই নভেম্বর থেকে আর তাঁকে আমরা দেখ্‌তে পাইনি—তিনি তখন অজানাদের ভিড়ে হারিয়ে গেছেন।

মা আমাদের ছিলেন—প্রেম, ভক্তি, নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের প্রতিমূর্ত্তি। মা যখন উপাসনা করতেন, মুখে একটা গভীর পবিত্র ভাবের ছায়া ফুটে উঠত। সংসারে থেকেও সাংসারিক আবিলতার থেকে তিনি নিজেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখতেন। তিনি বেঁচে থাকতে এত গভীর ভাবে কোনও দিন তাঁকে ভাবিনি—আজ মায়ের আসনের অনেক উঁচুতে আমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছি।

প্রথম যখন অনুভব করলাম যে, আমরা মাতৃহারা—তখন মন চাইল, বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠতে; কিন্তু মার পূর্ণ বিশ্বাসের প্রভাব তখনও আমাদের বাড়ীর সীমানায় আবদ্ধ ছিল—তাই মার সমাধির কাছে গিয়ে যখন বস্‌লাম—তখন সুমহান্ বিশ্বনিয়ন্তার উদ্দেশে মাথা আপনিই নুয়ে গেল। বুঝলাম, তাঁর অমোঘ বিধানের উপর অভিমান করার চাইতে নির্ভর করার মধ্যে আছে সুগভীর শান্তি।

হে নিষ্ঠুর, এমনই করে' যুগে যুগে তুমি আঘাতের কষ্টিপাথরে তোমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে যাচাই করে নাও। তাই কঠিনতম সুরে তুমি মানুষের জীবনবীণায় ঝঙ্কার দিয়ে দিয়ে তার মনের ভুল ঘুচিয়ে দাও। আনন্দের দিনে মানুষ তোমায় ভুলে যায়; তাই তুমি অমানিশার অন্ধকারে, বজ্রের আগুনে, মানুষের মলিনতা পুড়িয়ে তাকে অনাবিল কর। ওগো নিষ্ঠুর, তাই তোমাকে প্রণাম করি।

প্রতি বৎসরই এই দিনটা ঘুরে ঘুরে আসবে। সবই আগের মত আছে—শুধু নেই আমাদের আরাধ্যা মাতৃদেবী। বছরের আর ক'টা দিন পার্থিব কোলাহলে কেটে যায়—কিন্তু আজকের দিনটায় তাঁর শত স্মৃতি শতভাবে মনে ভেসে উঠে। আমার মনে আছে—আমি যখন শুনেছিলাম—যে মার আর জীবনের আশা নেই—আমি মাকে জড়িয়ে বলেছিলাম—কেউ আমার মাকে নিতে পাবে না। মূঢ় আমি, জানতাম না যে, স্রষ্টার সৃষ্টিতে আমরা কত ছোট—আমাদের মোহাসক্তির মূল্য কত কম। এই নিখিল বিশ্বচরাচরে সবাই সবাইকে জড়িয়ে বলে, 'যেতে নাহি দিব'; কিন্তু হায়, সবাইকেই চলে' যেতে হয়, সবাই চলে যায়। স্নেহ মোহ ভালবাসা এ সকলের উপরে আছে এক অনুপম ইসারা, এক মুগ্ধ আহ্বান; সে ডাক যে দিন যার উদ্দেশ্যে আসে—তার কাছে এমন কোনও মায়া থাকে না, যা তাকে পেছনে টেনে রাখতে পারে।

মহাকালের রথ যে দিন যার দুয়ারে আসে—সে দিন সে তার সব ধন জন মান দূরে ফেলে দিয়ে, অনন্তের কোলে আশ্রয় পাবার জন্যে ছুটে যায়—আর বিশ্বনিয়ন্তার অমোঘ বিধানে এ রথ একদিন এসে সকলের দুয়ারেই থামে। রথচক্রধ্বনি থেমে গেল যখন, দেখি, আমাদের প্রিয়জন আর নাই, চারিদিকে হাহাকার শুনি—'নাই নাই নাই'—তখনই কে যেন কাণে কাণে বলে দেয়, নিশ্চয় আছে—তারাও তেমনি জগৎপতির চরণমূলে আছে—তাই ত কবি গেয়েছেন, "হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে, যাহা কিছু সব আছে আছে আছে।"

আজ এই বিধিনিবন্ধনের উপর একান্ত বিশ্বাস ছাড়া আর আমাদের সান্ত্বনার কোনও উপায় নাই—আজ একমাত্র তাঁরই চরণমূলে আত্মসমর্পণ ছাড়া আমাদের আর শান্তি নাই—তাই পরিপূর্ণ বিশ্বাসে, শোকসন্তপ্তচিত্তে আমরা এই প্রার্থনা করি, যেন স্বর্গগতা জননীর ছায়া হ'য়ে, আমরা তাঁর পদাঙ্কানুসরণ করতে পারি, তাঁর মত আমাদেরও যেন তোমার উপর অফুরন্ত বিশ্বাস থাকে; তবেই ত আমাদের এই মাতৃতর্পণ সার্থক হবে। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা তোমার চরণমূলে পৌঁছিয়া, আমাদের সকলের জন্যে তোমার মঙ্গলাশীর্ব্বাদকণিকা ব'য়ে আনুক। তোমারই উদ্দেশে আমরা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বারম্বার প্রণাম করি। তোমারই ইচ্ছা আমাদের জীবনে পূর্ণ হ'ক।

সাধনা চৌধুরী।

মানুষ চায় কি ?

(১০ই জুলাই, সন্ধ্যায়, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রদত্ত)

মানুষ চায় কি ? আমাদের আকাঙ্ক্ষা কি ? এই প্রশ্ন পৃথিবীর আদিকাল থেকে আসছে। পৃথিবীর আদিকাল বলতে আমরা কি বুঝি ? কতকাল হ'ল ইহার সৃষ্টি হয়েছে, কেউ কি সঠিক বলতে পারেন ? এমন কত পৃথিবী আছে, তাই বা কে জানে ? ঐ সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহের নাম ক'টা আমরা জা[illegible] মাত্র,

তাদের সম্বন্ধে বেশী কিছু জানিনা। এমন কত সৌরজগৎ থাকতে পারে। শুনেছি, এমন সব তারা, নক্ষত্র আছে, যাদের আলো এখনও এ পৃথিবীতে এসে পৌঁছোয় নি। পৃথিবীর আদিকাল মানে অনাদিকাল। তবে বলতে পারা যায়, মানুষের সৃষ্টির সময় থেকে এই কথা চলে আসছে। তাই বা বলি কি করে'? কত দিন হ'লো মানুষের সৃষ্টি হয়েছে, কেউ কি ঠিক করে' বলতে পারেন। সব প্রথমেই কি মানুষের এই রকম উন্নত অবস্থা ছিল? বর্ত্তমান সময়ের মত মনের উৎকর্ষ হয়েছিল? আশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে' তবে মানব-জন্ম লাভ হয়েছে—যদি এ কথা সত্য হয়, তা হলে আদিম মানব যে জ্ঞান-বুদ্ধি-নীতি-ধর্ম্ম-সম্পন্ন, খুব উন্নত ছিল, তা সম্ভবপর নয়। অভিব্যক্তিবাদের নিয়মানুসারে তার দেহের গঠন যেমন ক্রমশঃ বর্ত্তমান আকার পেয়েছে, তার মনও তেম্‌নি ক্রমশঃ উন্নত হয়েছে ও আলোক লাভ করেছে; ব্রহ্মমনন ও চিন্তন করতে শিখেছে। সে যা চায়, যা হ'লে তার আকাঙ্ক্ষা মিটে, তারই অন্বেষণে ছুটেছে।

বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা, ভাগবত প্রভৃতিতেও এই কথার তোলাপাড়া হয়েছে। হিন্দুশাস্ত্রকারেরাও, মানুষের মনের ভিতর একতীব্র উদ্বেগ, উদ্দাম চঞ্চলতা, ভীষণ অস্থিরতা, দারুণ পিপাসার বিক্ষোভ ও আবেগ কার্য্য করছে, লক্ষ্য করেছেন ও তার আলোচনাও করেছেন। শ্রীবুদ্ধদেবও, "জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই, কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই" এই রোল সারা মানবকুল হ'তে সদাই উঠছে শুনতে পেয়ে, তার প্রতিকারের জন্যে তপস্যায় মগ্ন হয়েছিলেন। মহর্ষি ঈশাও তাঁর অনুচরগণের মনের চঞ্চলতা দেখে বলেছিলেন, "Why take ye thought for the morrow." শ্রীচৈতন্যদেবও জীবের এই দুঃখ, কষ্ট, দেখে', ছটফট করে বেড়িয়ে ছিলেন, তার নিবারণের জন্যে কেঁদেছিলেন। জীবের এই জ্বালা, তাপ, দাহ কিসে যায়? তার ঔষধ কোথায়? সেই জিনিষটি খুঁজে বার করবার জন্যে, সেটি পাবার জন্যে, ভগবান্ তাকে এ সংসারে পাঠিয়েছেন। জীবের জীবনের নির্ম্মিতই তাই। সে যা চায়, তাই তাকে পেতে হবে, তাই তাকে হতে হবে। কত যুগ যুগান্তের সাধনার ফলে, এই দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করে', তাকে সার্থক করতেই হবে, তাতে সোণা ফলাতেই হবে।

মানুষ চায় সুখ, মানুষ চায় শান্তি। মানুষ চায় আরাম, মানুষ চায় তৃপ্তি। মানুষ চায় আনন্দ, মানুষ চায় অমৃত। জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর অধীন এই মানবজীবন, বাসনা, কামনার অনলে দগ্ধ এই জীব, ত্রিতাপজ্বালায় জর্জ্জরিত হ'য়ে কেবল আর্ত্তনাদ করে, "কোথা শান্তিদাতা, কোথা শান্তিধাম, তাপিত হৃদয়ে কর হে শান্তি দান"। কিন্তু তার সুখ, শান্তির পরিমাণ কত, মাপ কত? অল্পে কি সে তুষ্ট হয়? অল্পে কি তার বাসনা কামনা মিটে, অল্পে কি তার সাধ পুরে? "ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি" এই তার বাণী। নিঃস্ব শতটাকা চায়, শতটাকা হ'লে হাজার টাকা চায়, হাজার টাকা হলে লক্ষ টাকা, লক্ষ টাকা হলে কোটি টাকা, কোটীশ্বর ক্ষিতিপতি হতে চায়, ক্ষিতিপতি চক্রেশ্বর, চক্রেশ্বর ইন্দ্রত্ব, ইন্দ্র শিবপদ, শিব বিষ্ণুপদ চান—এই রকম আশা কারু মিটে না। আগুনে ঘৃতাহুতির মত আশা আকাঙ্ক্ষা শুধু বেড়ে যায়। পাশ্চাত্য জগতে, ইউরোপ ও আমেরিকায়, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, তৃষ্ণা, অভাবকে বাড়িয়ে তুলে, সেখানে কি ভীষণ অশান্তি, কাটাকাটি মারামারির সৃষ্টি করেছে। আবার মহাসমরানল প্রজ্জ্বলিত হবার যোগাড় হচ্ছে। সেখানকার নরনারী শান্তিকে কোণঠাসা করে, একপাশে সরিয়ে রেখে, অনন্ত কর্ম্ম-কোলাহলে প্রমত্ত। প্রাচ্য তপোবনের মুনি ঋষিরা কেবল সন্তোষ, শান্তি, আনন্দ, অমরত্বের অন্বেষণ করেছেন। দেবতারা সাগরমন্থনে উত্থিত সুধার ভাগ নেবার জন্যে প্রাণপণে ছুটেছেন। তাঁরা চান, স্থিরতা, নিশ্চিন্ততা, বিরাম, শান্তি। তাঁদের শেষ কর্ত্তব্য বানপ্রস্থ অবলম্বন করা, সব বাসনার আগুনে জল ঢেলে দিয়ে নির্ব্বাণ লাভ করা। "বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাম্ যোগেনান্তে তনুত্যজাম্" এই ছিল তাঁদের লক্ষ্য, আদর্শ। "সত্যং শিবং সুন্দরং রূপং ভাতি" হৃদিমন্দিরে এই ধ্যান করতে করতে সত্যশিব-সুন্দর ভগবানকে লাভ করা ছিল সাধনা। "এবার অমর হব, এমনি রব, দয়াল হরির চরণ ধরে' এই ছিল প্রার্থনা। কিন্তু নব-বিধান বিরামদায়িনী নিশ্চেষ্টতাকে, কাপুরুষোচিত কর্ম্মত্যাগকে প্রশ্রয় দেন না। নববিধানাচার্য্য অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন. সকলকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিতে বলেছেন। অন্তহীন কর্ম্মোৎসাহে অগ্রসর হ'তে বলেছেন। কিন্তু এই কর্ম্ম বিধাতা কর্ত্তৃক নিয়োজিত কর। যাকে যে কাজের জন্যে তিনি পাঠিয়েছেন, তাকে সেই কাজ করতে হবে। ভাবনা করা চলবে না, ভাবনা করা চলবে না। এই কর্ম্ম কিন্তু ফলকামনাশূন্য হবে, কর্ম্মে আমাদের অধিকার, কর্ম্মফলে নয়। কর্ম্মফল বিধাতার হস্তে। "কর্ম্মভূমিরিয়ং ব্রহ্মন্ ফলভূমিরসৌ মতা।"—"হে দ্বিজ, এটি কর্ম্মভূমি, ওটী (পরলোক) ফলভূমি জানিবে।" ফল বিচার করে কর্ম্ম করা চলবে না। কে কি কাজের জন্যে প্রেরিত, কার জীবনে ভগবানের কোন অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে, তা তিনিই জানেন। ঈশার ক্রুশে আত্মবলিদানের ফলে তাঁর পুনরুত্থান, অক্ষয় স্বর্গলাভ, অনন্তকাল রাজত্ব। সে ত মৃত্যু নয়, সে যে নবজীবন-লাভ। বিধাতার ইচ্ছানুসারে, মানুষের ইচ্ছানুসারে নয়। মানুষের জন্মপত্রিকার, কোষ্ঠীর ফলাফল বিধাতাপুরুষ আপনার হাতে নিজে লিখে দিয়েছেন। সার্থক জন্মলাভের উপায়, সুযোগ, সুবিধাও তাকে দিয়েছেন। যারে তিনি তাঁর পতাকা দেন, তারে বহিবারে দেন শকতি।

মানুষ সুখ চায়, শান্তি চায়; কিন্তু কোথা সুখ, কোথা শান্তি? কি করলে, কোথা গেলে, সুখ, শান্তি, আরাম, তৃপ্তি, নির্ব্বাণ

ও আনন্দ পাওয়া যায়? কোন্ পথে গেলে তার কাম্য বস্তু মিলে? শাস্ত্রকারেরা, সাধু ভক্তগণ, ভগবান্ নিজে এই কঠিন সমস্যার সহজ মীমাংসা করে দিয়েছেন। বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ, সকল ধর্ম্মশাস্ত্র, সব সাধু ভক্তের জীবন শুধু এই কথাই বল্‌ছে, "কি সুখ জীবনে মম, ওহে নাথ দয়াময় হে, যদি চরণসরোজে, পরাণ-মধুপ চিরমগন না রয় হে।" শ্রীহরির চরণপল্লবে আশ্রয় ভিন্ন সুখশান্তিলাভের অন্য পথ নেই। "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়"। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অর্জ্জুন, ঈশা, নানক, চৈতন্য, কেশব, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি ভক্তগণ সেই পদপল্লবে একান্তে আশ্রয় চেয়েছিলেন এবং শ্রীহরিও তাঁদের তাঁর সুখপ্রদ, শান্তিপ্রদ মুক্তিপ্রদ, অভয় পাদপদ্ম দান করেছিলেন। ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু, "পদ্ম-পলাশ-লোচন হরি" ভক্তকে আর কিছু দেন না, শুধু সব বাসনা কামনার তৃপ্তিকর তাঁর শ্রীচরণকমল দেন। ভক্তও বলেন, "আর কিছু ধন চাইনা, ঠাকুর, শুধু শ্রীচরণের ভিখারী।" একজন ভক্ত আর একজন ভক্তকে বলেন, "যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মাননা মণি, তাহারি খানিক মাগি আমি নতশিরে।" এই জন্যেই মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে বলেছিলেন, "যাতে অমর হ'তে পারবো না, সে ধন নিয়ে আমি কি করবো?" মানবজীবনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য হচ্চে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া।

ধ্রুব যে কঠোর তপস্যা করে "পদ্মপলাশলোচন হরিকে" পেয়েছিলেন, তাঁর সম্বল কি ছিল? প্রহ্লাদ যে আগুনে, জলে, সাপের মুখে, হাতীর পায়ের তলায় পড়ে মরেন নি, তার গূঢ় কারণ কি? তার নিবিড় সঙ্কেত কি? তাঁদের কি ছিল, যা আমাদের নেই? তাঁদের ছিল প্রকৃত বিশ্বাস, অনন্ত বিশ্বাস। যে বিশ্বাস পর্ব্বতকে স্থানান্তরিত হ'তে বল্‌লে, সে স্থানান্তরিত হবে। যে বিশ্বাস অসাধ্য সাধন করে, অলৌকিক শক্তি লাভ করে, মরণকে জয় করে, পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করে। যে বিশ্বাসে অন্ধ চক্ষু পায়, বোবা গীত গায়, খঞ্জ হেঁটে যায়, বধির শুনতে পায়, অমানিশায় চন্দ্রোদয় হয়। যে বিশ্বাস কত অজানারে জানিয়ে দেয়, কত পরকে আপনার করে, দূরকে নিকট করে, সারা বসুধাকে কুটুম্ব করে, পরার্থে জীবন সমর্পণ করে, আশ্রিতকে বাঁচাতে গিয়ে গায়ের মাংস কেটে দেয়। যে বিশ্বাসে ভোরের পাখীর ডাকে বিশ্বজননীর সাড়া পায়, ফুটন্ত ফুলের মাঝে মায়ের হাসি দেখতে পায়, প্রভাতের কনক রবিকিরণে তাঁর রূপের ছটার প্রকাশ দ্যাখে, তটিনীর সুমধুর কল্লোলে তাঁর ললিত রাগিণী শোনে, সুখময়ী ঊষার আগমনে প্রাণের দুয়ার খুলে, মধুর সঙ্গীত তুলে, তাঁকে অভিবাদন করে। এ সেই বিশ্বাস, যে বিশ্বাস নায়েগ্রা জলপ্রপাতের অবিরাম ধারায় নিপতিত বালারুণরাগের অপূর্ব্ব খেলা ও মনোহর ইন্দ্রধনুর সৃষ্টির ভিতর বিধাতার অসীম সৌন্দর্য্য ও মহিমা প্রকাশ দ্যাখে এবং নতজানু হ'য়ে উপাসনায় নিরত হয়, অভ্রভেদী, তুঙ্গ গিরিশিরে নির্ম্মল, শুভ্র, স্থির, সুধাধবল, রজতাভ তুষাররাশির মাঝে বসে', শীতাতপ তুচ্ছ করে', যুগযুগান্তর ধরে তপোময় থাকে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ভুলে গিয়ে, রৌদ্রতাপে তাপিত হয়ে, নৌকার ছাদের উপর সারাদিন সমাধিমগ্ন থাকে। যে বিশ্বাসে নবভক্ত, গভীর বেদনায় প্রাণ করে যেন আনচান্, তবু যোগানন্দরসে মগ্ন রয়েছেন। কোথা মৃত্যু, কোথা রোগ, নিরালম্ব ব্রহ্মযোগ, সশরীরে স্বর্গভোগ করে', হাসতে হাসতে অমর ভবনে চলে গেলেন।

আমাদের কি সে বিশ্বাস আছে? আমরা কি বল্‌তে' পারি, "We walk by faith, not by sight". সেইটিই ত আমাদের অভাব, সেই জন্যই ত আমাদের এত দুঃখ, কষ্ট, দুর্দ্দশা। স্বর্গীয় আচার্য্যদেব প্রকৃত বিশ্বাসের কি কি লক্ষণ বলেছেন? একটা লক্ষণ হচ্চে:—"Faith rejoiceth in the All-Blissful God, findeth joy immeasurable in His service." বিশ্বাস আনন্দময় ঈশ্বরকে পেয়েই পরিতুষ্ট হয় এবং তাঁর সেবায় অপরিমিত আনন্দ উপভোগ করে। তার মন ব্রহ্মপদে, তার হস্ত ব্রহ্মের কাজে, ব্রহ্মের সেবায়। অতএব এই অনন্ত বিশ্বাস সাধন করা চাই। চিন্তায়, বাক্যে, ব্যবহারে, কাজে, বিশ্বাসীর পরিচয় দেওয়া চাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের গোড়ার কথাই, "বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলম্ হি।" অনন্ত বিশ্বাসেই দেবতার উজ্জ্বল প্রকাশ। নববিধান কি? এই বিশ্বাসের উজ্জ্বল আলোক, নবজীবনলাভের নবশক্তি, শান্ত, নিশ্চল, অগাধ, আনন্দের অনন্ত উৎস। আচার্য্যদেব বলেছেন, "নববিধানে আমরা আছি, দুঃখে নয়, সুখে আছি।" মঙ্গলময় আজ আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন প্রকৃত বিশ্বাসের অধিকারী হই এবং প্রকৃত সুখ, শান্তি, আনন্দ লাভ করে' জীবন সার্থক করি। আর বলি, "ধন্য সে মানব অতি ভাগ্যবান, তোমার হাতে যার আছে যে পরাণ, সুখী তার হৃদয় নিশ্চিন্ত নির্ভয়, লয়েছ যার সকল ভার (তুমি নিজে)।" এবং উত্তর পাই, "শান্তিং তে পরমামাশু লভস্বে নাত্র সংশয়ঃ।"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

—•—

স্বর্গীয়া মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবীর উদ্দেশে।

কোচবিহার—শোক-সভাঃ—স্বর্গগতা মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত, গত ৪ঠা ডিসেম্বর, অপরাহ্ণে, কুচবিহার ল্যান্সডাউন হলে, একটা শোকসভার অধিবেশন হইয়াছিল। রাজসভার সহকারী সভাপতি মাননীয় লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল, কে,এ,ডি, ইভান্স গর্ডন, আই,এ, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নগরের জমীদার, তালুকদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, উকীল ও রাজকর্ম্মচারী সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিগণের দ্বারা এই সভা আহূত হয়। সর্ব্বশ্রেণীর

রাজকর্ম্মচারিগণ ও যাবতীয় সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তিগণ সভায় যোগ দান করিয়াছিলেন, কয়েকটী মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। আরম্ভে ও শেষে ২টী সময়োপযোগী সঙ্গীত হইয়াছিল এবং প্রারম্ভিক সঙ্গীতান্তে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রার্থনা করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকান্ত বসু মজুমদার, মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত এস্. এন্. গুহ এবং প্রফেসার অমূল্যরতন গুপ্ত মহারাণীর চরিত্রের ও কার্য্যাবলীর নানা অংশ বিবৃত করিয়াছিলেন। সভাস্থ সকলে গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মান হইলে শোকসহানুভূতিসূচক নির্দ্ধারণ গৃহীত হয়।

উপাসনা—বিগত ২৭শে নবেম্বর, রবিবার, কমলকুটীরের পবিত্র শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সহিত যোগরক্ষা করিয়া, কোচবিহার কেশব-আশ্রমে বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছিল। যাবতীয় উচ্চ রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ ও অন্যান্য অনেকে যোগদান করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ উপাসনার কার্য্য করেন।

সাহিত্যসভা—গত ১১ই ডিসেম্বর, কুচবিহার সাহিত্যসভায় গৃহীত নির্দ্ধারণ :—

"মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবী সি, আই, মহোদয়ার পরলোকগমনে কোচবিহার সাহিত্যসভার যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। সভার সৃষ্টির সময় হইতে ইহার প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং তাঁহার অর্থ ও গ্রন্থদানে সভা সমৃদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার মহাপ্রয়াণে কোচবিহার সাহিত্যসভা অন্যতম প্রধান সহায় হারাইয়া, ব্যথিতহৃদয়ে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্তপরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন।"

গরিফা—গত ৪ঠা ডিসেম্বর, অপরাহ্ন ৫টার সময়, এড্‌ভোকেট মিঃ পি, কে, রায়ের সভাপতিত্বে, গরিফা-নিবাসিগণের একটী সভায়, মহারাণী সুনীতি দেবী সি, আই, কুচবিহারের রাজমাতার পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য নিম্নলিখিত মন্তব্য একমতে গৃহীত হয় :—

করুণাময় জগৎপিতা তাঁহার বিশ্বস্তা পরিচারিকা শ্রীমতী সুনীতি দেবী সি, আই, কুচবিহারের রাজমাতা এবং "গরিফা কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা-সমিতির" অন্যতরা পৃষ্ঠপোষিকাকে বিঘ্নবাধাময় মর্ত্ত্য দেহবন্ধ হইতে মুক্ত করিয়া, তাঁহার আত্মার উপযোগী উচ্চতর লোকে তুলিয়া লইয়াছেন। সেহ নব নির্দ্দিষ্ট লোকে প্রবিষ্ট হওয়ার আনন্দ তিনি তাঁহার বিদায়সঙ্গীতে ও মধুর হাসিতে ব্যক্ত করিয়াছেন; তথাপি আমরা শোকার্ত্ত। গরিফা-নিবাসী ও সমিতির সভ্যবৃন্দ আমাদের এই শোক স্বার্থেরই জন্য দেহমুক্ত সেই অমরাত্মার জন্য নহে; আমরা যে দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার ন্যায় বন্ধু, উপদেষ্টা এবং সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যের, বিশেষতঃ তাঁহার জগদ্বিখ্যাত পিতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পুণ্যস্মৃতি সম্পর্কীয় কার্য্যের সহায় হারাইয়াছি, ইহাই আমাদের শোকের যথার্থ কারণ। যে উপাধিতে পরিচিতা হইতে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসিতেন, সেই "পরিচারিকা" সুনীতি দেবীর লোকান্তর গমনে আমাদের গভীর মর্ম্ম-বেদনা প্রকাশ করিতেছি। ভগবান্ তাঁহার লোকান্তরিত আত্মার শান্তি বিধান করুন এবং শোকার্ত্ত পরিজনবর্গের হৃদয়ে তাঁহার অশরীরী আবির্ভাব ভগবদিচ্ছায় আত্মসমর্পণপূর্ব্বক এই গুরু শোকভার বহন করিবার শক্তি প্রদান করুন।

ইহাও স্থির হয় যে, লোকান্তরিত মহারাণীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে তাঁহার আলেখ্য রক্ষা করা হইবে। এবং উহার ব্যয়ভার সমিতি চাঁদা তুলিয়া সংগ্রহ করিবেন, উহা প্রস্তুত হইলে কেশবচন্দ্রস্মৃতিমন্দিরে বিলম্বিত থাকিবে।

পরিশেষে স্থির হয়, উক্ত মন্তব্যের অনুলিপি তাঁহার পুত্র মহারাজকুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ ও অন্যান্য প্রিয় নিকটাত্মীয়ের নিকট প্রেরিত হইবে।

ঢাকা—বিগত ২৭শে নবেম্বর, রবিবার, বিধানপল্লীস্থ দেবালয়ে স্বর্গীয়া মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবীর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাদান উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সহ অনেকগুলি ভাই এবং ভগিনী উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধেয় ভাই মহিমচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করেন। শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায়, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু রাজকুমার দাস, সারদাপ্রসন্ন বাবু ও রমেশবাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন।

কুমিল্লা—গত ২৭শে নবেম্বর, অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্তের গৃহে উপাসনা হয়; তিনিই উপাসনা করেন।

লক্ষ্ণৌ—২৭শে নবেম্বর, লক্ষ্ণৌ অযোধ্যা ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত উপাসনা করেন।

বাঁকিপুর—গত ২৭শে নবেম্বর, বাঁকিপুরে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়; ডাঃ পরেশনাথ চাটার্জ্জি উপাসনা করেন।

রাঁচি—২৭শে নবেম্বর, নামকুমে, শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের গৃহে উপাসনা হয়; গৌরীবাবু উপাসনা করেন এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিশেষ প্রার্থনা করেন।

শোক-সহানুভূতি—কবীন্দ্র ডাঃ সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই চিঠিখানা আচার্য্যকন্যা শ্রীমতী মণিকা দেবীকে লিখেছেন—

কল্যাণীয়াসু—

মণিকা, হঠাৎ কাগজে তোমার দিদির মৃত্যুসংবাদ পড়ে ব্যথিত হয়েছি। মর্ত্ত্যলোকের দুঃসহ দুঃখভার তিনি ইহলোকেই বিসর্জ্জন দিয়ে চলে গেলেন, এইটাই সান্ত্বনার কথা। মৃত্যুকে যিনি সার্থক করেন, তিনিই তাঁকে গ্রহণ করেছেন, তিনিই তাঁকে শান্তি দিন, এই কামনা করি। ইতি। কার্ত্তিক, ১৩৩৯ সাল।

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে", বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ৪ঠা পৌষ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে॥

৬৭ ভাগ। ২৪শ সংখ্যা। | ১৬ই পৌষ, শনিবার, ১৩৩৯ সাল, ১৮৫৪ শক, ১০৩ ব্রাহ্মাব্দ। 31st December, 1932. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে জীবনের চির সুহৃদ্, চির সঙ্গী, চির সহায়, ইহকাল পরকালের একমাত্র গতি-মুক্তিদাতা পরম দেবতা! সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, জীবনে, মরণের প্রত্যেক স্তরে, জীবনের গতি-ক্রিয়ার বিশেষ বিশেষ স্পন্দনে, এ বৎসর তোমার সাক্ষাৎ ক্রিয়া যেরূপ অনুভব করিলাম, তোমার পরিচয় যেরূপ পাইলাম, তোমার সঙ্গ সহায়তার মহিমা গৌরব যেরূপ অনুভব করিলাম, জীবনের সকল শুভমুহূর্ত্তে তোমার প্রসাদ যেরূপ সম্ভোগ করিলাম, এমন আর কখনও আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এবার আমাদের বিধান-পরিবারে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর নির্ম্মম আঘাতে আমরা কত দুঃসহ যাতনা সহ্য করিয়াছি, বিচ্ছেদের দারুণ আঘাতে কত অন্তর্বেদনায় দগ্ধ হইয়াছি, পরীক্ষা বিপদে আপনাকে কত অসহায় অসঙ্গ মনে করিয়াছি, তাহা জানি; কিন্তু তুমি সকল মৃত্যুর ভিতরে আপনাকে অমৃতরূপে প্রকাশিত করিয়া, সকল বিচ্ছেদের মধ্যে স্বর্গের অনন্ত মধুর মিলন সংস্থাপন করিয়া, সকল পরীক্ষা বিপদে আপনি সাক্ষাৎ সহায় ও সঙ্গিরূপে প্রকাশিত হইয়া, জীবনের সকল অবস্থায়, ইহকালে পরকালে, তুমি আমাদের কত সহায়, কত আপনার, কত আত্মীয়, কত সম্বল ও সম্পদ্, তাহার কি পরিচয় দাও নাই? তোমাকে পাইলে সকলই পাই, যাহা হারাই তাহাও পাই, যাহা নাই তাহাও পাই। "কিনা পাই, নিরখিলে তোমায় হৃদি মাঝারে"। আমাদের জীবনের প্রতি ধাপে, প্রতি স্তরে, যদি তোমার সাক্ষাৎ ব্যবহার, আচরণ ও আত্মীয়তার ভিতর দিয়া, তুমি স্নেহময় পরম পিতা রূপে, নিত্য লীলাময়ী জননীরূপে এত পরিচয় দিলে, তবে আশীর্ব্বাদ কর, তোমার এই সাক্ষাৎ মধুময়, অমৃতময় লীলার স্মৃতি প্রাণে লইয়া, তোমাকে প্রাণের একমাত্র সহায় সম্বল জানিয়া, তোমার অযাচিত কৃপার দান, তোমার স্বর্গের বিশেষ আশীর্ব্বাদ যে মাঘোৎসব, তাহা সাধন করিতে, সম্ভোগ করিতে যেন অগ্রসর হই। তুমি আমাদের সহায় হও।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

নববিধানের মাঘোৎসব।

সময়-চক্র ক্রমাগত ঘুরিতেছে। সে অতি বিশ্বস্তভাবে, বিধানির্দ্দিষ্ট নিয়মে উৎসবের পর উৎসব লইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইতেছে। দীর্ঘ একটী বৎসরের পর, স্বর্গের কত নব নব সুসমাচার, নব নব

স্বর্গের আশীর্ব্বাদ লইয়া, আমাদের প্রিয় মাঘোৎসব আবার আমাদের নিকট সমাগতপ্রায়। আমরা আশা ও বিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া, এই স্বর্গের শুভ উৎসবে যোগ দান করিতে প্রস্তুত হই। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মমন্দিরপ্রতিষ্ঠার তারিখ ধরিয়া, ব্রাহ্মসমাজের আদি যুগ হইতে ব্রহ্মোৎসব চলিতেছে। ব্রাহ্মসমাজের আদি যুগের মাঘোৎসব কি বর্ত্তমান সময়ে নববিধানের মাঘোৎসব? ব্রাহ্মসমাজের আদি যুগে, ভারতের অতি আদিকালের ঋষিবংশ-প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মোপাসনার মৌলিক ধারাই ব্রাহ্মসমাজে সাধনা ও সম্ভোগের ব্যাপার ছিল; এবং সেই সাধন-সম্পদ লইয়াই তখন মাঘোৎসব হইত। ভাগীরথী গঙ্গা যেরূপ প্রথমে একটী সঙ্কীর্ণ মৌলিক ধারা অবলম্বন করিয়া আপনার জীবন আরম্ভ করিয়া ছিল, ক্রমে নানাদিগের শত শত ধারার সম্মিলনে, অতি গভীর, অতি প্রশস্ত, অতি বেগবতী একটী প্রবল পরাক্রান্ত মহস্রোতস্বতীর আকার ধারণ করিয়া, আপনার প্রশস্ত বক্ষে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া, নৃত্যময়ী হইয়া নৃত্য করিতে করিতে এখন অগ্রসর হইতেছে, কত দেশকে উর্ব্বর করিতেছে, বিচিত্র ফল ফুলে, বৃক্ষ ও পত্রে এবং শস্যসম্ভারে নানাস্থানকে শোভিত করিয়া স্রষ্টার মহদুদ্দেশ্য কতভাবেই সাধন করিতেছে; তেমনই ব্রাহ্মসমাজের সেই আদি যুগের একত্ব-বোধক ঋষিজীবন-প্রবর্ত্তিত সাধন-ধারা, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়ের সাধনধারার সহিত মিলিত হইয়া; নবযুগধর্ম্ম নববিধানের মহাসমন্বয়-সাধনরূপ বিরাট স্রোতস্বতীর আকার ধারণ করিয়াছে। এই যুগধর্ম্মস্রোতস্বতীর প্রশস্ততা কত, গভীরতা কত, বেগবত্তা কত! ইনি আপনার প্রশস্ত উদার বক্ষে স্বর্গের নব নব ভক্তি অনুরাগের ভাব-তরঙ্গ তুলিয়া, আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে দেশকালের সীমা অতিক্রম করিয়া, সকলের দ্বারদেশে উপস্থিত হইতেছেন। ইনি জাতিবর্ণ-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে, দেশ-কাল-নির্ব্বিশেষে সমগ্র মানবকুলের জীবনভূমিকে স্বর্গের কৃপা-বারি সিঞ্চন করিয়া কতই উর্ব্বরা করিবেন; বিবিধ ফল ফুলে শোভিত করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গের বিচিত্র শোভায় শোভিত করিবেন। তাই বলি, ব্রাহ্মসমাজের আদি যুগের ধর্ম্মধারা যেমন নব ব্রাহ্মসমাজে নববিধানের ধর্ম্মধারা নহে, ব্রাহ্মসমাজের আদি স্তরের মাঘোৎসবও নব ব্রাহ্মসমাজে নববিধানের মাঘোৎসব নহে। এখনকার নববিধানের মাঘোৎসব একদিনের মাঘোৎসব নহে; তাহা একমাসের মাঘোৎসবে পরিণত হইয়াছে। মাঘোৎসব এখন বিচিত্র সাধনার বিরাট ব্যাপার। তাই নববিধানের মাঘোৎসবসম্ভোগ জন্য, উৎসবের প্রারম্ভিক দীর্ঘ দিনের বিচিত্র ভাবের প্রস্তুতি-সাধন নববিধানমণ্ডলীর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় ও অবশ্য কর্ত্তব্য ব্যাপার।

এই প্রস্তুতিসাধন এবং মাঘোৎসবসাধন ও সম্ভোগ পূর্ণ পরিমাণে নির্ভর করে, আমাদের জীবনলব্ধ সাধনের উপর। আমাদের প্রিয় মাঘোৎসব সম্মুখে, তৎপূর্ব্বে প্রারম্ভিক প্রস্তুতিসাধনে আমরা প্রবৃত্ত হইব। এ সময় আমরা প্রতিজনে, আমাদের গত জীবনের, বিশেষ ভাবে আমাদের গত বৎসরের সাধনা ও সাধনলব্ধ সম্পদকে স্মৃতিপথে জাগাইয়া তুলি।

জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত কৃপাজনিত অবতরণের শুভ-ফলে, আমাদের ধর্ম্মজীবনে সাধন-সম্পদ্ লাভ হয়। আমাদের আপন আপন ভাব ও রুচির বশবর্ত্তিতায় যে সাধন, তাহা নবধর্ম্মের সাধনা নহে, তল্লব্ধ অভিজ্ঞতাও ধর্ম্মজীবনে সহায় হয় না। ধর্ম্মজীবনে ব্যাকুল, সরল প্রার্থনা ও উপাসনায়, সকল প্রকার উচ্চ কর্ত্তব্য, জীবনের সকল পরীক্ষা ও সমস্যায়, জীবন্ত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রেরণাধীনে আমরা আশাতীতরূপ তাঁহার কৃপা লাভ করি। গত বৎসর জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত কৃপার অবতরণে, আমাদের এই সামান্য জীবনেও, নব নব ব্রহ্মদর্শন, শিক্ষাপ্রদ ও আশাপূর্ণ নব নব অভয়বাণীশ্রবণ, সকল কঠিন কর্ত্তব্যে ও সমস্যায় তাঁহার পরিচালনায় স্বর্গের বল লাভ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। যদি সত্যকে সাক্ষী করিয়া জীবনের এ শুভ সংবাদ, ক্ষুদ্র জীবনে জীবন্ত ঈশ্বরের এই জীবন্ত-লীলার ব্যাপার ঘোষণা করিতে পারি, তবে কেন আমরা নব আশা ও বিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া, সম্মুখের শুভ মাঘোৎ-সবের প্রস্তুতি সেই জীবন্ত ঈশ্বরের কৃপায় সাধন করিয়া, আমাদের প্রিয় মাঘোৎসবের সম্মুখীন হইতে পারিব না?

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ১৮৭০ সনে বিলাতের কোন ধর্ম্মমন্দিরে, ভারতে ব্রাহ্মসমাজে জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত ক্রিয়ার সাক্ষ্য দান করিয়া বলিয়াছিলেন, "যদি তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরের কার্য্যকারিতা জাতীয় জীবনের পরিত্রাণ ব্যাপারে জীবন্ত ভাবে দেখিতে ইচ্ছা কর, তোমরা ভারতবর্ষে গমন কর।" আজ তাহার ৬২ বৎসর অন্তে,

আমাদের ক্ষুদ্র জীবনে, অতি সামান্য ভাবে হইলেও, জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত ক্রিয়ার কথা, আমরা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া, প্রাণ ভরিয়া ঘোষণা করি। সরল প্রার্থনা ও ব্যাকুল শরণাপন্নতায়, সর্ব্ব মূলাধার জীবন্ত ঈশ্বর আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে পরিত্রাণের ব্যাপার সাধন করিতেছেন, জীবনের প্রয়োজনানুসারে তিনিই বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া, বিভিন্ন মহাপুরুষদিগের জীবনের সঙ্গ ও সহবাস বিধান করিয়া, সকল ব্যাপারে পরিচালকরূপে কার্য্য করিতেছেন, আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ ক্রিয়ার অধীন হইয়া চলিতেছি, ইহার সাক্ষ্য দান করি।

আসুন সমবিশ্বাসী ভ্রাতৃগণ! ভগ্নীগণ! আমরা, আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনের নানা অপরাধ ও ত্রুটী সত্বেও, প্রতি জীবনে জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত ক্রিয়াধীনতায়, সাধারণ ও বিশেষ ভাবে, যে স্বর্গের ফল লাভ করিয়াছি, তাহা স্মৃতিপথে জাগাইয়া, তাঁহারই কৃপা বুকের বল করিয়া, আমরা আমাদের সম্মুখে আগতপ্রায় প্রিয় মাঘোৎসব সাধনে ও সম্ভোগে অগ্রসর হই। তাঁহার করুণা আমাদের জীবনে ধন্য হউক!

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

পুরাতন বর্ষ বিদায়।

মা, আজ পুরাতন বর্ষ বিদায়ে পুরাতন জীবনও কাড়িয়া লও। নবজীবন দান কর। পুরাতন দেহের সহিত পুরাতন মনও চলিয়া যাক। পুরাতন ঈশ্বরের পুরাতন ধর্ম্ম, পুরাতন মনের পুরাতন কর্ম্ম, পুরাতন মতের পুরাতন পথ, পুরাতন ভাবের পুরাতন স্বভাব, যাবতীয় পুরাতন, পুরাতন বর্ষে নিঃশেষ হউক। নববর্ষের নবদিনে যেমন পুরাতন দিন, পুরাতন মাস বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, তেমনি নববর্ষের নবদিনে পুরাতনের কোন গন্ধ দেহ মন প্রাণে যেন আর না থাকে। নববর্ষে যেন যথার্থ নববিধানের নবজীবনে ভূষিত হই এবং মার নবশিশু বিশ্বমানব সনে সর্ব্বজনে নববিধানসাধনে ও নববর্ষযাপনে ধন্য হই, ইহাই আশীর্ব্বাদ কর।

নববিধানের শত্রু।

নববিধানের প্রধান শত্রু পুরাতন। পুরাতন যাহা কিছু সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ না হইলে নববিধান হইবে না। নিত্য নূতনত্বই নববিধান। পুরাতন মত, পুরাতন সংস্কার, পুরাতন মন, পুরাতন বিচারবুদ্ধি নববিধানের ভীষণ শত্রু। এই বিচারবুদ্ধির আওতাতেই নববিধান পূর্ণভাবে বিকাশ পাইতে পারিতেছে না। নববিধানের আর এক ভীষণ শত্রু সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতাই ঈশ্বরের সকল বিধানে সংকীর্ণতা, স্বতন্ত্রতা, অস্পৃশ্যতা আনিয়া, বিধানের বিধানত্ব বিনাশ করিয়াছে। নববিধান সেই সাম্প্রদায়িকতাকে সমূলে নির্ম্মূল করিতেই সমাগত। যদি এ বিধানেও সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করে, অচিরে ইহারও সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব বিশ্বাসিগণ, সাবধান, অসাম্প্রদায়িক সর্ব্বসমন্বয়কারী নববিধানকে যেন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে পরিণত না করি, কিম্বা ইহার ভিতর কোন সাম্প্রদায়িক দল রচনা না করি।

"তুমি আছ"।

'তুমি আছ,' তাই ত আমি আছি। আমার যাহা কিছু আছে, তাহা তোমার গুণেই আছে, তোমাতেই আছে। তবে আমার নাই কি, আমার অভাব কি, আমার হাতে কি, আমার আমিই বা কি, আমিই বা কার? আমার ভাবনা যে তুমি ভাবছ। অনন্তকাল আমার যাহা চাই, তার জন্যে অনন্ত হয়ে, অনন্ত উপায় হয়ে, অনন্ত উন্নতির সোপান হয়ে আছ। অনন্ত স্নেহে চিরমঙ্গল দিবার মালিক হয়ে আছ, সকল ভার নিয়ে সর্ব্বস্ব হয়ে আছ। সর্ব্ব পাপ অভাবের মোচনকর্ত্তা, সর্ব্বদুঃখনাশিনী, দুর্গতিহারিণী ও নিত্যানন্দব্রহ্মানন্দদায়িনী হয়ে আছ। এই বিশ্বাসে, এই দর্শনেই ত ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মানন্দ হইলেন। আমরাও তাঁহার সহিত সমবিশ্বাসী সমদর্শী হইয়া, সেই আত্মজ্ঞানলাভে ব্রহ্মানন্দ হই, আর দেখি ও দেখাই, 'তুমি আছ'।

—০—

শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দদেবের কন্যা মহারাণী সুনীতি দেবী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই নবেম্বর, রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সত্যই তখন স্বর্গ হইতে কোচবিহারের উপর পুষ্পবর্ষণ হইয়াছিল। মহারাণী সুনীতি দেবী তখন হইতে বিশেষ ভাবে কোচবিহারের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। মহারাজাও তাঁহারই সুপরামর্শে ও সহযোগিতায় রাজ্যের নানা প্রকার উন্নতিকল্পে নিযুক্ত হইলেন। এখানে নববিধান-ব্রহ্মমন্দির স্থাপিত হইল, নববিধানপল্লী রচিত হইল, কেশবাশ্রম সাধনউদ্যান প্রতিষ্ঠিত হইল; ব্রাহ্মছাত্রনিবাস, প্রচারাশ্রম, সুনীতিবালিকাবিদ্যালয়, ক্রমে নানাস্থানে ছাত্র-বিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া কলেজ, সুগঠিত চিকিৎসালয়, ল্যান্সডাউন হল, রাস্তা ও উদ্যান, নূতন রাজপ্রাসাদ ইত্যাদি দ্বারা শোভিত হইয়া যে নগরটী নূতন আকারে গঠিত হইল। এই সকলই

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ও মহারাণী সুনীতির রাজ্যশাসন ও প্রজাবাৎসল্যের পরিচায়ক।

এদিকে দেবী সুনীতি রাজার রাজকার্য্যের সহায়তা যেমন করিতেন, তেমনি গার্হস্থধর্ম্মসাধনেও বিরত হন নাই। রাণী হইয়াও, স্বহস্তে ফুল তুলিয়া দেবালয় সাজান ও পুষ্পগুচ্ছ তৈয়ার করা তাঁহার দৈনিক প্রাতঃক্রিয়া ছিল। প্রায় প্রতিদিন ৫০ জনের খাওয়ার উপযুক্ত ২০ রকম তরকারীর কুটনা কুটা, পান সাজা, স্বামী ও ছেলেদের জন্য কিছু কিছু মিষ্টান্ন তৈয়ারী করা ও সময়ে সময়ে স্বহস্তে কিছু কিছু রন্ধনও তাঁহার দৈনন্দিন সাধন ছিল। শেষ বয়স পর্য্যন্তও তাহা না করিলে যেন চলিত না। রাজপ্রাসাদে ভোজের ব্যাপার ত প্রায়ই হইত, সে সময় সকল বন্দোবস্তই সুনীতি দেবীরই কার্য্য ছিল। বাস্তবিক "সুখী পরিবারের" আদর্শে রাজপরিবারটী যাহাতে হয়, ইহাই তাঁহার অন্তরের সাধ ও আকাঙ্ক্ষা ছিল।

এমন সুখ-সৌভাগ্য-সম্ভোগের সময়েই পিতৃদেব শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ হইল। এই ভীষণ শোক আকস্মিক বজ্রের ন্যায় যেমন সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়ে, তেমনি মহারাণীর সুখের আগারেও মহা শেল হানিল। ইতিপূর্ব্বে এমন বিষাদ আর তাঁহাকে কখনও ভোগ করিতে হয় নাই। যখন আমাদের প্রিয় আচার্য্যদেব স্বর্গারোহণ করেন, তখন মহারাণী গর্ভবতী ছিলেন। তাঁহার প্রথমা কন্যা সুকৃতি তখন গর্ভস্থ। সেই ৮ই জানুয়ারী, পিতৃদেবের শবশয্যাপার্শ্বে যখন মহারাণী সুনীতি ঠাকুর মা ও মাতৃদেবীর সহিত আর্ত্তনাদ করিতে করিতে গমন করিলেন, সেই শোকাবহ দৃশ্য এখনও আমাদের চোখের সামনে জল জল করিয়া প্রকাশ পাইতেছে। পাছে মহারাণী শোকে অধৈর্য্য হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন, এজন্য মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং তাঁহাকে আবেষ্টন করিয়া পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। তাহার অষ্টাহ মাত্র পরেই সুকৃতির জন্ম হইল।

শোকের অন্ধকারে শিশুর জন্ম মার প্রাণে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দান করিল। কিন্তু ইহার অল্পদিন মধ্যেই আর এক পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথম রাজকুমারের জন্মের দুই বৎসর মধ্যে যদি অন্য রাজকুমার না জন্মান, তবে প্রথম রাজপুত্রের কিছু হইলে কে সিংহাসনে বসিবে, এই ভয়ে দেওয়ান রাজমাতাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের পুনরায় বিবাহ দিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। আবার ইতিমধ্যে প্রথম রাজকুমার "রাজী"ও কঠিন পীড়া হইল। এজন্য মহারাজাও বিশেষ শঙ্কিত হইলেন। যাহা হউক, ঈশ্বরের অলৌকিক মঙ্গল বিধানে প্রথম রাজকুমার 'রাজী' আরোগ্য লাভ করিলেন এবং দ্বিতীয় রাজকুমার জিতেন্দ্রনারায়ণেরও ১৮৮৬ সনের ২০শে ডিসেম্বর জন্ম হইল। সুতরাং সে ষড়যন্ত্রও প্রশমিত হইল।

মহাসম্রাজ্ঞী মা ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশংবর্ষীয় জুবিলী উৎসব উপলক্ষে, ১৮৮৭ সনে মহারাণী সুনীতি দেবী মহারাজার সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া প্রথম বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে গিয়া মহাসম্রাজ্ঞীর নিকট কি স্নেহ আদর অভ্যর্থনাই তাঁহারা লাভ করেন। পূর্ব্বে এদেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে কেহ এত আদর পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

বিলাতের রাজপরিবার এবং উচ্চপদস্থ প্রায় সকলেই তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অভিনন্দিত করেন। সম্রাজ্ঞী মা ভিক্টোরিয়া তাঁর বকিংহাম রাজপ্রাসাদে পারিবারিক স্নেহে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করেন ও আপন জ্যেষ্ঠ সন্তানের প্রকোষ্ঠে অধিবাস দিয়া আতিথ্যসৎকার করেন। তিনি স্বহস্তে মহারাণী সুনীতির বক্ষে সি, আই, উপাধির পদক পরাইয়া দেন এবং ইউরোপীয় সকল রাজ্যের সম্রাট্ ও মহারাজ্ঞীদিগের উদ্যানসম্মিলনে, মা ভিক্টোরিয়া একা মহারাণী সুনীতিকেই চুম্বন দানে সম্মানিত করেন। ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রকে আপন "প্রিয়বন্ধু" বলিয়া উল্লেখ করিয়া, তাঁহারই কন্যা ও জামাতা বলিয়া, আপন কন্যা ও জামাতার ন্যায় সম্রাজ্ঞী মা ভিক্টোরিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে এত আদর করিয়াছিলেন।

মহারাজা মহারাণী বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিলে, কমলকুটীরে তাঁহাদিগকে, পরিবার ও দল মিলিয়া বিশেষ ভাবে বরণ করিয়া, অভিনন্দন দান করা হয় এবং তাঁহাদিগের জন্য বিশেষ উপাসনাও হয়। কোচবিহারেও তাঁহারা সাদরে অভিনন্দিত হন। বিলাতে মহারাণী সুনীতি যখন অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। মা ভিক্টোরিয়া তাহা জানিতে পারিয়া, ভাবী সন্তানের God Mother—"ধর্ম্ম মা" হইবেন, প্রতিশ্রুত হন। তাই তৃতীয় রাজকুমার জন্মগ্রহণ করিলে, মহারাজ্ঞী তাঁর নাম "ভিক্টর" রাখিয়া তাঁহার God Mother হন। নবসংহিতা মতে "ভিক্টরের" নাম নিত্যেন্দ্রনারায়ণ রাখা হয়। তাহার পর মহারাণী সুনীতি দেবীর সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র হিতেন্দ্রনারায়ণের জন্ম কোচবিহারেই হয়। অন্যান্য সকল ছেলেমেয়ে কলিকাতাতেই জন্ম গ্রহণ করেন। কুমার হিতেন্দ্রনারায়ণের পর দুইটী মহারাজকুমারী প্রতিভা ও সুধীরার জন্ম হয়।

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ রাজোচিত মৃগয়ানুরক্ত ও ব্যায়ামপ্রিয় ছিলেন। দেশ দেশান্তর হইতে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণকে লইয়া, আপন রাজ্যে মৃগয়া করিতে ভালবাসিতেন। মহারাণীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে তিনি ইচ্ছা করিতেন না; কিন্তু মহারাণী একবার অত্যন্ত অভিমান করেন এবং জোর করিয়া মহারাজার সঙ্গে যান। তাহার পর প্রায় সঙ্গে লইয়া যাইতেন।

ছেলেদের সুশিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের উৎসাহে ও পরামর্শে একে একে সকলকেই বিলাতে প্রেরণ করেন। মহারাণী সুনীতি দেবী কিন্তু তাহা বড় পছন্দ করিতেন না। মহারাজা সকল বিষয়ে উচ্চসংস্কারসম্পন্ন হইলেও, মহিলাগণ স্বাধীনভাবে যাহার তাহার সহিত মেশামিশি করেন বা বাহির হন, তত পছন্দ করিতেন না; বিশেষতঃ দেশীয় লোকের সম্মুখে মহারাণী বাহির

হন, ইচ্ছা করিতেন না। এ সম্বন্ধে শ্রীকেশবচন্দ্রের ভাব অনুসরণ করিতেই তিনি ভালবাসিতেন। তাই মহারাণী সুনীতি দেবীও মহারাজার জীবিত অবস্থায় প্রকাশ্যে বাহির হইতেন না।

১৮৯৮খ্রীষ্টাব্দে মা ব্রহ্মনন্দিনী জগন্মোহিনী দেবীর স্বর্গারোহণে, ভাই ভগ্নীগণ অত্যন্তই শোকহত হন। মহারাণী বড়ই মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁহার যাবতীয় শিক্ষা মার গুণে। তিনি মাতৃদেবীর তিরোধানের পর হইতে আর্য্যনারীসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে জেষ্ঠ্যা কন্যা মহারাজকুমারী সুকৃতি দেবীর শুভ পরিণয় হয়। ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর সুপুত্র শ্রীমান্ জ্যোৎস্নানাথ ঘোষালের (আই,সি,এস) সহিত মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ নবসংহিতার পদ্ধতি অনুসারে এই বিবাহ দান করেন। মহারাজার উড্ল্যাণ্ড রাজপ্রাসাদে অতি সমারোহে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। শ্রদ্ধেয় প্রেরিত ভাই বঙ্গচন্দ্রের সহযোগিতায়, শ্রদ্ধেয় প্রেরিত ভাই প্রতাপচন্দ্র এই বিবাহের পৌরোহিত্য করেন। এবং সকল প্রেরিত প্রচারক মহাশয়গণই সম্মিলিত ভাবে যোগদান করেন। ইতিপূর্ব্বে প্রেরিতগণের মধ্যে যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল, এই উপলক্ষে কথঞ্চিৎ মিলন হয়।

মহারাজ্ঞী মা ভিক্টোরিয়ার পরলোকগমনে সমগ্র ভারতবাসীর ন্যায় মহারাণী সুনীতি দেবীও মর্ম্মাহত হন। মহারাজ্ঞী তাঁহাকে পুনর্ব্বার দেখিবার জন্য আপন সঙ্গিনীদিগের নিকট বারম্বার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাহা ত আর হইয়া উঠে নাই। ১৯০২ সনে সুনীতি দেবী দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন। তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ মহারাজকুমার "রাজী" অক্সফোর্ডের ইটন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিলেন এবং একবার পোলো খেলিতে খেলিতে সাংঘাতিকরূপে আহত হন।

অবিলম্বে সম্রাট্ এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণও আমন্ত্রিত হইয়া বিলাত গমন করেন। সম্রাট্ তাঁহাকে সম্মানসূচক অমাত্য বা এ, ডি, সি, পদে নিযুক্ত করেন এবং বিশেষভাবে সমাদর করেন। সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা উভয়েই মহারাণী সুনীতিকে আদর করিয়া আপনাদের সিংহাসনের পার্শ্বেই বসিবার আসন দেন এবং সম্রাট্ স্বহস্তে তাঁহাকে "করোনেসন মেডাল" অর্পণ করেন।

দিল্লীতে পরে যে দরবার ও অভিষেক-উৎসব হয়, তাহাতেও যোগ দিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়া মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ও মহারাণী সুনীতি উভয়েই বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী প্রিন্স অব ওয়েল্স্ রূপে যখন ভারতে আগমন করেন, তখন তাঁহারা উড্ল্যাণ্ড রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রিত হইয়া জলযোগ করেন। ইঁহাদের আহ্বানে মহারাণী সুনীতি দেবী ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ছেলেমেয়েদের লইয়া বিলাতযাত্রা করেন। সেবারও যথেষ্ট পরিমাণে রাজসম্মানলাভে সম্মানিত হন।

অতঃপর মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ হঠাৎ রুগ্ন হইয়া পড়েন এবং তাঁহার চিকিৎসার জন্য সপরিবারে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বিলাত যাত্রা করেন। বম্বে যাইতেই শুনিলেন, সম্রাট্ এডওয়ার্ড অত্যন্ত অসুস্থ, এবং জাহাজে উঠিয়াই শুনিলেন, তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। এই শোকসংবাদ মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের অসুস্থ শরীরে বজ্রসম লাগিল। সেই আঘাত হইতে আর যেন উত্থান করিতে পারিলেন না। বিলাতে পৌঁছিয়া স্বর্গীয় সম্রাটের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিলেন; কিন্তু বর্ত্তমান সম্রাটের অভিষেকের সময় মহারাজা আরো অসুস্থ হইলেন এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর সমুদ্রতীরস্থ বেকসিল নগরে মহাপ্রয়াণ করিলেন। এই ঘরে শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের একখানি চিত্র ছিল, ইহা দেখিতে দেখিতে মহারাণীকে অধৈর্য্য দেখিয়া মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ বলেন, "তুমি কার মেয়ে, মনে রেখো। পরিণামে শান্তি হবে।" (ক্রমশঃ)

দীন সেবক—প্রিয়নাথ মল্লিক।

স্বর্গীয়া মহারাণী সুনীতি দেবীর জীবনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রভাব।

মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবী কেশবচন্দ্রের অতি আদরের প্রথমা কন্যা। কোচবিহারে রাজরাণীরূপে, বিধানমণ্ডলীতে পরিচারিকা ও শক্তভগ্নীরূপে, নববিধানের সাধনপথে, স্বর্গলোকে অমর জীবনের পথে, সকলের আদর সমাদরে সুনীতি দেবী জীবনে কেশবচন্দ্রেরই প্রভাব লক্ষিত হয়। সুনীতি দেবীর কোচবিহারের মহারাণীরূপে স্বদেশে বিদেশে বহুব্যক্তির নিকটে পরিচিত ও সম্মানিত; কিন্তু কেশবচন্দ্রের কন্যারূপে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নিকট তাঁহার যে আদর হইয়াছিল, তাহার তুলনা কোথায়? স্বদেশে, বিদেশে এইরূপে জ্ঞানী, গুণী সকলের নিকট, কেশবচন্দ্রের প্রিয় কন্যা বলিয়া তাঁহার যে আদর, তাহাই প্রকৃত আদর। কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণও অন্তরে বাহিরে তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দের কন্যারূপেই বিশেষ সম্মান দান করিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র চির বৈরাগী। বৈরাগ্যে ও বিবেকাগ্নিতে উদ্দীপ্ত ভক্ত পিতা ব্রহ্মানন্দের সাত্ত্বিক সংসারে লালিত পালিত সুনীতি দেবীর বাল্য ও কৈশোর জীবন কোচবিহারের মহারাণীরূপে সেই জীবনের যে পরিবর্ত্তন, পার্থিব দৃষ্টিতে তাহা সামান্য নয়। প্রচুর ভোগবিলাসিতায় জড়িত, পার্থিব মান সম্মানে বিভূষিত, স্বাধীন কোচবিহার রাজ্যের মহারাণীরূপে,

তাঁহার জীবনে ধনৈশ্বর্য্য, মানসম্ভ্রম ও ভোগবিলাসিতার অপর্য্যাপ্ত আয়োজন আপন প্রভাব বিস্তার করে নাই, একথা বলিতে পারি না। এ সকল প্রভাবের মধ্যেও মহারাণী সুনীতি দেবীর জীবনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বিরাট ধর্ম্মজীবনের প্রভাবাগ্নি নিশ্চয়ই ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিকণার ন্যায় স্থিতি করিতেছিল। যে ধর্ম্মের অগ্নি মানবকে ধর্ম্মজীবন ও অমরজীবন দান করে, সে পবিত্র ধর্ম্মাগ্নি স্বয়ং অমর। পৃথিবীর হাজার বিরুদ্ধ শীতল বায়ুতে সে অগ্নি নিবিয়া যায় না। কেশবজীবনের ধর্ম্মাগ্নিকণা মহারাণী সুনীতি দেবীর জীবনে, স্বাভাবিক ভাবেই সংক্রামিত হইয়াছিল; তাহা পার্থিব হাজার ঝড় তুফান ও বাদলা বৃষ্টির ভিতরে নির্ব্বাপিত হয় নাই। যথাসময়ে তাহা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সেই ধর্ম্মাগ্নিই নানা বাধা, বিঘ্ন ও পরীক্ষার ভিতর, তাঁহাকে ধর্ম্মের পথে, অনন্ত জীবনের পথে এবং ভক্ত পিতার প্রদর্শিত সমন্বয়প্রধান নববিধানসাধনের পথে অগ্রসর করিয়াছিল এবং নিষ্ঠা সহকারে নানাভাবে ধর্ম্মব্রতের আচরণে ও অনুষ্ঠানে নিরত রাখিয়াছিল।

১৯১১সনের সেপ্টেম্বর মাসে, মহারাণী সুনীতি দেবী বৈধব্য-দশা প্রাপ্ত হন। ধনৈশ্বর্য্যপূর্ণ, রাজ্যসুখজনিত পার্থিব জীবনের প্রবল জোয়ারে তাঁহার এই প্রথম ভাটা পড়িল; পার্থিব সকল সুখ স্বচ্ছন্দতার মূলে কুঠারাঘাত হইল। তৎপর তাঁহার অতি আদরের, অতি প্রিয়, মাতৃভক্ত প্রথম পুত্র মহারাজা রাজরাজেন্দ্র-নারায়ণের পরলোকগমনে, ভয়ানক পুত্রশোকে তাঁহার প্রাণ একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। স্বামীর শোকে, পুত্রশোকে, তাঁহার প্রাণ কিরূপ সন্তাপিত হইয়াছিল, পরীক্ষার পর পরীক্ষা আসিয়া তাঁহার শরীর মনকে কিরূপ জর্জ্জরিত করিয়াছিল, অন্তরঙ্গ যাঁহারা, তাঁহারা আর কত টুকু ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন? "Out of evil cometh good." বাহিরের বিপদ পরীক্ষার মধ্য দিয়া মানবজীবনে প্রভূত কল্যাণ সমাগত হয়। ধনৈশ্বর্য্যের অসারতা, পার্থিব সুখ সম্পদের ক্ষণস্থায়িতা, পরীক্ষার পর পরীক্ষা আসিয়া তাঁহার জীবনে কতভাবেই প্রমাণ করিতে লাগিল। জীবনের স্থায়ী সুখ কি, স্থায়ী আনন্দ কি, স্থায়ী সম্পদ কি, ক্রমে সেই দিকে তাঁহার মন ধাবিত হইল।

১৯১৪ সনের লক্ষ্ণৌসঙ্ঘের উৎসবে, তাঁহার জীবনে ধর্ম্মের উৎসাহ, ভাব, ভক্তি ও অনুরাগের উচ্ছ্বাস প্রবল আকার ধারণ করিল। তাঁহার রচিত সঙ্ঘসঙ্গীতগুলি তাঁহার প্রাণের ধর্ম্মো-চ্ছ্বাসের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সঙ্ঘ ও সমিতিতে তিনি নেতৃত্ব করিলেন। সঙ্ঘ ও সমিতিতে উপস্থিত প্রচারক, সাধক, কর্ম্মী ও মণ্ডলীর ভাই ভগ্নীদিগকে, নববিধানের নবধর্ম্মপরিবারের অতি অন্তরঙ্গ, অতি আদরের ভাই ভগ্নীরূপে গ্রহণ করিয়া, তিনি নিজ হস্তে সকলের কপালে চন্দন পরাইলেন, নববিধানের প্রেম-পরিবার-রূপে সকলকে সম্বন্ধ করিলেন। সেই হইতে তাঁহার নিজ জীবনে ও মণ্ডলীর জীবনে নববিধানের নূতন কার্য্যস্রোত খুলিয়া গেল। এই অনুষ্ঠান-যোগে ব্রাহ্মসমাজে নববিধানের ধর্ম্মক্ষেত্রে নারীজীবনের স্থান বিশেষভাবে চিহ্নিত হইল।

লক্ষ্ণৌ সঙ্ঘের পর নববিধানমণ্ডলীতে, নববিধানসাধনের প্রবল উদ্যম দেখা দিল। কিছু দিন প্রতি রবিবার পূর্ব্বাহ্নে, কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে, মণ্ডলীর বহু নরনারী উপাসনা উপলক্ষে মিলিত হইতেন এবং উপাসনার পর কমলকুটীরে আহারাদি করিতেন। মহারাণী সুনীতি দেবীই তাহার ব্যয়ভার বহন করিতেন। ক্রমে তাঁহার জীবনে নববিধানপ্রচারে প্রবল উদ্যম উৎসাহ দেখা দিল। উপাসনা ও কথকতা যোগে তিনি নব-বিধান প্রচার আরম্ভ করিলেন। পরিচারিকা-ব্রতধারিণী হইয়া, নানাভাবে প্রচারকার্য্য করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশব-চন্দ্রের ন্যায়, ভাবার উপর অধিকার এবং ভাবের সহিত বিশদরূপে সত্য প্রকাশের ক্ষমতা তাঁহার জীবনে বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইয়া ছিল। তাঁহার কথকতা শ্রবণ করিয়া শত শত নরনারী মুগ্ধ হইয়াছেন; এমনও হইয়াছে যে, চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় নাই। শোকের পর শোক, পরীক্ষার পর পরীক্ষা আসিয়া তাঁহার জীবনকে যেমন জর্জ্জরিত করিতে লাগিল, তেমনি পার্থিব সুখ সম্পদের অনিত্যতা ও অসারতা-বোধের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার জীবনে দীনতা উপস্থিত হইল; অপরাধ-বোধ, অনুতাপ এবং দীনতা তাঁহাকে জীবনের শ্রেষ্ঠসাধন নবধর্ম্ম-সাধনের দিকে বিশেষ ভাবে অগ্রসর করিল, এবং তাঁহার উপাসনা ও প্রার্থনা মিষ্ট হইতে মিষ্টতর ও প্রাণস্পর্শী হইল।

সমাজের প্রচারকদিগকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি-তেন। তিনি বলিতেন, আমার পিতার ব্রতে ব্রতধারী যাঁহারা, তাঁহাদের দোষ ত্রুটী থাকিলেও, তাঁহারা আমার বিশেষ মান্য ও শ্রদ্ধার পাত্র। দেখিয়াছি, তিনি ছোট বড় যে কোন অনুষ্ঠান করিতেন, প্রচারক দ্বারাই করাইতেন। দূরে থাকিলেও, সেখানে প্রচারক একজনকে লইয়া গিয়া অনুষ্ঠান সম্পন্ন করাইতেন।

মাঘোৎসবের সময় আত্মীয় স্বজন, মণ্ডলীর প্রিয়জন, প্রচারক ও প্রচারকপরিবারকে নূতন বস্ত্র দান করা তাঁহার বিশেষ প্রিয় কার্য্য ছিল। উৎসবের সময় নববস্ত্র দান করিয়া এইরূপে সকলকে তৃপ্ত করিতেন, নিজেও কত তৃপ্ত লাভ করিতেন। সুযোগ উপস্থিত হইলেই তিনি বিধানপরিবারের লোকদিগকে প্রচুর আয়োজন করিয়া আহার করাইতেন; আদান প্রদানে, অনুষ্ঠানে আচরণে, কথাবার্ত্তায় সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করা তাঁহার জীবনের বিশেষ ব্রত ছিল। এ সকলের ভিতরেই তাঁহার জীবনে কেশবচন্দ্রের প্রাণ ও হৃদয়ের প্রতিফলন দেখিতে পাই।

নববিধানবাহক ভক্ত পিতা কেশবচন্দ্রের জীবনের বিশেষ সাধনক্ষেত্র ও বাসস্থান কমলকুটীর এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নব-দেবালয় সুনীতি দেবীর নিকট পবিত্রতীর্থরূপে প্রাণের অতি প্রিয়-তম সামগ্রী ছিল। পিতার প্রতিষ্ঠিত ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ের জন্য কমলকুটীর দান করিয়া, পিতার কীর্ত্তিরই স্থায়িত্ব দান

করিয়াছেন। নবদেবালয়ের সুব্যবস্থার জন্য তাঁহার যত্ন চেষ্টার অবধি ছিল না। নবদেবালয়ের বেদী প্রতিদিন যাহাতে পুষ্পদলে সুসজ্জিত থাকিতে পারে, দেবালয় নিত্য ধূপ ধূনার গন্ধে সুবাসিত থাকিতে পারে, নিত্য পূজার প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা যথানিয়মে ব্যবস্থিত হইতে পারে, উপাসনার প্রয়োজনীয় সামগ্রী—সঙ্গীত, প্রার্থনাপুস্তকাদি, খোল, করতাল, শঙ্খ, কাঁসর প্রভৃতি যথাযোগ্য স্থানে সংস্থাপিত থাকিয়া সকলের ব্যবহারে আসিতে পারে, নিজ ব্যয়ে শুধু এসকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না, নিষ্ঠার সহিত দেবালয়ের সকল কার্য্য যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, নিকটে থাকুন, বা দূরে থাকুন, এ সব বিষয়ে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও তত্ত্বাবধান ছিল। সুযোগ হইলেই নবদেবালয়ে আসিয়া, প্রাণ ভরিয়া পরম জননীর পূজা করিয়া, আপনাকে কত ধন্য মনে করিতেন। সাধন ভজনে, পূজা বন্দনায় পিতৃদেবের জীবনের প্রভাব তাঁহার জীবনকে জীবন্ত করিয়া তুলিত। প্রতিবৎসর নিষ্ঠাভক্তির সহিত, প্রমত্তভাবে সকলের সহিত মিলিয়া, সনৃত্য মধুর কণ্ঠের সঙ্গীতে ও সুন্দর হস্তে দীপমালা লইয়া, যে নববিধান নিশান বরণ করিতেন, আর আমরা তাহা দর্শন করিব না। মাঘোৎসবের সময় আনন্দবাজার ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আর একটী সাধের সামগ্রী। সুনীতি দেবী জীবনের শেষ মাঘোৎসব পর্য্যন্ত মেয়েদের আনন্দবাজারটী রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

আর্য্যনারীসমাজ নারীজীবনের ধর্ম্মোন্নতির জন্য কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত আরএকটী বিশেষ প্রতিষ্ঠান। সুনীতি দেবী এ প্রতিষ্ঠানের প্রাণ ছিলেন। অর্থব্যয়, মধুর উপাসনা, গভীর প্রাণস্পর্শী উপদেশ, আলোচনা ইত্যাদি দ্বারা এ প্রতিষ্ঠানটীকে তিনি বরাবর জীবিত রাখিয়া গিয়াছেন।

প্রচারকদিগের বাসস্থান মঙ্গলপাড়ার সকলকেও তিনি কত স্নেহচক্ষে দেখিতেন, কত আদর যত্ন করিতেন। গত মাঘোৎসবে মঙ্গলপাড়ার উৎসবে, মঙ্গলপাড়ার মেয়েদের অনুরোধে তিনি উপাসনার কার্য্য করিলেন, মঙ্গলপাড়ার পূর্ব্ব স্মৃতি সকলের প্রাণে জাগাইয়া তুলিলেন। শেষে স্বর্গগত উপাধ্যায় মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতিপূর্ণ গৃহে, উপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী শ্রীমতী দীপ্তিময়ীর বর্ত্তমান বাসগৃহে আহারাদি করিয়া, মঙ্গলপাড়ার সকলের সঙ্গে কতই আত্মীয়তা প্রকাশ করিলেন, প্রেমদৃষ্টিতে সকলকে কত আপ্যায়িত করিলেন।

নববিধান-ঘোষণার দিনের বিশেষ মর্য্যাদা তিনি রক্ষা করিতেন। ইদানীং প্রতি বৎসর সে দিনে কমলকুটীরে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ও চেষ্টায় যে আনন্দ সম্মিলন হইত, তাহাতে তিনিও স্বর্গের আনন্দোৎসব সম্ভোগ করিতেন ও সকলের মনেও পবিত্র আনন্দ দান করিতেন। গত বৎসর ব্রহ্মমন্দিরে সে মিলনানন্দ সম্ভোগ করিয়াছিলেন। ভক্ত পিতার ধর্ম্ম হইয়াছিল তাঁহার জীবনের জীবন্ত ধর্ম্ম, পিতার জীবনের প্রভাব হইয়াছিল তাঁহার জীবনের যাহা কিছু মহত্ত্ব ও যাহা কিছু গৌরব; পিতৃধর্ম্ম নববিধান সাধন, নববিধান প্রচার, স্বদেশে বিদেশে নববিধানের জয় ঘোষণা, নববিধান প্রতিষ্ঠা করা ও প্রতিষ্ঠিত দেখা ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ কার্য্য ও সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য। কেশবচন্দ্রের জীবনের প্রভাবও যাহা, নববিধানও তাহাই। তাই বলি, কেশবচন্দ্রের জীবনপ্রভাবে মাননীয়া মহারাণী সুনীতির জীবন ধন্য।

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

—•—

স্বর্গীয়া সুনীতি দেবী।

কুচবেহারের মহারাণী ইহলোকে নাই,
গিয়াছেন পরলোকে পায় ঠেলি সব;
রাজৈশ্বর্য্য যত কিছু অনিত্য অসার,
তুচ্ছ করি ধন মান পদের গৌরব।
মহাত্মা কেশব সেন জনক যাঁহার
তাঁর মত ভাগ্যবতী কেবা এ সংসারে?
অমূল্য ধরমধন লভিয়া পিতার,
গিয়াছেন ডঙ্কা মেরে ভব-সিন্ধুপারে।
নন্দনের পারিজাত—নন্দন কাননে,
বিশ্বজননীর কোলে করেছেন গমন;
জরামৃত্যু শোক তাপ নাই কিছু যথা,
অনন্ত সুখের খনি অমর ভবন।
আজি তাঁর পুণ্যস্মৃতি করিয়া স্মরণ,
সম্বর সকল দুঃখ ওহে যুবরাজ!
ছিলেন সংসারে তিনি আদর্শ রমণী,
করিছেন স্বর্গে এবে আনন্দে বিরাজ।
তাঁহার চরিত্রগুণ ভাবী বংশধর,
গাইবে আনন্দে মাতি মনের হরষে;
সুনীতি-আকর যিনি নারী-শিরোমণি।
সুনীতির স্মৃতিসভা বরষে বরষে—
হবে কুচবেহারেতে, স্মরি তাঁর নাম,
উল্লাসে সকল লোক হবে আত্মহারা;
গাইবে তাঁহার জয় কোটি কণ্ঠে মিলি,
প্রজাবর্গ রাণীভক্ত নিশ্চয় যাহারা॥

কৃষ্ণনগর, ১৪।১১।৩২। শ্রীচন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ সরকার।

(২৩শে অক্টোবর, শ্রাদ্ধবাসরে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক পঠিত) *

পূর্ণ ৩৪ বৎসর গত হইল, এক শারদ সন্ধ্যায়, আসামের কোনও অজানা সহরে, অচেনা লোকের মধ্যে, অস্ফুটস্বরে, একটী অতি ছোট শিশুবালক দূর হইতে অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখাইয়া বলিয়াছিল, "আপনি জানেন না? ঐ যে, আমাদের বাড়ী"। আজ পার্থিব জীবনের শারদ সন্ধ্যায়, সেই বালক ততোধিক অস্ফুটস্বরে, অথচ অধিকতর সুবোধ্য ভাষায়, বলিয়া গেল, "আপনি জানেন না? ঐ যে, আমাদের বাড়ী।" "মোদের সেই জন্মস্থান, হেথা অবস্থান, কেবল দু'দিনের তরে"। সেই ১৮৯৮ সনের ৮ই অক্টোবর, আর ১৯৩২ সনের ৮ই অক্টোবর, পূর্ণ ৩৪ বৎসর। সেই বালক, এই স্নেহাস্পদ ভাই যোগেন। অচেনা পরিবারে আমার প্রথম সঙ্গী হইয়াছিল, একটী বালক, আর একটী বালিকা—যোগেন তদন্যতর। প্রথম পরিচয়ে তাহার প্রাণের সরলতার প্রকাশ ঐ প্রশ্নে—"আপনি জানেন না আমাদের বাড়ী"? আমি যে সেই সহরে নবাগত, তাহাদের বাড়ী পূর্ব্ব হইতে জানিবার যে আমার কোনও সম্ভাবনা ছিল না, এই সহজ জ্ঞানকে ছাপিয়া প্রকাশ পাইল তাহার সেই সরল প্রাণ। এই সরল প্রাণই অধিকতর রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার পরবর্ত্তী জীবনের সমত্বদর্শনজ্ঞানে—যাহা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, রোগীর সেবাকার্য্যে—আত্মভোলা প্রেমের রূপান্তর।

যোগেনকে শিশু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, সে দিন সে শিশু ছিল; কিন্তু আজ আর তাহাকে শিশু বলিতে পারি না। "ন স্ত্রী, ন পুমানসৌ, বালকঃ কেন কথ্যতে"। শুদ্ধ আত্মা স্ত্রী নহেন, পুরুষও নহেন, তাঁহাকে বালক বলিব কি প্রকারে? যোগেন আজ জড়ের দেশ, জড় বেশ ছাড়িয়া, জ্যোতির্ম্ময় রূপে আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; সুতরাং আজ শিশু বা বালক এই সকল উপাধির অতীত।

দ্বিতীয় কথা বলিয়াছি, "যোগেন চলিয়া গেল"। ইহাও ভুল কথা। সে চলিয়া যায় নাই—কেহই চলিয়া যায় না। ভাষা খুঁজিয়া পাই না, তাই এইরূপে আমরা মানুষের দেহত্যাগের অবস্থা প্রকাশ করি। প্রকৃত পক্ষে ইহলোক এবং পরলোক একই গোটা মানবজীবনের দুইটী স্তর বিশেষ। একের অবসানে অন্যের উদ্ভব হয় মনে করিয়া, মানুষ ভ্রমে পতিত হয়। জীব ব্রহ্মস্বরূপ, প্রত্যেক জীবেই ব্রহ্মতেজ, ব্রহ্মানন্দ বিদ্যমান রহিয়াছে। বাহিরের সকল প্রকার আকর্ষণের মধ্যে থাকিয়াও জীব পরমাত্মার যোগ হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। যে আত্মায় এই নিত্যযোগ অনুভূত হয়, তাহাই পরলোক; আর যাহা এই যোগের অনুভূতি বিস্মৃত হইয়া, ইহসর্ব্বস্ব হইয়া থাকে, তাহারই ইহলোকে বাস। ফলতঃ মানবাত্মা দেহে অবস্থান করিয়াই, পরলোকে বাসের উপযুক্ত হইতে পারে। আবার দেহত্যাগেও ইহলোকবাসী বলিয়া কথিত হইতে পারে।

"প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে
ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ॥"

বাসুদেব অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তরাত্মা পরব্রহ্মে যতদিন প্রীতি স্থাপিত না হয়, ততদিন দেহমুক্তি হয় না—প্রকৃত পক্ষে। দেহাবসানের সঙ্গে ইহলোক পরলোক বাসের কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। আত্মা নিত্য, অজ, শাশ্বত, সনাতন। পৃথিবীতে, দেহে অবস্থানকালে দেহের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, জ্ঞান প্রেমের ক্রমবিকাশের বহুরূপ দেখিয়া, ভ্রান্তিবশতঃ দেহাভিমানগ্রস্ত হইয়া, মানুষ আত্মস্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। তখন এই নিত্য আত্মাকেই দেহাধীন বহুরূপী বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে।

"বহুরূপ ইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়া"।

দেহের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জন্ম থাকিলেই মৃত্যু তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। যে জিনিষের উৎপত্তিস্থান বা গোড়া আছে, তাহার পরিণতিস্থান বা আগাও থাকিবে।

"সমুদ্রবেলেব চ দুর্নিবার্য্যামস্য মৃত্যোরাগমনম্"

সমুদ্রের বেলাভূমিতে তরঙ্গাঘাতের ন্যায় মানবদেহে মৃত্যুর আগমন দুর্নিবার্য্য। বুদ্ধিতে যে যুক্তি দেয়, তাহাতে ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। তাহার পর জগতের অপরিহার্য্য মৃত্যু পরিণাম দেখিয়া, মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে ক্লেশ পাইতে হয় না। এই মৃত্যুর গতি রোধ করিতে না পারিয়া, শোকে একান্ত মুহ্যমান হওয়া মানবের পক্ষে শুভ লক্ষণ নহে। কিন্তু অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুরূপ গরল হইতে অমৃত নিষ্কাশন করিয়া লইবার একটী মন্থনদণ্ড আছে, তাহা প্রেম। মৃত্যুর যেমন একটা অপরিহার্য্যতা আছে, প্রেমের তেমনি একটা শুভ সিদ্ধি আছে। ইহা অনন্ত, ইহা মহান্। প্রেম যে মৃত্যুর কবল হইতে অমৃত নিষ্কাশন করিয়া লয়, তাহার ব্যবহারিক প্রয়োগ আমাদের অনেক পৌরাণিক কাহিনীতে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে দুইটী অতি উজ্জ্বল, সর্ব্বজনবিদিত কাহিনী—সাবিত্রী-সত্যবান্ এবং বেহুলা-লখিন্দর। এই সকল পৌরাণিক কাহিনী ইতিহাস হিসাবে সত্য না হইলেও, নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রণিধান করাইয়া দিবার পক্ষে অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

প্রথমোক্ত কাহিনীতে দেখিতে পাই, একটী নবোঢ়া বালিকা স্বামীর মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা জানিয়াও, সেই মৃত্যুর হাত এড়াইতে কোনও কৌশল আবিষ্কারে ব্যস্ত না হইয়া, সেই মৃত্যুর মধ্য হইতে অমৃত-নিষ্কাশনে আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি স্থির নিশ্চিন্তরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন, "আমি যতক্ষণ আছি, আমার প্রেম

* আসাম—ধুবড়ীর স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ সরকার ভক্তিভাজন ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। এই যোগেন্দ্রনাথ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ও শ্রীশবাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা।

যতক্ষণ আছে, যমের সাধ্য কি, আমার নিকট হইতে আমার স্বামীকে লইতে পারে"।

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥"

"শস্ত্র ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইহাকে আর্দ্র করে না, বায়ুও ইহাকে শোষণ করে না।" প্রেমের প্রতীক সতী তাঁহার প্রেমসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন—ফলে স্বামীর পুনরুত্থান। এই উত্থান দৈহিক নহে, আত্মিক। জন্মমরণাত্মক দেহের পুনরুত্থান সম্ভবপর নহে। দ্বিতীয় কাহিনীতে, আর একটী নবোঢ়া বালিকা কাল ভুজঙ্গের দংশনে নষ্টদেহ স্বামীর মৃত দেহ বক্ষে লইয়া ভেলা ভাসাইলেন অকূল সমুদ্রে—উদ্দেশ্য ঐ অমৃতের সন্ধান। সতীর প্রেমসাধনের ফলে গলিত অস্থিমাংস হইতে স্বামীর পুনরুত্থান—ইহাও আত্মিক উত্থান। এ স্থলে কাল-যোগে মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিত্ব প্রদর্শনার্থ কালভুজঙ্গের উল্লেখ। প্রেমের ভেলায় চড়িয়া, জীবনের অকূল সমুদ্রে ভাসিলে, মৃতের এই প্রকার পুনরুত্থান অতিনিশ্চিত।

এই প্রেম ভাগবতী প্রীতির পার্থিব প্রকাশ। শোক ইহার প্রতীক। এই প্রেম ফুটিয়া উঠে শোকের আকারে। শোক পুণ্য পাবন। শোকের প্রাথমিক লক্ষণ স্বার্থগন্ধযুক্ত—ধূলি-শয়ান মর্ত্তের সম্বন্ধ লইয়া জড়িত; কিন্তু সত্যকার শোক যাহা, তাহা গভীরতর, বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল। হাল্কা শোকের পর্য্য-বসান হয় দুদিনের বিলাপে—কিন্তু প্রেমাত্মক গভীর শোকের শেষ নাই, ইহা প্রেমের ন্যায় অনন্ত। আঁখিজল মুছিয়াই শোকাশ্রু অপনয়ন করা যায় না। বীরের মত ব্রত পালন করিয়া, আত্মার পুনরুত্থান করাইতে পারিলে, শোক পাকিয়া উঠে শান্তিতে।

আজ স্বামিবিয়োগ-কাতরা বধূকে "শোক পরিত্যাগ কর" একথা বলিব না। শোকের অভিনয় পরিহার কর, কিন্তু শোক ছাড়িও না। শোকের অভিনয় সন্তাপ আনয়ন করে, আর—

"সন্তাপাৎ ভ্রশ্যতে রূপং সন্তাপাৎ ভ্রশ্যতে বলম্।
সন্তাপাৎ ভ্রশ্যতে জ্ঞানং সন্তাপাদ্ব্যাধিমৃচ্ছতি॥"

"সন্তাপে রূপ যায়, সন্তাপে বল যায়, সন্তাপে জ্ঞান যায়, সন্তাপে ব্যাধির উৎপত্তি।" দেহী মানবের পক্ষে দেহ-সম্বন্ধীয় বিয়োগে কাতর হওয়া অস্বাভাবিক নহে—তাহা হইতেই শোকের প্রথম অধ্যায় অভিনয়ের উৎপত্তি। প্রেমের সাধনে নিযুক্ত হইয়া সেই অভিনয় পরিহার কর। গত কয়েক মাস পীড়িত স্বামীর আগত মৃত্যু জানিয়াও, অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া, তুমি সাবিত্রী-জীবনের প্রথম অধ্যায়ের সাধন করিয়াছ। আজ সেই সতীজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আসিয়াছ। এক্ষণে সেই দৃঢ় ব্রত লইয়া বসিয়া যাও, আর বল—

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ"।

আমার স্বামী অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, যমের সাধ্য কি তাঁহাকে মারিতে। তারপর ব্রত গ্রহণ কর ঐ পূর্ব্বোক্ত কাহিনীর বেহুলা সতীর ন্যায়। ভাস স্বামীকে লইয়া প্রেমের ভেলায় জীবনের অকূল সমুদ্রে। ঐ যে সম্মুখে স্বামীর চিতাভস্ম রহিয়াছে, লেপন কর তাহা বক্ষে, আর পোষণ কর প্রেম সেই চিতাভস্মের মধ্যে; দেখ স্বামীর পুনরুত্থান হয় কি না হয়। যদি এই সাধনে হার মানিয়া বসিয়া থাক, তবে প্রেম-স্পর্শ স্বামীর বিহনে প্রাথমিক যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছ, তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি দিতে কেহ পারিবে না। চিকিৎসকের সাধ্য নাই রোগ চিকিৎসা করিতে, ধর্ম্মোপদেষ্টার শক্তি নাই, উপদেশ দিয়া শান্তি দিতে। আজ স্বয়ং বিধাতাই এই সাধনরূপে তোমার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিলে তুমি শান্তিরূপে তাঁহাকেই পাইবে। ইহাই বিধান। এই বিধান মানিতে হইবে।

"আত্মৈব আত্মনো বন্ধু"—"মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই নিজের শত্রু।" সাংসারিক সুখের পশ্চাতে যে অনিত্যতা আছে, তাহা ভুলিয়াই মানুষ আপনি আপন মরণ ডাকিয়া আনে। বর্ষার প্রারম্ভে নূতন জলদাগমে ভেকের অত্যন্ত আনন্দ হয়। বড় আশা, জল পান করিয়া সুখী হইবে। সেই আনন্দের উদয়ে সে অত্যন্ত কোলাহল করিতে থাকে; জানে না যে, তার সেই কলরবধ্বনি শুনিয়া সর্প তার পশ্চাতে ধাবমান হইতেছে। সর্পও জানে না যে, তার পশ্চাতে ময়ূর সেই জলদাগমে নৃত্য করিতে করিতে বাহির হইতেছে। ময়ূরকে ধরিবার জন্য তার পশ্চাতে আছে ব্যাধ এবং সেই ব্যাধও নিরাপদ নহে—তার পশ্চাতে আছে নরখাদক ব্যাঘ্র। সেই দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্রও কি আপদহীন? সেও তো মৃত্যুর অধীন। এইরূপে সংসারে মানুষ সর্ব্বদাই সুখের পশ্চাতে ছুটিয়া ভুলিয়া যায়, তার পশ্চাতে কি আছে।

যদি দেহের অনিত্যতা নিত্য স্মরণ রাখিয়া, মানুষ আত্মস্বরূপ-প্রতিষ্ঠানে স্থিত লাভ করিতে পারে, তাহাই প্রকৃত জীবন-ধারণ, অন্যথা মৃত্যু। তা—দেহ থাকুক, আর নাই থাকুক।

শোকার্ত্ত আমরা একা নই। পৃথিবীতে অনেক শোকার্ত্ত আছেন। সকলকে একাত্মতায় প্রাপ্ত হইয়া আজ সেই দেশের সন্ধান করি—

"জনম মরণ আলোক আঁধার,
যে দেশে সব একাকার।"

সংবাদ।

শ্রদ্ধাঞ্জলি—গত ১৭ই ডিসেম্বর, কমলকুটীরের প্রাঙ্গণে, কবীন্দ্র সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে, মহতী সভায়, কলিকাতার সর্ব্বশ্রেণীর নাগরিকগণ স্বর্গগতা মহারাণী সুনীতি দেবীর প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তির অঞ্জলি দান করিয়াছেন। রাজা মহারাজা প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত, উচ্চপদস্থ, গণ্যমান্য পুরুষ ও মহিলাগণ মহারাণী দেবীর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে সমবেত হইয়াছিলেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথের এবং বক্তা পুরুষ মহিলাগণের শ্রদ্ধাঞ্জলির মর্ম্মস্পর্শী বাণী অমরাত্মার উদ্দেশে উত্থিত হইয়াছিল। তাঁহার অমর চরিত্রের স্মৃতিরক্ষার্থে একটী কমিটীও গঠিত হইয়াছে।

জন্মদিন—গত ১৭ই ডিসেম্বর, স্বর্গগত ভাই প্রমথলাল সেনের (নালুদার) জন্মদিনে, ৮৪নং অপার সাকুলার রোডে, শান্তিকুটীরে, ডাঃ প্রেমেন্দ্রনাথ রায় উপাসনা করেন।

গত ২৫শে ডিসেম্বর, ৬৫।১ হ্যারিশন রোডে, বিধানসুন্দরী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্মদিনে, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। বিধানজননী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

জলপাইগুড়ী-প্রবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল বড়ুয়ার পুত্র শ্রীমান্ আশীষকুমার বড়ুয়ার জন্মদিন উপলক্ষে মঙ্গলপাড়ার বাড়ীতে ৮ই নবেম্বর ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। ভগবান্ তাঁহার সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নামকরণ—গত ১১ই ডিসেম্বর, ১নং গিরিশবিদ্যারত্ন লেনে, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনের গৃহে, তাঁহার ভাগিনেয়ী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীমতী মণিকা দেবীর শিশুকন্যার শুভ নামকরণ উপলক্ষে, ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন ও শিশুকে "অর্চ্চনা" নাম দান করেন। এই উপলক্ষে পিতামাতা প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। ভগবান্ শিশুকে এবং তাহার পিতামাতা ও ভাইবোনদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

১৮ই ডিসেম্বর, ২০নং নিউপার্ক ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় রাজেশ্বর গুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বিজয়শ্রী গুপ্তের শিশুপুত্রের শুভ নামকরণে, শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। শিশুর নাম "হাইনস বিজয়প্রসাদ" রাখা হইয়াছে। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। শিশুটী গত ৩১শে জুলাই জন্মগ্রহণ করে।

খৃষ্টমাস্ ডে—গত ২৫শে ডিসেম্বর, শ্রীঈশার জন্মদিনে, প্রাতে ৮৪নং অপার সাকুলার রোডে শান্তিকুটীরে এবং সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন। উপদেশে ঈশাচরিত্রের কথা বলেন।

পুরস্কার বিতরণ—গত ১৮ই ডিসেম্বর, রামমোহন লাইব্রেরীতে, সাধু প্রমথলাল শিক্ষাতীর্থের পুরস্কারবিতরণে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (অবসরপ্রাপ্ত আই, সি, এস) সভাপতিত্ব করেন এবং তাঁহার মাতৃদেবী (মিসেস নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) পুরস্কার দান করেন। প্রোগ্রামের সকল বিষয়ই অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। আমরা সাধুর নামীয় স্কুলের ছাত্র, ছাত্রী ও শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী সকলকে "সাধু সাধু" বলে ধন্যবাদ দান করি এবং বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করি।

মাসিক উপাসনা—গত ১২ই নবেম্বর, ৮৩।১ অপার সাকুলার রোডে, স্বর্গীয় জনকচন্দ্র সিংহের দেহত্যাগের মাসান্তে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করা হয়।

গৃহ-প্রতিষ্ঠা—গত ৩০শে নবেম্বর, বালীগঞ্জে, যতীন্দ্র দাস রোডে, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায়ের নবগৃহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। ভগবান্ নূতন গৃহকে ও গৃহবাসী সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বিলাত-যাত্রা—গত ২১শে ডিসেম্বর, ১০নং নারিকেল বাগান লেনে, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের গৃহে, তাঁহার ভাগিনেয় এবং ঢাকার শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাসের তৃতীয় পুত্র, গয়ার ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসনজজ মিঃ এস্, কে, দাসের (আই,সি,এস,), আট মাসের বিদায় লইয়া, সপরিবারে বিলাতযাত্রা উপলক্ষে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ বিধাতার মঙ্গলাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনা করেন। সর্ব্বমঙ্গলা মা তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করুন। তাঁহাদের যাত্রা শুভ ও কল্যাণপ্রদ হউক।

স্থানপরিবর্ত্তন—৮২।২ অপার সাকুলার রোডস্থ বাড়ী ভাঙ্গিয়া নূতন বাড়ী প্রস্তুতির প্রস্তাবে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ সে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া, ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটস্থ প্রচারকার্য্যালয়ের বাড়ীতে আসিয়াছেন

পরলোক-গমন—আমরা গভীর দুঃখের সহিত, নিম্নলিখিত পরলোকগমন-সংবাদ প্রকাশ করিতেছি :—

গত ২৩শে ডিসেম্বর, ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে, সাধনাশ্রমে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ডাঃ হেমচন্দ্র সরকার (D. D.) বহুদিন রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া, পরমজননীর অনন্ত শান্তিপূর্ণ নিরাময় ক্রোড়ে স্থানলাভ করিয়াছেন। ২৭শে ডিসেম্বর, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ও দেশমাতৃকার অন্যতর সেবক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস বেলগাছিয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে, অস্ত্রোপচারে নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। সমাজগতপ্রাণ, কর্ম্মময়, উৎসাহশীল দুটী সাধক জীবনের তিরোধানে সমাজের অত্যন্ত ক্ষতি হইল। নরনারী অনেকে সাধনাশ্রমে ও শ্মশানে উপস্থিত হইয়া, প্রেত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিয়াছেন।

গত ২৬শে ডিসেম্বর, ৭৯.২৫ডি, লোয়ার সাকুলার রোডে, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসুর কন্যা, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মিত্রের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী ননীবালা মিত্র (বি,এ,) ৩০ বৎসর বয়সে, আকস্মিকভাবে ষ্টোবের আগুনে দগ্ধ হইয়া, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্বামী, চারিটী শিশুসন্তান ও বহু আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া, পরমজননীর শান্তিময় ক্রোড়ে স্থানলাভ করিয়াছেন। পিতামাতা বৃদ্ধবয়সে ভয়ানক শোকের আঘাত পাইলেন। পরমজননী মাতৃহীন শিশুদিগের মাতা হয়ে তাহাদিগকে মঙ্গলে কল্যাণে রক্ষা করুন।

গত ২২শে ডিসেম্বর, হরিসেনাদলের পৃষ্ঠপোষক ও সেবক, নববিধানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য ১৭নং স্কট্‌স্ লেনে, হৃদ্ফানির অসুখে পরলোক গমন করিয়াছেন।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে অনন্ত শান্তিবক্ষে রক্ষা করুন এবং সকল শোকার্ত্ত প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ২০শে নবেম্বর, ভবানীপুরে, ২৪নং রমেশচন্দ্র রোডে, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় একমাত্র পুত্র স্বর্গীয় মনীষীকুমারেরর পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। পিতা ও মাতা পুত্রের পবিত্র সুন্দর জীবনের গুণাবলী উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে। ভগবান্ পরলোকগত আত্মাকে অনন্ত স্নেহবক্ষে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্তপরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ২৬শে নবেম্বর, অনাথ আশ্রমে, স্বর্গগত ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্তের সাম্বৎসরিক। ২৮শে, ৮৩।১।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায়ের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক, জামাতা শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর দাস প্রার্থনা করেন। ২৯শে, প্রাতে ও সন্ধ্যায়, ৫৭।এ রাজাদিনেন্দ্র ষ্ট্রীটে, পৌত্রীজামাতা শ্রীযুক্ত অবনীমোহন গুহের গৃহে, স্বর্গীয় কালীকুমার বসুর সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক, প্রচারভাণ্ডারে দান ৪৲ টাকা। অদ্য নবদেবালয়ে, আচার্য্যদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় করুণাচন্দ্র সেনের সাম্বৎসরিক। ৪ঠা ডিসেম্বর, শ্রীযুক্ত নীতিলাল ঘোষের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক। ৫ই, কটকে ও ব্রহ্মানন্দাশ্রমে স্বর্গীয় রাজমোহন বসুর সাম্বৎসরিক; কন্যা শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী মল্লিকের দান প্রচারভাণ্ডারে ১৲। ৮ই, ভাই কালীনাথ ঘোষের সাম্বৎসরিক, ২৪নং তারক চাটার্জ্জির লেনে, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু প্রার্থনা করেন। ৯ই, বালীগঞ্জে ৬।২ একডালিয়া রোডে, সাধু অঘোরনাথের সাম্বৎসরিক, জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গুপ্ত প্রার্থনা করেন এবং প্রচারভাণ্ডারে দান ৩৲। ১০ই, ২৮নং নিউ রোডে, ডাঃ সত্যেন্দ্র নাথ সেনের গৃহে, তাঁহাদের পিতৃদেব স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের সাম্বৎসরিক। অদ্য ২৯।১এ বলদেও পাড়া রোডে, স্বর্গীয় মনোগতধন দের প্রথম সাম্বৎসরিক—ভগ্নী অশোকলতা দাস প্রার্থনা করেন; পাটনায় ভগ্নী শ্রীমতী বনলতা দের গৃহেও উপাসনা হয়। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে সহধর্ম্মিণীর দান ২৲ টাকা ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নী হেমলতা চন্দের দান ২৲ টাকা। ১৫ই, ৩৭নং বদ্রিদাস টেম্পল ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় হরগোপাল সরকারের সহধর্ম্মিণীর প্রথম সাম্বৎসরিক। ১৮ই, ১০নং নারিকেলবাগান লেনে, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের সহধর্ম্মিণীর প্রথম সাম্বৎসরিক; এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে কন্যা শ্রীমতী বীণা সরকারের দান ৫৲ টাকা এবং পুত্রদের দান ৫৲ টাকা। ২০শে, হাওড়ায়, ১৭নং বদনরায় লেনে, স্বর্গগত ভাই আশুতোষ রায়ের সাম্বৎসরিক, সহধর্ম্মিণী প্রার্থনা করেন। ২২শে, ৬৫।১ হ্যারিশন রোডে, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সাম্বৎসরিক, মাতা প্রার্থনা করেন।

রেঙ্গুনের সংবাদ—রেঙ্গুন ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক লিখিয়াছেন:—গত ৬ই ডিসেম্বর, রেঙ্গুনে, ৪৯নং ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত হরিদাস তালুকদারের প্রবাসভবনে, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় শশিভূষণ তালুকদারের চতুর্থ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, শ্রীযুক্ত কুলদাচন্দ্র নিয়োগী উপাসনার কার্য্য করেন ও পরলোকগত ব্রহ্মসাধকের পুণ্য জীবনের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। উপাসনাতে কয়েকটী মহিলাও বন্ধু যোগদান করেন।

ঢাকার সংবাদ—১৯শে নবেম্বর, এখানে মন্দিরে স্মৃতিসভা হইয়াছিল। ৪ঠা নবেম্বর, স্বর্গীয় রাজেশ্বর গুপ্তের স্বর্গারোহণসাম্বৎসরিক উপলক্ষে ও ২৩শে নবেম্বর, স্বর্গীয় ভাই কৈলাসচন্দ্র নন্দীর স্বর্গারোহণসাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে।

ত্র্যধিকশততম মাঘোৎসব।

প্রস্তুতি।

কার্য্যপ্রণালী।

[আবশ্যক হইলে এই কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইবে]

১লা জানুয়ারী, ১৯৩৩, ১৭ই পৌষ, ১৩৩৯, রবিবার—প্রাতে ৬॥০টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের নবদেবালয়-প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা পাঠ। পূর্ব্বাহ্ণ ৯টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে উপাসনা। "রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।"

২রা জানুয়ারী, ১৮ই পৌষ, সোমবার—"নববিধান, শ্রীমদ্ আচার্য্যদেব ও প্রেরিতবর্গ"।

৩রা জানুয়ারী, ১৯শে পৌষ, মঙ্গলবার—"মাতৃভূমি"।

৪ঠা জানুয়ারী, ২০শে পৌষ, বুধবার—"গৃহ"।

৫ই জানুয়ারী, ২১শে পৌষ, বৃহস্পতিবার—"শিশুগণ"।

৬ই জানুয়ারী, ২২শে পৌষ, শুক্রবার—"ভৃত্যগণ"।

৭ই জানুয়ারী, ২৩শে পৌষ, শনিবার—"দীনগণ"।

৮ই জানুয়ারী, ২৪শে পৌষ, রবিবার—শ্রীমদ্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক। কমলকুটীরে নবদেবালয়ে প্রাতে ৬টায় নাম পাঠ ও ৯টায় উপাসনা। সন্ধ্যা ৬টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা।

৯ই জানুয়ারী, ২৫শে পৌষ, সোমবার—"মহাজনগণ"। সন্ধ্যা ৬টায় আলবার্ট হলে কেশবচন্দ্রের স্মৃতিসভা।

১০ই জানুয়ারী, ২৬শে পৌষ, মঙ্গলবার—"জনহিতৈষিগণ"।

১১ই জানুয়ারী, ২৭শে পৌষ, বুধবার—"উপকারিগণ"।

১২ই জানুয়ারী, ২৮শে পৌষ, বৃহস্পতিবার—"বিরোধিগণ"।

১৩ই জানুয়ারী, ২৯শে পৌষ, শুক্রবার—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬টায় কেবলমাত্র মহিলাদিগের উপাসনা ও রাত্রি ১২টায় "জাগরণ"।

কমলকুটীরে নবদেবালয়ে (৭৮বি, অপার সার্কুলার রোড) ১লা ও ৮ই জানুয়ারী ব্যতীত প্রতিদিন প্রাতে ৮টায় উপাসনা এবং ব্রহ্মমন্দিরে ১লা, ৮ই, ৯ই ও ১৩ই জানুয়ারী ব্যতীত প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টায় কীর্ত্তন, পাঠ ও প্রসঙ্গ হইবে প্রতিদিনের বিশেষ বিশেষ ভাব সাধন নিজ নিজ পরিবারে বাঞ্ছনীয়।

উৎসব।

কার্য্যপ্রণালী।

(আবশ্যক হইলে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে)

১লা মাঘ, ১৩৩৯, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৩৩, শনিবার—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় **আরতি।**

২রা মাঘ, ১৫ই জানুয়ারী, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৮টায় ও সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় উপাসনা।

৩রা মাঘ, ১৬ই জানুয়ারী, সোমবার—সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে মহিলাগণ কর্ত্তৃক **নিশান-বরণ।**

৪ঠা মাঘ, ১৭ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার—**শ্রীদরবারের উৎসব।**

৫ই মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী, বুধবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৯টায় শান্তিকুটীরে **ব্রাহ্মিকা-উৎসব।** সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় ব্রহ্মমন্দিরে **যুবকদের উৎসব।**

৬ই মাঘ, ১৯শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক; ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭৷৷০টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় স্মৃতিসভা।

৭ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী, শুক্রবার—প্রাতে মঙ্গলবাড়ীর উৎসব; সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় ব্রহ্মমন্দিরে **সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনা।**

৮ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী, শনিবার—**বালকবালিকাদিগের নীতি-বিদ্যালয়ের উৎসব।** প্রাতে ৮টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা; অপরাহ্ণ ৪৷৷০টায় পুরস্কার-বিতরণ ও বালকবালিকা-সম্মিলন। (প্রবেশের জন্য নিমন্ত্রণপত্র-প্রদর্শন আবশ্যক হইবে)

৯ই মাঘ, ২২শে জানুয়ারী, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে **সমস্ত-দিনব্যাপী উৎসব।** প্রাতে ৭৷৷০টায় কীর্ত্তন, ৮৷৷০টায় উপাসনা; মধ্যাহ্ণ ৬টায় উপাসনা, তৎপরে পাঠ ও আলোচনা, ধ্যান ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা; ৫৷৷০টায় কীর্ত্তন ও সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় উপাসনা।

১০ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী, সোমবার—প্রাতে ৭৷৷০টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা; সন্ধ্যা ৬টার সময় ব্রহ্মমন্দির হইতে **নগর-সঙ্কীর্ত্তন** বাহির হইবে।

১১ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭৷৷০টায় ও সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় উপাসনা।

১২ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী, বুধবার—**নববিধান-ঘোষণার দিন।** প্রাতে ৭৷৷০টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা; সন্ধ্যা ৬৷৷০টার সময় ব্রহ্মমন্দিরে আনন্দ-সম্মিলন।

১৩ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৯টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে **আর্য্যনারী-সমাজের উৎসব।** সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা। প্রাতে ৮টায় কেশব একাডেমী বিদ্যালয়ে উৎসব।

১৪ই মাঘ, ২৭শে জানুয়ারী, শুক্রবার—৩ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, অপরাহ্ণ ৫টায়, **প্রচারকার্য্যালয়ের উৎসব।**

১৫ই মাঘ, ২৮শে জানুয়ারী, শনিবার—সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় শান্তিকুটীরে **"আমাদের সঙ্ঘের" উৎসব।**

১৬ই মাঘ, ২৯শে জানুয়ারী, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৮টায় ও সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় উপাসনা। অপরাহ্ণ ৩টার সময় ব্রহ্মমন্দিরে নববিধানবিশ্বাসিগণের সভা (Conference)।

১৭ই মাঘ, ৩০শে জানুয়ারী, সোমবার—সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর বার্ষিক সভা।

১৮ই মাঘ, ৩১শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার—সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে **শান্তিবাচন।**

সকলের সপরিবারে ও সবান্ধবে যোগদান প্রার্থনীয়।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.
কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভক্তির অঞ্জলি।

সবিনয় নিবেদন

মায়ের আহ্বানে তাঁহার পুত্রকন্যাগণের সমাগমে যে মহোৎসব হয়, তাহাই ভক্তির পরম তীর্থ ও পবিত্র সেবার ক্ষেত্র। এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে সকলের সেবা করার মত সৌভাগ্য আর কি আছে? ভক্তি ও সেবার ভাবে যথাসাধ্য শক্তি ও অর্থদান এখানেই সম্যক সার্থক হয় এবং অনন্ত স্নেহময়ী জননীর প্রচুর আশীর্ব্বাদও লাভ হয়। ভক্তির অঞ্জলীরূপে এই মহোৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ২৮নং রামকমল সেনের লেন ঠিকানায়—কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিজনকুমার সেনের নামে, ৩নং ক্লাইভ রো ঠিকানায় সম্পাদকের নামে অথবা ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে শ্রদ্ধেয় ভাই অক্ষয়কুমার লধের নামে যিনি যাহা পাঠাইবেন, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। ১লা, ৯ই, ১১ই ও ১২ই মাঘ ব্রহ্মমন্দিরে ঝুলি ধরা হইবে।

বিনীত
শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ
সম্পাদক।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির,
৮৯নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা;
১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩২।